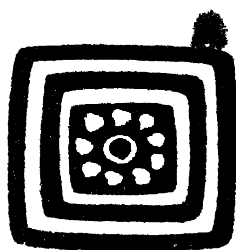
ধর্ম্ম ও সমাজ



শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ

ধর্ম ও সমাজ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়



সংকেত ভবন
৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

মাঘ, ১৩৫২

দাম : দুই টাকা বার আনা

৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, কলিকাতা হইতে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৩, নন্দন রোড, ট্রুথ প্রেস হইতে সুধাংশুরঞ্জন সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

যিনি
ধর্ম্ম ও সমাজে
সনাতন ধর্ম্মের শাশ্বত আদর্শ
রক্ষা করিবার জন্য
তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন,
নির্যাতন বা প্রলোভন
যাঁহাকে জীবনের আদর্শ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই,
সমগ্র দেশব্যাপী পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল প্রবাহের বিরুদ্ধে
যিনি বৈদিক পতাকা উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন,
ব্রহ্মণ্য আদর্শের মুর্ত্তিমান স্বরূপ
তপোমুর্ত্তি
বাঙ্গালীর গৌরব
স্বর্গীয় মহাত্মা পঞ্চানন তর্করত্নের
পুণ্য নামে
এই গ্রন্থ
উৎসর্গ করিলাম

মাঘ ১৩৫২
কলিকাতা

গ্রন্থকার

বিজ্ঞাপন

গ্রন্থকার লিখিত অন্যান্য বহি

ব্রহ্ম সূত্র—মূল্য ২৲

ইহাতে মূল ব্রহ্মসূত্র এবং তাহার সরল বঙ্গানুবাদ আছে। তদ্ব্যতীত সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর ভাষ্য ও রামানুজ ভাষ্যের সার মর্ম সরল বাংলা ভাষায় দেওয়া হইয়াছে। ৪৫০ পৃষ্ঠার বহি।

ধর্মপ্রসঙ্গ—

প্রতিমা পূজার সার্থকতা কোথায়? বেদের কর্মকাণ্ডের সহিত উপনিষদের ব্রহ্ম বিদ্যার কোনও বিরোধ আছে কিনা? জাতি বিভাগ সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর কিনা? আধুনিক সাহিত্যে দুর্নীতির প্রচার সম্বন্ধে সমাজের কর্ত্তব্য কি? কালী পূজা কি অন্যায় কারিণী নিষ্ঠুর শক্তির পূজা? নারীর কল্যাণের পথ কি? শ্রীচৈতন্য কি জাতিভেদ মানিতেন? বৌদ্ধধর্মের প্রচারে প্রাণিবধ কমিয়াছে কি? শিল্পের উদ্দেশ্য কি? এই সকল প্রসঙ্গ আলোচনা হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ

উপনিষদ—প্রথম ভাগ (যন্ত্রস্থ)

(ঈশ, কেন ও কঠ উপনিষদ)

মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ সহিত। ইহাতে শঙ্কর ও রামানুজ মতে উপনিষদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। রামানুজ মতে উপনিষদের ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় এই প্রথম। এই ব্যাখ্যাতে উপনিষদের অনেক দুরূহ বাক্যের উপর অভিনব আলোকপাত হইয়াছে।

ভূমিকা

ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি একত্র করিয়া এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থে কয়েকটি প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন।

আধুনিক ভারতের কয়েকজন দেশবিখ্যাত অথবা পৃথিবীবিখ্যাত ব্যক্তি ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি মত প্রচার করিয়াছেন, যেগুলি প্রাচীন মতের বিরোধী। যে মত ব্যাস বাল্মীকি শঙ্কর রামানুজ শ্রীচৈতন্য ও রামকৃষ্ণ প্রচার করিয়াছিলেন আধুনিক ভারতের বিখ্যাত নেতৃবৃন্দের মত সেই প্রাচীন মতের বিরোধী দেখিয়া হিন্দুর সন্দেহ হয়, কোন পথ সত্য? আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে প্রাচীন মতই শাস্ত্র এবং যুক্তির দ্বারা সমর্থন যোগ্য এবং প্রাচীন মতই ভারতের বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করিতেছে। ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে সত্য নির্ণয়ে অনেক সময় অলৌকিক দৃষ্টি শক্তির প্রয়োজন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "গহনা কর্মণো গতিঃ"—কর্মের গতি অতি গূঢ়। ইহ জন্মে যে কর্ম করা যায় তাহার ফল হয়ত পরজন্মে ভোগ করা হয়। সেইরূপ ইহ জীবনে যে সুখদুঃখভোগ হয় তাহার কারণ হয়ত পুর্বজন্মের কর্ম। ঋষিগণ তপস্যা এবং যোগ শক্তির দ্বারা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মদৃষ্টিলাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত। যে সকল ক্ষেত্রে আধুনিক বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মত ঋষিদের মতের বিরোধী হইতেছে বুঝিতে হইবে যে আধুনিকগণ যোগ ও তপস্যার দ্বারা সেরূপ সূক্ষ্মদর্শন লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। আমি যে আধুনিক ব্যক্তিগণের মতের প্রতিবাদ করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য সত্য নির্ণয় করা বা সন্দেহ নিরস্ত করা। কাহারও প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

বেদে বাল্য বিবাহের সমর্থন পাওয়া যায় কি না? বর্ণ বা জাতি জন্মগত হইবে কি না? জাতি বিভাগ সমাজে কল্যাণজনক কি না? উপনিষদে বৈদিক যজ্ঞ এবং বৈদিক দেবতা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে কি না? বুদ্ধ দেবের

মত প্রচারের ফলে প্রাণিবধ কমিয়াছে কি না? শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ সমর্থন করিয়াছেন কি না? বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত কি না? ইহাতে সমাজের কল্যাণ অথবা অকল্যাণ হওয়া সম্ভাবনা? আধুনিক স্ত্রী শিক্ষায় সমাজের কল্যাণ হয় কি না? আধুনিক সময়ে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের এ সকল বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। আমার ক্ষুদ্র বিদ্যা ও শক্তি অনুসারে আমি এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহার ফল ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম।

"গোপাল ভবন"
৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা
মাঘ ১৩৫২

গ্রন্থকার

সূচীপত্র



বৈদিক প্রসঙ্গ

বেদ চারিটি। ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ সামবেদ ও অথর্ববেদ। বেদের অপর নাম শ্রুতি। প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মহর্ষি আপস্তম্ব বেদের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ং"—অর্থাৎ মন্ত্র বা ব্রাহ্মণগুলিরই নাম বেদ। বেদের মন্ত্র নামক অংশের অপর নাম সংহিতা। এই অংশ প্রায়ই দেবতার স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ-অংশে যজ্ঞ করিবার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-অংশের শেষভাগ আরণ্যক নামে পরিচিত। ঋষিগণ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অরণ্যে গমন করিয়া যে সকল জ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিতেন আরণ্যকে সেই সকল জ্ঞানের কথা আছে। আরণ্যকের শেষভাগের নাম উপনিষদ। উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত। বেদের অন্ত অর্থাৎ শেষভাগ বলিয়া ইহার নাম বেদান্ত।

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের মতে মন্ত্র বা সংহিতা-অংশই বেদ—ব্রাহ্মণ-অংশ বেদ নহে। কিন্তু স্বামী দয়ানন্দের এই মত কোনও প্রাচীন আচার্য্যের মতের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। মহর্ষি আপস্তম্বের মত আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। মহর্ষি বাদরায়ণ বা বেদব্যাস, শঙ্কর, রামানুজ, সায়নাচার্য্য প্রভৃতি সকল প্রাচীন পণ্ডিতই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই বেদ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-অংশে বর্ণিত যজ্ঞ করিবার প্রণালী যে মনুষ্য কল্পিত নহে, এই প্রণালীও যে বৈদিক মন্ত্রের ন্যায় ঋষিগণ 'দর্শন, করিয়াছিলেন এবং ইহা যে অভ্রান্ত তাহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ে যান্যপশ্যন্

—মুণ্ডক উপনিষদ

"মন্ত্রের মধ্যে ঋষিগণ যে কর্ম (যজ্ঞ) দর্শন করিয়াছিলেন তাহা সত্য।"

বেদ অপৌরুষেয়; ইহা কোনও মনুষ্যের রচিত নহে। সকল মনুষ্যরচিত গ্রন্থে ভ্রম ও প্রমাদের সম্ভাবনা আছে। ঈশ্বরের কখনও ভ্রম হইতে পারে না। বেদ ঈশ্বরের রচিত। এজন্য বেদে ভ্রম ও প্রমাদের সম্ভাবনা নাই। প্রলয়ের শেষে যখন ঈশ্বরের জগৎ রচনা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল তখন তিনি প্রথমে

চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদসকল প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ

"যে ঈশ্বর পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার নিকট বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

বেদে যেরূপ জগতের বর্ণনা আছে ব্রহ্মা তদ্রূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রলয়ের পূর্বে সৃষ্টি ছিল, সেই সৃষ্টিতে যেরূপ সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র মনুষ্য পশু পক্ষী ছিল, বর্ত্তমান সৃষ্টিতেও সেইরূপ সূর্য চন্দ্র প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় যে বেদমন্ত্র বলা হয় তাহাতে ইহার উল্লেখ আছে—"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বম্ অকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীবঞ্চ অন্তরীক্ষম্ অথস্বঃ" অর্থাৎ—ব্রহ্মা পূর্বসৃষ্টির অনুরূপ সূর্য, চন্দ্র, স্বর্গ, আকাশ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই। সৃষ্টির অর্থ ই বৈষম্য। কেহ মনুষ্য কেহ পশু হইল, কেহ সুখী কেহ দুঃখী হইল—পূর্ব সৃষ্টিতে যে যেরূপ কর্ম করিয়াছিল, বর্তমান সৃষ্টির প্রারম্ভে সে সেইরূপ দেহপ্রাপ্ত হইল পূর্বকৃত কর্ম অনুসারেই ঈশ্বর জীবকে বিভিন্ন দেহ প্রদান করেন। তিনি অকারণ কাহাকেও সুখী কাহাকেও দুঃখী করেন না।

খৃস্টান ধর্ম, মুসলমান ধর্মেও সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা আছে। কিন্তু এই সৃষ্টির পূর্বেও যে সৃষ্টি ছিল, প্রলয়ের পরেও যে সৃষ্টি হইবে ইহা অন্য ধর্মে নাই, হিন্দু ধর্মেই আছে। হিন্দুধর্মেই পূর্ণ সত্য আছে।

ব্রহ্মা ঈশ্বরের নিকট যে বেদ লাভ করিলেন তাহা ঋষিদের দ্বারা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে। ঋষিগণ তপস্যা করিয়া বেদের বিভিন্ন অংশ লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য বেদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ঋষির নামে পরিচিত। এই সকল ঋষি বেদ রচনা করেন নাই, 'দর্শন' করিয়াছিলেন। "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ।"

বেদ যে অনাদি তাহা বেদে উক্ত হইয়াছে "বাচা বিরূপনিত্যয়া" (ঋগ্বেদ, ৮-৭৫-৬) অর্থাৎ—বেদের শব্দসকল বিবিধ রূপযুক্ত এবং নিত্য। "অস্য

মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদঃ যজুর্বেদঃ সামবেদ অথর্ববেদঃ” (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্) অর্থাৎ—ঋগ্বেদ প্রভৃতি চারিটি বেদ এই মহাভূতের (ঈশ্বরের) নিঃশ্বাসের ন্যায়। মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার প্রণীত ব্রহ্মসূত্রে বেদের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়া এই সূত্র রচনা করিয়াছেন “অতএব চ নিত্যত্বং” (ব্রহ্মসূত্র, ১৷৩৷২৯)।

বেদের অর্থ গ্রহণ করা অতিশয় দুরূহ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে তাহার পর বেদের অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। শিক্ষা অর্থাৎ—উচ্চারণ করিবার প্রণালী। কল্প অর্থাৎ—যজ্ঞ করিবার প্রণালী। ব্যাকরণ অর্থাৎ—শব্দের উৎপত্তি। নিরুক্ত অর্থাৎ—শব্দের অর্থ। ছন্দঃ অর্থাৎ—অক্ষরে সংখ্যা অনুসারে বেদবাক্য সজ্জিত করা। জ্যোতিষ অর্থাৎ—নক্ষত্রদের সংস্থান। এই ছয়টি বিদ্যাকে বেদের ষড়ঙ্গ বলা হয়। ব্রাহ্মণ বালকগণ অষ্টম বর্ষ বয়সে উপনয়ন সংস্কারের পর গুরুগৃহে দীর্ঘকাল বাস করিয়া এই সকল বিদ্যার সহিত বেদ অধ্যয়ন করিতেন এবং বেদের অর্থ অবগত হইতে পারিতেন। কিন্তু এই ভাবেও অনেক সময় বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। তাহার জন্য তপস্যা প্রয়োজন। ঋষিগণ তপস্যা করিয়া বেদের নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সমাজের কল্যাণের জন্য বেদের নিগূঢ় অর্থ প্রচার করা প্রয়োজন, ইহাও তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে যাহাতে সহজে বেদের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে এজন্য তাঁহারা কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের সাধারণ নাম ‘স্মৃতি’। ঋষিগণ বেদের অর্থ ‘স্মরণ’ করিয়া এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এজন্য ইহাদের নাম হইয়াছে স্মৃতি। স্মৃতি গ্রন্থগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র। রামায়ণ ও মহাভারতের নাম ‘ইতিহাস,’ অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণ প্রসিদ্ধ। মনুসংহিতা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। এই সকল স্মৃতি গ্রন্থে যে সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে অনেক স্থলেই তাহার সমর্থক বেদবাক্য পাওয়া যায়; কিন্তু কোন কোনও স্থলে তাহা পাওয়া যায় না। তাহার কারণ বেদের অনেক অংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পাণিনি মহাভাষ্যে বেদের সহস্রাধিক শাখার বা অংশের উল্লেখ আছে। এক্ষণে মাত্র কয়েকটি শাখা পাওয়া যায়। বেদের কয়েক অংশ যে লুপ্ত হইবে তাহা ঋষিগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য সেই সকল অংশের সারভাগ ঋষিগণ

তাঁহাদের প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল স্মৃতিগ্রন্থের সাহায্যে যে বেদার্থ বুঝিতে হইবে ইহা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে।

ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রতাদ্বেদঃ মাময়ং প্রহরেদিতি ॥

অর্থাৎ—ইতিহাস (রামায়ণ ও মহাভারত) এবং পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ দৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। যাহার বিদ্যা অল্প বেদ তাহাকে ভয় করেন যে ঐ ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে। (অর্থাৎ—আমার দুর্ব্যাখ্যা করিবে)।

বেদের কর্মকাণ্ডে যজ্ঞের কথা আছে, উপনিষদে জ্ঞানের কথা আছে, পুরাণে ভক্তির কথা আছে, অবতারের কথা আছে, এই সকল কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে বেদের কর্মকাণ্ডের সহিত উপনিষদের বিরোধ আছে, উপনিষদের সহিত পুরাণের বিরোধ আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই সকল মত বিচারসহ নহে। উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা থাকিলেও ইহা বলা হয় নাই যে, যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয় না বা যজ্ঞ করা উচিত নহে। প্রত্যুত উপনিষদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞ করিয়া স্বর্গে গমন করা যায়; কিন্তু যেহেতু স্বর্গে চিরকাল বাস করা যায় না, পুণ্য ফুরাইলেই পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, অতএব যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভ জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতে পারে না, ব্রহ্মকে জানিয়া মুক্তিলাভ করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মুক্তিলাভের পক্ষেও যজ্ঞের উপযোগিতা আছে। কারণ, নিষ্কামভাবে যজ্ঞ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। সুতরাং বেদের কর্মকাণ্ডের সহিত উপনিষদের কোনও বিরোধ নাই। উপনিষদে যদিও সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, তথাপি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই। জীব উত্তম কর্মের ফলে দেবত্ব লাভ করে এবং ঈশ্বরের অধীনে থাকিয়া ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তির সাহায্যে জগৎ পরিচালনা কার্য্যে সহায়তা করে। উপনিষদে জ্ঞানের কথা আছে বটে, কিন্তু ভক্তির কথা, উপাসনার কথাও আছে। উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং ॥

—মুণ্ডকোপনিষদ

অর্থাৎ—ঈশ্বরকে বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা লাভ করা যায় না। ঈশ্বর যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তাঁহার নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। ইহা ভক্তির কথা, সুতরাং উপনিষদে ভক্তির কথা নাই—ইহা যথার্থ নহে। কেনোপনিষদে দেখা যায়, পরব্রহ্ম একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়া দেবগণের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। সুতরাং ভগবানের অবতারের কল্পনা উপনিষদের বিরোধী নহে।

বেদ বলিয়াছেন "পিতৃদেবো ভব" (—তৈত্তিরীয় উপনিষদ) অর্থাৎ—পিতাকে দেবতার ন্যায় উপাসনা করিবে। শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃসত্যপালনার্থ বনবাস কাহিনীর বর্ণনা করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি এই বৈদিক উপদেশ আপামর-জনসাধারণের হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। বেদ বলিয়াছেন, "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।" মহাভারতে ভিক্ষুক পাণ্ডবদের নিকট প্রবল-পরাক্রান্ত কৌরবদের পরাজয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস এই বৈদিক সত্য উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এইভাবে পুরাণ সকলেও বৈদিক তত্ত্বসকল প্রচারিত হইয়াছে।

মনুসংহিতার ব্যবস্থাগুলি বেদ সমর্থন করিয়াছেন। "যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদতৎভেষজং" (তৈত্তিরীয় আরণ্যক) অর্থাৎ—মনু যাহা-কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায়। ঔষধ যেমন অনেক সময় বিস্বাদ হয় চিকিৎসকের ব্যবস্থা যেমন অনেক সময় কষ্টকর হয়, সেইরূপ মনুর ব্যবস্থাও অনেক সময় কষ্টকর। কিন্তু সে জন্য মনুর ব্যবস্থার নিন্দা করা উচিত নহে। বিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন বিভিন্ন রোগীর জন্য বিভিন্ন ঔষধ প্রদান করেন, সেইরূপ মনুও বিভিন্ন রকম রোগীর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষপাতের পরিচায়ক নহে। মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে,

> যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্মোমনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
> স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥

অর্থাৎ—মনু যাহার জন্য যে ব্যবস্থা দিয়াছেন সে সকলই বেদে বলা হইয়াছে, কারণ মনু সর্বজ্ঞানময়। ভারতের কোনও প্রাচীন পণ্ডিত এই উক্তির প্রতিবাদ করেন নাই।

মনুসংহিতার ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, পরাশর-সংহিতা প্রভৃতিরও ব্যবস্থা বেদানুযায়ী। সুতরাং এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকিতে পারে না। কোনও কোনও স্থলে বিরোধ আছে বলিয়া আপাতত মনে হইতে

পারে, কিন্তু বিচার করিলে সেই সকল বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যাইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং মনুসংহিতা যাজ্ঞবল্কসংহিতা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ একটি ধর্মই প্রতিপাদন করিতেছে। তাহা বৈদিক ধর্ম বা সনাতন ধর্ম। এক্ষণে তাহা হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত।

এক্ষণে আমরা বৈদিকধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি বিভিন্ন আচার্য্যের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতভেদ নাই আমরা প্রথমে সেই সকল বিষয়গুলিই উল্লেখ করিব।

বেদ বলিয়াছেন, এক সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। জীব পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করে। পুণ্যের ফল সুখ। পাপের ফল দুঃখ। কোনও কর্মের ফল আমরা ইহজন্মে ভোগ করি, কোনও কর্মের ফল মৃত্যুর পর স্বর্গে বা নরকে ভোগ করি। স্বর্গ ও নরকে চিরকাল বাস করিতে হয় না। পুণ্য ফুরাইলে স্বর্গবাস শেষ হয়, পাপ ফুরাইলে নরক বাস শেষ হয়। তখন আবার পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্য বা পশুপক্ষী হইয়া জন্মাইতে হয়।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেই কিছু পরিমাণে দুঃখভোগ অনিবার্য। সুতরাং চিরকালতরে সকল দুঃখের নিবৃত্তি করিতে হইলে পুনর্জন্ম নিবারণ করা প্রয়োজন। ঈশ্বরকে জানিলে পুনর্জন্ম নিবারণ করা যায়। পুনর্জন্ম নিবারণের অন্য উপায় নাই।

"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি।
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।"

— শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ

"একমাত্র তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। মোক্ষ লাভ করিবার অন্য উপায় নাই।

বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় না—ঈশ্বর যাঁহাকে কৃপা করেন তিনিই ঈশ্বরকে জানিতে পারেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাং॥

—মুণ্ডক উপনিষদ

"ঈশ্বরকে উৎকৃষ্ট বাক্য দ্বারা লাভ করা যায় না, বুদ্ধির দ্বারা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা লাভ করা যায় না। ঈশ্বর যাঁহাকে বরণ করেন তিনিই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট ঈশ্বর নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন।"

যে সাধক সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা করে সে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

"প্রতিবোধ বিদিতং মতম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে।"

—কেনোপনিষদ

অর্থাৎ প্রত্যেক চিন্তায় তাঁহাকে মনে রাখিলে অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

আমাদের হৃদয়ে কামক্রোধ প্রভৃতি মলিনতা আছে বলিয়া আমরা ঈশ্বরের কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের চিন্তায় নিমগ্ন হই। শাস্ত্রবিহিতকর্ম অনাসক্ত ও নিষ্কামভাবে করিলে আমাদের চিত্তের মলিনতা দূর হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে সর্বদা ঈশ্বরকে চিন্তা করা সম্ভব হয়। এজন্য ঈশ্বর-লাভের পক্ষে কর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই উপনিষদ বলিয়াছেন—

তমেব ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ

অর্থাৎ—অনাসক্তভাবে যজ্ঞ দান ও তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সেই ঈশ্বরকে জানিতে ইচ্ছা করেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং॥
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতম্ উত্তমং॥

—গীতা, ১৮।৫,৬

অর্থাৎ—"যজ্ঞ দান ও তপস্যা এই সকল কর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়, এই সকল কর্ম চিত্ত শুদ্ধ করে, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম করা উচিত—ইহাই আমার নিশ্চিত মত।"

বলা বাহুল্য, শাস্ত্রবিহিত যে কর্মে যাহার অধিকার আছে তাহার সেই কর্ম করা বিধেয়। যে কর্মে অধিকার নাই সে কর্ম করা উচিত নয়। এই বিষয়ে বর্ণাশ্রমধর্মের নিয়মসকল পালনীয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মনুসংহিতা

প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন বর্ণের জন্য যে সকল নিয়ম উল্লেখ করা হইয়াছে সে সকল বেদানুযায়ী। এইজন্য রামানুজ তাঁহার প্রণীত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের উপসংহারে মোক্ষলাভের উপায় সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

এবং অহরহরনুষ্ঠীয়মানব-বর্ণাশ্রমধর্মানুগৃহীত—তদুপাসনরূপ-তৎ-সমারাধনপ্রীত উপাসীনান্ অনাদিকালপ্রবৃত্ত—অনন্তদুস্তর-কর্মসঞ্চয়রূপ অবিদ্যাং বিনিবর্ত্ত্য স্বযাথাত্ম্য-অনুভবরূপ-অনবধিক-অতিশয়-আনন্দং প্রাপয্য পুনর্নআবর্তয়তি। অর্থাৎ—বর্ণাশ্রমধর্ম অনুসারে কর্ম করিয়া সেই কর্মের দ্বারা ঈশ্বরকে উপাসনা করিলে তিনি প্রীত হন। তাহার বহুকালকৃত অনেক দুষ্কর্মের ফলরূপ অজ্ঞান নাশ করেন। তখন জীব নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করে। আর পুনর্জন্ম হয় না।

এক্ষণে শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্যদের কোন্ বিষয়ে মতভেদ তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইবে। শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম নির্গুণ। রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম অনন্ত কল্যাণগুণের পারাবার। শঙ্কর বলেন, জীবের স্বরূপ যাহা ব্রহ্মও তাহা। রামানুজ বলেন, জীবের স্বরূপ ব্রহ্মের অংশ বা ব্রহ্মের দেহের ন্যায়। বিভিন্ন আচার্যদের মধ্যে এই প্রকার মতভেদ থাকিলেও অনেক প্রধান বিষয়ে তাঁহারা যে একমত, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

হিন্দুধর্মের কয়েকটি বিশেষত্ব

হিন্দুধর্মের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, অপর সকল ধর্মে সেগুলি দেখা যায় না। হিন্দুধর্মের প্রথম বৈশিষ্ট্য ইহার অনাদিত্ব। খৃষ্টান ধর্ম্ম বলুন, মুসলমান বলুন, ব্রাহ্মধর্ম বলুন—সকল ধর্ম্মই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যীশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে পৃথিবীতে খৃষ্টধর্ম বলিয়া কোনও বস্তু বিদ্যমান ছিল না। মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পৃথিবীতে মুসলমান ধর্ম্মের প্রচলন ছিল না। কিন্তু সেরূপ কোনও সময় নির্দ্দেশ করা যায় না— যাহার পূর্ব্বে হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। এ বিষয়ে হিন্দুধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মার হৃদয়ে ধর্ম্মের মূলস্বরূপ বেদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

"যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
বেদাংশ্চ সর্ব্বান্ প্রহিনোতি তস্মৈ"

"যিনি প্রথমে (চতুর্ম্মুখ) ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বেদের প্রকাশ করিয়াছিলেন।" সৃষ্টির প্রাকালে যে বেদের প্রকাশ হইল, ইহা কোনও অভিনব বস্তু নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয় ছিল, তাহার পূর্ব্বে সৃষ্টি ছিল, সেই সৃষ্টিতেও এই বেদই প্রচারিত ছিল। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, এই ভাবে কালস্রোত অনন্তকাল ধরিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, প্রত্যেক সৃষ্টিতে সেই এক বেদমন্ত্র সকল প্রচারিত হইতেছে, কারণ, বেদমন্ত্র সকল কোনও মানব-বিশেষের রচনা নহে, বেদ অপৌরুষেয়, স্বয়ং শ্রীভগবানের রচনা,—

"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ যদেতৎ ঋগ্বেদঃ"

"এই ঋগ্বেদ সেই মহাপ্রাণীর (ভগবানের) নিঃশ্বাসের ন্যায় অনায়াসপ্রসূত বস্তু।"

প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কোনও ব্যাপার ছিল না, প্রত্যেক সৃষ্টির পূর্ব্বে আর এক সৃষ্টি ছিল, তাহার পূর্ব্বে আর এক সৃষ্টি ছিল, এই ভাবে অনন্ত শ্রেণীপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টি ও স্থিতির এই অনন্ত পরম্পরা প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যার এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্মরণ করিতে হয়।

"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততো সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোঽজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বকমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।"

"শ্রীভগবানের প্রদীপ্ত তপস্যা হইতে ঋত ও সত্যের উৎপত্তি হইল, তাহার পর রাত্রির সৃষ্টি হইল, সমুদ্রের সৃষ্টি হইল, বৎসরের সৃষ্টি হইল, দিবা এবং রাত্রির ব্যবস্থাপক সূর্য্য ও চন্দ্রের সৃষ্টি হইল, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, আকাশের সৃষ্টি হইল, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ' পূর্ব্ব-সৃষ্টিতে যেরূপ ছিল, বর্ত্তমান সৃষ্টিতেও সেইরূপ হইল।"

চলচ্চিত্রের (Bioscope) ন্যায় এই সৃষ্টির বিকাশ প্রতিদিন তিনবার স্মরণ করিবার নিয়ম আছে। উদ্দেশ্য বোধ হয় এইরূপ যে, ইহা স্মরণ করিলে জগতের ক্ষণস্থায়িত্ব হৃদয়ে সুগভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে সুখ-ঐশ্বর্য্যের প্রতি আসক্তি কমিয়া যাইবে। এই আসক্তি হইতে চিত্তের অবনতি হয় এবং জগতে বহু অশান্তির সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই আসক্তি বিনষ্ট হইলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

অনাদি সৃষ্টির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ, হিন্দুর অনাদি ধর্ম্ম। তাই হিন্দুধর্ম্মের আর এক নাম সনাতন ধর্ম্ম। সনাতন ধর্ম্মই ইহার নিজস্ব নাম, হিন্দুধর্ম্ম ইহার আগন্তুক নাম, বিদেশী এই নামকরণ করিয়াছে। সনাতন

অর্থাৎ চিরস্থায়ী। যাহা সত্য, এই তাহা চিরস্থায়ী। শুধু চিরস্থায়ী নহে, অব্যয়, নির্ব্বিকার। শ্রীভগবান্ সত্য। তিনি চিরস্থায়ী, অব্যয়, নির্ব্বিকার। ধর্ম্ম শ্রীভগবানের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই হিন্দুর কল্পনা এই যে, ধর্ম্মও সনাতন,—চিরস্থায়ী, অব্যয়, নির্ব্বিকার।

সন্দেহ হইতে পারে,—কোনও ধর্ম্ম কি সনাতন বা চিরস্থায়ী হইতে পারে? কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক। ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রীভগবানের স্বরূপ এবং তাঁহাকে পাইবার প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্দেশ করা। শ্রীভগানের স্বরূপ সম্বন্ধে যে উপদেশ দেওয়া হয়, যুগে যুগে তাহার পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হয় না। তাঁহাকে পাবার উপায় দেশকালপাত্র অনুসারে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রেই সেই সকল বিভিন্ন উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে,—এইপ্রকার ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ উপায় প্রশস্ত, অমুক সাধনা অমুক যুগের উপযোগী, ধর্ম্ম বলিতে এই সকল ব্যবস্থার সমষ্টি বুঝাইবে। সুতরাং যুগে যুগে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় না। যীশুখৃষ্ট যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এক্ষণে বা ভবিষ্যতে তাহা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, এ কথা খৃষ্টান স্বীকার করে না। মুসলমানও স্বীকার করেন না যে, মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম্ম ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইবে। কোনও বিশেষ সময়ের পর হইতে যদি ধর্ম্মকে অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহার পুর্ব্বেও তাহাকে অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া কল্পনা করা যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে। অতএব হিন্দুধর্ম্মকে সনাতন অথবা চিরকাল অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া কল্পনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

হিন্দুধর্ম্মের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, বিভিন্ন মানবের সুখদুঃখের তারতম্য হয় কেন, হিন্দুধর্ম্মে এই সমস্যায় যেরূপ সুন্দর সমাধান দেখা যায় অপর কোনও ধর্ম্মে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। একজন জন্ম হইতেই রোগভোগ করিতে লাগিল, অভাব ও দুঃখে দুর্ব্বিষহ জীবনযাপন করিতে লাগিল, আর এক জন সুস্থ-শরীরে জন্মলাভ করিয়া প্রাচুর্য্য ও পবিত্রতার মধ্যে লালিত হইল, প্রথম হইতে তাহার সুশিক্ষার বন্দোবস্ত হইল,—এ পার্থক্য দেখা যায় কেন? প্রথম শিশু কোনও অপরাধ করিবার পূর্ব্বেই এত কষ্ট ভোগ করিল কেন, দ্বিতীয় শিশু কোনও সৎকর্ম্ম করিবার পুর্ব্বেই এত সুখভোগ করিল কেন? ঈশ্বর কি পক্ষপাতদুষ্ট? না, তিনি জগতের জীবসমূহের সুখদুঃখের এই প্রকার অব্যবস্থা প্রতিবিধান করিতে অক্ষম? তবে কি তিনি সর্ব্বশক্তিমান নহেন?

শ্রীমতী আনিবেশান্তের শিশু কন্যা জন্মলাভ করিয়া দুশ্চিকিৎস্যরোগ-যাতনা ভোগ করিয়া কিছুকাল পরে যখন কালকবলে পতিত হইল, তখন উল্লিখিত প্রশ্ন শ্রীমতী আনিবেশান্তের চিত্ত আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পান নাই। অবশেষে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়া এ প্রশ্নের সুমীমাংসা পাইলেন। পূর্ব্বজন্ম স্বীকার না করিলে কিছুতেই ইহার মীমাংসা হয় না। "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৪) "ঈশ্বর কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী করিয়াছেন, ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ঈশ্বর পক্ষপাতদুষ্ট এবং নিষ্ঠুরস্বভাব। উত্তর—না, এ আশঙ্কা অমূলক। কারণ, ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কর্ম্ম অনুসারে সুখী বা দুঃখী করেন।" কোনও ব্যক্তি ইহজন্মে কোনও পাপ করে নাই অথচ দুঃখভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া যেমন পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ ইহজন্মে বহু সৎকর্ম্ম করিয়াও সুখভোগ করিল না, বা পাপ করিয়াও সুখে কাল কাটাইল, ইহা হইতে পরজন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কেবল স্বর্গ বা নরকের কল্পনায় এ সমস্যার মীমাংশা হয় না। কারণ, ইহজন্মে পরিমিত পুণ্য বা পাপের অনুষ্ঠান করাই সম্ভব, তাহার ফলে পরিমিত স্বর্গ বা নরকভোগ যুক্তিযুক্ত হয়, পুনর্জন্ম না স্বীকার করিলে স্বর্গ বা নরকভোগের পর জীব কোথায় যাইবে? খৃষ্টান বা মুসলমান ধর্ম্মে স্বর্গ ও নরক অনন্তকালস্থায়ী বলিয়াই মনে হয়। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে স্বর্গ ও নরক পরিমিতকালস্থায়ী, তাহার পর পুনর্জন্ম। এইভাবে যতদিন জীবের সকল পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, ততদিন তাহাকে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সকল পাপ ক্ষয় হইলে জীব একান্তভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার পুনর্জন্মের অবসান হয়।

"মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥

মহাত্মাগণ পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়; তখন তাহারা দুঃখের আলয় এবং ক্ষণস্থায়ী পুনর্জন্ম লাভ করে না।

কর্ম্মফলবাদ প্রায় সকল ধর্ম্মই স্বীকার করিয়াছে, কারণ, পুণ্যের ফল স্বর্গ এবং পাপের ফল নরক, ইহা সকল ধর্ম্মেই বলা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অপর সকল ধর্ম্মে জন্মান্তর স্বীকার না করায় কর্ম্মফলবাদের কল্পনা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত হয় নাই। কেবল হিন্দুধর্ম্মে জন্মান্তর স্বীকার করিয়াছে

বলিয়া কর্ম্মফলবাদ সুসম্পূর্ণ হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মেও জন্মান্তর স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু এই দুই ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতেই জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিয়াছে, এ জন্য ইহার স্বতন্ত্র উল্লেখ করিলাম না।

জীব স্বকর্ম্মফলেই সুখদুঃখভোগ করে, ইহা সত্য। কিন্তু কেহ দুঃখভোগ করিতেছে দেখিলে "এ ব্যক্তি নিজকর্ম্মের ফলেই দুঃখ পাইতেছে" বলিয়া কাহারও উদাসীন থাকা উচিত নহে। কেবলমাত্র মনুষ্য নহে, ইতর প্রাণীর প্রতিও দয়া করা উচিত, ইহা হিন্দুধর্ম্মের একটি মূলনীতি।—গীতা বলিয়াছেন—"সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ"। পরদুঃখমোচনের জন্য সকলের যত্ন করা উচিত। তাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং ভগবান্ প্রীত হন। কিন্তু বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, যেন পরদুঃখমোচনের চেষ্টা করিয়া চিত্তে অহঙ্কারের সঞ্চার না হয়। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের ক্ষমতা অতি ক্ষুদ্র, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই জগতের যাবতীয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়।

অহঙ্কারবুদ্ধিতে পরদুঃখ-মোচনের চেষ্টা করিলে, অনেক সময় নাস্তিকতার আবির্ভাব হয়। মনে হয়, জগতে যখন এত দুঃখ ও অভাব, তখন করুণাময় জগদীশ্বর নাই। এই কারণে সর্ব্বসাধারণের দুঃখমোচন করিবার আগ্রহ-প্রসূত বলশেভিকবাদ ঈশ্বরদ্রোহী সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। মানবের চরিত্রগঠনে দুঃখের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহাও বলশেভিকবাদে অস্বীকৃত হইয়াছে।

খৃষ্টানধর্ম্মে জন্মান্তরবাদ নাই, তাই বিভিন্ন লোকের অবস্থাবৈষম্যের কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাইতে পারে নাই। এই কারণে সেখানে একাকারমূলক বলশেভিকবাদের প্রসার হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন সাধনের উপযোগিতা স্বীকার করা হইয়াছে। অপর ধর্ম্মে সকল ব্যক্তির পক্ষে একরূপ সাধনাই বিহিত হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন মানবের প্রকৃতি বিভিন্ন। তাই এক পথ সকলের পক্ষে সমান উপযোগী হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "মা ছেলেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মাছ রাঁধিয়া খাইতে দেন; কাহাকেও মাছের পোলাও খাইতে দেন; কাহারও পোলাও সহ্য হয় না, মাছের ঝোল খাইতে দেন; কেহ বা মাছ ভাজা খাইতে ভাল বাসে, তাহাকে মাছভাজা দেন।" হিন্দুধর্ম্মে উপযোগিতা অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন প্রকার সাধনা বিহিত হইয়াছে। কেহ ভগবানকে পিতারূপে

পূজা করিতে ভালবাসে, সে মহাদেবের উপাসনা করিবে; কেহ মাতারূপে উপাসনা করিতে ভালবাসে, সে দুর্গা বা কালীরূপে পূজা করিবে; কেহ রাজারূপে পূজা করিতে ভালবাসে, সে শ্রীরামচন্দ্ররূপে পূজা করিবে। কেহ চিত্ত স্থির করিয়া হৃদয়গুহার মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিতে ভালবাসে, সে যোগমার্গ গ্রহণ করিবে; কাহারও পক্ষে জ্ঞানমার্গ বেশী উপযোগী, সে নিরাকার অব্যয় নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে। এই ভাবে হিন্দুধর্ম্মে সাধনার বহু বিভিন্ন পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং বিবিধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। অন্য কোনও ধর্ম্মে এত বেশী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল সম্প্রদায়ের লোকই নিজেদের হিন্দু, বা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মনে করেন। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে অনেকগুলি সম্প্রদায় থাকায় একটি শুভফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম্মমতবিষয়ে হিন্দু অনেকটা উদারতা লাভ করিতে পারিয়াছে। একটা কোনও বিশেষ মত বা পথ অবলম্বন না করিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, এই ভুল ধারণা হিন্দুর চিত্তে স্থান পায় না। সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মমত অনুসারে ভজনা করিলে ঈশ্বরলাভ করিতে পারে, ঈশ্বর বিভিন্ন সাধকের নিকট বিভিন্নরূপে দর্শন দিতে পারেন, এ সকল কথা হিন্দুর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা যত সহজ, অপরধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে তত সহজ নহে। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলেই যে ঈশ্বরের পথেই চলিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে বলা হইয়াছে।

"ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

"বেদ, সাঙ্খ্য, যোগ, পাশুপত, বৈষ্ণব,—নানাবিধ পথ আছে। কেহ একটি পথকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, কেহ অপর পথকে হিতকর মনে করে। কারণ, বিভিন্ন মানবের রুচি বিভিন্ন। কোনও মানব সরল পথে চলে, কেহ বা কুটিল পথে চলে। কিন্তু সকল মানবের গম্য তুমিই। যেমন সকল নদীর গম্য সমুদ্র।"

গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥"

"যে আমাকে যে ভাবে পূজা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। সকল মনুষ্য সকল প্রকারে আমার পথই অনুসরণ করিয়া থাকে।

শ্রীভগবানের মুখে এই কথা শুনিয়া হিন্দু জানিয়াছে যে, মুসলমান ও খৃষ্টান নিজ ধর্ম্মমত অনুসারে সাধনা করিয়া ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হইবেন। ফলে এমন অনেক হিন্দু আছেন—যাঁহারা মনে করেন যে, যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরের অবতার এবং মহম্মদ ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ। কিন্তু বেশীসংখ্যক খৃষ্টান বা মুসলমান নাই—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত একমাত্র হিন্দুধর্ম্মেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, যিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মমত অনুসারে সাধনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, সকল ধর্ম্মই সত্য। কারণ, তিনি প্রত্যেক সাধনাতেই ঈশ্বরলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সকল কারণে হিন্দুধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মকেই মূলধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মকে তাহার বিভিন্ন শাখা বলিয়া কল্পনা করা অযৌক্তিক নহে। সকল ধর্ম্মের তত্ত্বই হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে পাওয়া যাইবে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি তত্ত্ব অন্য ধর্ম্মে পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম, অপর ধর্ম্মগুলি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। কিন্তু কোনও ধর্ম্মই মিথ্যা নহে, সকল ধর্ম্মই সত্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, সকল ধর্ম্মই কি প্রকারে সত্য হইতে পারে? মুসলমানগণ মৃত্যুর পর স্বর্গে আল্লার নিকট বাস করিয়া নানা সুখভোগ করেন; ইহা সত্য হইলে অদ্বৈতবাদী হিন্দুর মোক্ষকল্পনা কিরূপে সত্য হইতে পারে, যে মোক্ষলাভ করিলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হওয়া যায়, অথবা বৈষ্ণবের কল্পনা কিরূপে সত্য হইতে পারে যে, চিরকাল গোলোকে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ করা যাইবে? ইহার উত্তর এই যে, ভগবানের শক্তি এবং বিভূতি অসীম। তিনি একই সময়ে কোরাণে বর্ণিত স্বর্গ রচনা করিয়া আল্লারূপে সেখানে বিরাজ করিতে পারেন, আবার নির্গুণ নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মরূপে বিরাজ করিয়া নিজের মধ্যে নির্গুণ সাধকের সত্তা বিলীন করিতে পারেন, পুনরায় সেই সময়েই মায়াতীত বৈকুণ্ঠলোকে বৈষ্ণব ভক্তগণের সহিত লীলা করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে এইরূপ কার্য্য করা বিচিত্র নহে। আর তিনি যে এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা গীতায় তিনি বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥"

মুসলমান আল্লারূপে ভজনা করিয়া তাঁহাকে আল্লারূপেই প্রাপ্ত হইবেন,

খৃষ্টান তাঁহাকে যীশু খৃষ্টের পিতারূপে প্রাপ্ত হইবেন, হিন্দু নিজ সম্প্রদায় অনুসারে তাঁহাকে কৃষ্ণ বা বিষ্ণু বা শিব বা দুর্গা বা কালীরূপে প্রাপ্ত হইবেন।

আমার ধর্ম্মমতই সত্য, অপর ধর্ম্মমত সকল মিথ্যা,—এইরূপ ভ্রান্ত ধারণায় অনেকগুলি কুফল আছে। ইহা অপর ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত কলহ করিবার প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দেয়। কেহ কেহ বলেন যে, ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে অনেক রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, সুতরাং ধর্ম্ম তুলিয়া দেওয়াই উচিত। ইহাদের যুক্তি অনেকটা এইরূপ, মাথার অসুখ করিয়াছে, সুতরাং মাথাটা কাটিয়া ফেলা যাক। ধর্ম্মের নামে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত কারণ ধর্ম্মবিষয়ে অনুদারতা এবং অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি। ধর্ম্মবিষয়ে অনুদারতা নিবারণ করিলে কলহ বহু পরিমাণে কমিয়া যাইবে। অত্যাচার করিবার যদি প্রবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্ম না থাকিলেও অপর কারণে লোক অত্যাচার করিবে। অনেক সময় নিজ ধর্ম্মমতই সত্য, এই দোহাই দিয়া—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজেদের দল বাড়াইয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিবার জন্য,—লোক অপরধর্ম্মের লোকদিগকে নিজধর্ম্মে আনিবার জন্য চেষ্টা করে। এবিষয়ে সকল সময়ই যে সদুপায় অবলম্বিত হয়, তাহা নহে। আমার উদ্দেশ্য সাধু, আমার ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে পরধর্ম্মাবলম্বীর মঙ্গল হইবে,—সুতরাং ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করিয়া হউক অপরকে আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলে দোষ নাই,—অনেকের এইরূপ মনোভাব দেখা যায়। কিন্তু হিন্দু অপর ধর্ম্মের লোককে নিজধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জন্য এইরূপ অশোভন আগ্রহ কখনও দেখান নাই। উদারপ্রকৃতির ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিও হিন্দুধর্ম্মের এই সদ্‌গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। সম্প্রতি মহীশুরের দেওয়ান Sir Mirza Ismail বলিয়াছেন;—Tolerance has been a pre-eminent characteristic of the Hindu religion right through the ages. Not being a proselitizing religion it is satisfied with the followers it possesses and cherishes no active desire to add to their number by conversion from other religions. May this spirit of toleration which is such a striking attribute of your religion remain undiminished! While firmly believing in your own religion you have nothing but good-will towards others. That to my mind is true religion,—designate it as you like.

ভারতের এবং ভারতের বাহিরে যবদ্বীপে, বলিদ্বীপ প্রভৃতি নানাস্থানের অনেক আদিম অধিবাসী হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে সত্য ; কিন্তু এই সকল জাতির মধ্যে একেশ্বরবাদমূলক কোনও ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল না, ইহারা ভূতপ্রেতের পূজা করিত—"প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ"। যাহারা ভূতপ্রেতের পূজা করে, তাহারা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, "ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ," সুতরাং তাহাদের মধ্যে একেশ্বরবাদমূলক হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাহাদের যে মঙ্গলসাধন করা হইয়াছিল, এ বিষয়ে অহিন্দুরও সন্দেহ থাকিতে পারে না, এবং তাহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার করিবার সময় যে কোনও অন্যায় উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল অথবা তাহাদের মধ্যে কোনও বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

হিন্দুধর্ম্মে জীবনের প্রত্যেক কার্য্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে বলিয়া কেহ কেহ দোষ দিয়া থাকেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত সকল সময় কি কার্য্য করিতে হইবে, এবং কেমন করিয়া করিতে হইবে, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। অনেকে আশঙ্কা করেন যে, জীবন এত শত বন্ধনে জড়িত হইয়া থাকিলে তাহাতে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। কিন্তু প্রণিধান সহকারে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই আশঙ্কা অমূলক। আমাদের জীবনের প্রকৃত বন্ধন হইতেছে—কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গ। ইহারাই আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মে বাধা দিয়া এবং অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করাইয়া উন্নতির অন্তরায় হয়। শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল আমাদিগকে রিপুর বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের উন্নতির পথ সহজ করিয়া দেয়। রিপুগণ আমাদিগকে বিপথচালিত করিবার যাহাতে একটুও অবকাশ না পায়, এ জন্য জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ কর্ম্ম করিবার প্রণালী শাস্ত্র কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হিন্দুর জীবন তাহার নিজের সুখভোগের জন্য নহে,—তাহার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত, প্রতি উদ্যম শ্রীভগবানের জন্য উৎসর্গীকৃত,—এ জন্যই হিন্দুশাস্ত্র সকল কর্ত্তব্য বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উপদেশ দিয়াছেন। দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধানগুলি প্রত্যেক কর্ম্মে ভগবান্‌কে স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং ভগবৎ-প্রীতির জন্য আমরা সকল কর্ম্ম করিব, এই ধারণা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দেয়।

"প্রাতরুত্থায় সায়ান্তং সায়মারভ্য প্রাততঃ
করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥"

"প্রভাত হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত আমি যাহা করি, হে জগন্মাতঃ, সে সকলই আপনার পূজা।"

শারীরিক পবিত্রতার জন্যও অনেক বিধান দেওয়া হইয়াছে। সে সকলই শরীর এবং মনের পক্ষে কল্যাণকর। দৈনিক স্নান, ধৌত বস্ত্র পরিধান, উচ্ছিষ্ট মোচন, শুদ্ধ অবস্থায় রন্ধন, ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে হস্তমুখ-ধাবন, মলমূত্র-ত্যাগের পর শৌচাচার, এ সকল বিষয়ে সাধারণ হিন্দুদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তথাকথিত সভ্য জাতি অপেক্ষা অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল নিয়ম পালন করিবার পরিবর্ত্তে অনেক সময় তাসখেলা, থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখা, উপন্যাস পাঠ করা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয় করেন; তাহাতে কোনও কল্যাণ দেখা যায় না।

হিন্দুধর্ম্মের আর একটি বিশেষত্ব, বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ্, ষড়্দর্শন, অষ্টাদশ পুরাণ, অষ্টাবিংশতি সংহিতা, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্ম-প্রতিপাদক অসংখ্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বহু প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুধর্ম্মের গৌরবের পরিচয় দিয়া বর্ত্তমান আছে। বহু রাজ্যবিপ্লবের মধ্যেও হিন্দুজাতি এই সকল অমূল্য গ্রন্থ সযত্নে রক্ষা করিয়াছে। সাধারণতঃ শোনা যায় যে, হিন্দুরা শূদ্রদিগকে বেদ পাঠ করিতে দিতেন না, অতএব জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে সংগোপন করিয়া রাখা হইত; প্রত্যুত পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের মধ্যে জ্ঞানের দ্বার সর্ব্বসাধারণের নিকট অবারিত। কিন্তু বাস্তবিক কিরূপ অবস্থা দেখা যায়? পাশ্চাত্য দেশের জনসাধারণ উচ্চ দার্শনিক চিন্তার সহিত অতি অল্পপরিমাণেই পরিচিত হয়, এই সকল দার্শনিক চিন্তা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। প্রত্যুত হিন্দুজাতির মধ্যে জনসাধারণ লিখন-পঠন বিষয়ে পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা অনেক পশ্চাৎপদ হইলেও ধর্ম্ম ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বগুলির সহিত তাহারা সুপরিচিত। পার্থিব সুখ ঐশ্বর্য্য ক্ষণস্থায়ী ও তুচ্ছ; ঈশ্বরলাভ না করিলে জীবনের সকলই ব্যর্থ; একান্তভাবে ভগবানের শরণ লওয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা চিন্তা করা, তাঁহার নাম জপ করা, এই সকল তাঁহাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায়; যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, ইহজন্মে হউক, পরজন্মে হউক, তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হইবে; ক্ষুদ্রতম কীটপতঙ্গের মধ্যেও পরব্রহ্ম বিরাজিত,—এই সকল তত্ত্বের সহিত নিরক্ষর হিন্দু কৃষকও পরিচিত। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে উচ্চ দার্শনিক চিন্তা

সকল জনসাধারণের মধ্যে প্রসারলাভ করে নাই, কিন্তু হিন্দুজাতির জনসাধারণের মধ্যে প্রসারলাভ করিয়াছে; তাহার কারণ এই যে, "জ্ঞানের দ্বার সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কেবল এই কথা বলিলেই জনসাধারণ জ্ঞান-জগতের উচ্চ চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হয় না। উচ্চজ্ঞান আহরণ করিতে সাধারণের মধ্যে প্রায়ই অনিচ্ছা বা সুযোগের অভাব দেখা যায়। এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানলাভ সুগম করিবার ব্যবস্থা পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু হিন্দু জাতির মধ্যে আছে। যাত্রা, গান, কথকতা, কাব্য, সাহিত্যের মধ্য দিয়া চিত্তাকর্ষকভাবে হিন্দুর দার্শনিক তত্ত্বগুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করিবার ব্যবস্থা আছে। শূদ্রের বেদপাঠ নিষেধ থাকিলে কি হয়? বেদের যে সকল অংশ সর্ব্বসাধারণের উপযোগী অর্থাৎ বেদের শ্রেষ্ঠ অংশগুলিই পুরাণ-ইতিহাসের মধ্য দিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের আর একটি বিশেষত্ব,—হিন্দুধর্ম্মের বহুসংখ্যক ঋষি, মুনি, সাধু, সন্ন্যাসী। পার্থিব সুখ ঐশ্বর্য্য অকিঞ্চিৎকর ও মিথ্যা জানিয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য অরণ্য, পর্ব্বত বা বিজন নদীতীরে গিয়া যত বেশী হিন্দু দীর্ঘকাল সাধনা করিয়াছে, অপর কোনও জাতির তত বেশী লোক সেরূপ সাধনা করে নাই। সংসার ত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে গিয়া সাধনা করার বিরুদ্ধে আজকাল অনেক সুলভ ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রযুক্ত হয় সত্য; কিন্তু এই সকল সংসারত্যাগী ব্যক্তিই ধর্ম্ম-জগতের উচ্চতম অনুভূতি সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং যদিও তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি এই সকল উচ্চ অনুভূতি লাভ করিয়া তাঁহারা সংসারের যেরূপ উপকার করিয়াছিলেন, সংসারনিমগ্ন ব্যক্তিগণ তাহা করিতে সমর্থ হন নাই।

কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে নহে, আয়ুর্ব্বেদ, রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতি ব্যবহারিক জগতেও আর্য্য ঋষিগণ যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সে সকল তত্ত্ব অস্বীকার করিতে পারে নাই; বস্তুতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অল্পদিন পূর্ব্বেও সে, সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রসায়ন বা পদার্থ-বিদ্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুদিন যাবৎ স্থির করিয়াছিলেন যে, কতকগুলি মৌলিক পদার্থ দ্বারা জগতের যাবতীয় বস্তু গঠিত হইয়াছে। কিন্তু অল্পদিন হইল, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, এই ধারণা ভুল, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর উপাদান এক। তাহাকে electron বা ether বলিবেন, তাহা এখনও স্থির করিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক,

এইভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অদ্বৈতবাদের সমীপবর্ত্তী হইতেছেন,—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্, এই সমস্তই ব্রহ্ম,—কারণ সকল পদার্থ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মেই অবস্থান করে এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয়।

হিন্দুধর্ম্মের আর একটি বিশেষত্ব ইহার অপূর্ব্ব সামাজিক ব্যবস্থা। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।*

* মাসিক বসুমতী জ্যৈষ্ঠ—১৩৪০।

—:০:—

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

আমরা পূর্ব্বের প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম্মের কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াছি। হিন্দুধর্ম্ম অনাদি; হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে সকল ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য পাওয়া যায় কর্ম্মফলবাদ এবং জন্মান্তরবাদের মধ্য দিয়া হিন্দুধর্ম্ম জগতের বৈষম্যের সন্তোষ-জনক কারণ যেভাবে নির্ণয় করিয়াছে, অপর কোনও ধর্ম্ম সেরূপ করিতে পারে নাই; জন্মের পূর্ব্বে এবং মৃত্যুর পরে জীবের অবস্থা সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের কল্পনা যেরূপ সুসঙ্গত, অপর কোনও ধর্ম্মের কল্পনা সেরূপ নহে; জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত এবং মানবের প্রতি উদ্যম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিয়া মানবজীবন পরিপূর্ণ এবং সার্থক করিবার ব্যবস্থা হিন্দুধর্ম্মের যেমন আছে, অপর ধর্ম্মে সেরূপ নাই। ধর্ম্মবিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হিন্দুধর্ম্মেই বেশী; ঈশ্বরলাভার্থ সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসী হিন্দুধর্ম্মেই অধিক-সংখ্যক; দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব বিস্তার করিতে হিন্দুধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা কৃতকার্য্য হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের আর একটি বিশেষত্ব—হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা বর্ণাশ্রম নামে সুপরিচিত। প্রথমেই লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই ব্যবস্থাটিকে আশ্রম বলা হইয়াছে। মনে করুন, চারিদিকে ভীষণ অরণ্য, যথেচ্ছভাবে বিবিধ বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া ভূতল ছাইয়া ফেলিয়াছে, তন্মধ্যে মানব চলিবার পথ খুঁজিয়া পায় না, ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য ফলমূল পায় না, পিপাসায় নির্ম্মল বারি পায় না; প্রত্যুত বিবিধ হিংস্র পশু অরণ্যমধ্যে বিচরণ

করিয়া সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত করে। এইরূপ অরণ্যের মধ্যে একটি তপোবন বা আশ্রম দেখিলে নয়ন-মন কিরূপ চরিতার্থ হয়! সুমিষ্ট ফলভারে তরুরাজি অবনত হইয়া পড়িয়াছে, কূপ ও সরোবরে নির্ম্মল স্বচ্ছ জল, বর্ষাশীত নিবারণের জন্য পর্ণকুটীর, উদ্যানের মধ্য দিয়া সুরচিত পথ, সুপরিষ্কৃত প্রাঙ্গণে বসিয়া গাভীগণ রোমন্থন করিতেছে, মৃগযূথ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে, হিংস্র জন্তুগণ ঋষিগণের তপঃশক্তিপ্রভাবে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, করিলেও হিংস্র-স্বভাব পরিত্যাগ করিতেছে। পবিত্র হোম-ধূমগন্ধে আশ্রম আমোদিত বেদমন্ত্রধ্বনিতে আকাশ-বায়ু কম্পিত; বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট ঋষিগণ ধ্যানমগ্ন; ছাত্রগণ সমিধ আহরণ করিয়া আনিতেছে, বালক-বালিকাগণ ক্রীড়া করিতেছে, ঋষিপত্নী ও ঋষিকন্যাগণ স্নান করিয়া আর্দ্রবসনে কলসীকক্ষে কুটীরাভিমুখে চলিয়াছে। অরণ্যের মধ্যে আশ্রম যেরূপ রমণীয়, জগতের মধ্যে বর্ণাশ্রম সেইরূপ রমণীয়। বহির্জগতে জীবিকার জন্য ভীষণ সংগ্রাম, বর্ণাশ্রমে প্রত্যেক বর্ণের জীবিকার সুব্যবস্থা; বহির্জগতে দ্বেষ-হিংসা, বর্ণাশ্রমে শান্তি ও প্রীতি; বহির্জগতে ভোগোন্মুখতা, বর্ণাশ্রমে ধর্ম্মজীবন; বহির্জগতে স্বেচ্ছাচার, বর্ণাশ্রমে সংযম ও সদাচার। ঋষিগণের দিব্য সাধনার ফল, ভগবানের করুণার দান, হিন্দুর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।

সমাজে যাহার যে বৃত্তিগ্রহণে অভিরুচি হয়, সে সেইরূপ বৃত্তিগ্রহণ করিলে, সমাজ সুশৃঙ্খলভাবে উন্নতিলাভ করিতে পারে না। অরণ্যে যেখানে যে গাছ জন্মে, সেখানেই সে গাছ বাড়িয়া যায়, এ জন্য অরণ্য মনুষ্যবাসোপযোগী হয় না। আশ্রমের বৃক্ষাবলী এরূপ যথেচ্ছভাবে বাড়িয়া যায় না। আশ্রমের উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত বীজ বপন করা হয়, নিয়মিতভাবে মৃত্তিকা খনন এবং জলসেচন করা হয়, তাহাতে বৃক্ষগুলি যথাকালে বিবিধ ফলপুষ্প উপহার দিয়া শ্রম সার্থক করে। বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাতেও স্ত্রী-পুরুষের মিলন নিয়মিত করা হয়, মানবের কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে হিতকর প্রণালীতে পরিচালিত করা হয়, যাহার যে ভাবে কর্ম্ম করিলে নিজের এবং সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহাকে সেই ভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়, এই ভাবে মানবের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিলে তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় এবং তাহার উন্নতিতে বাধাদান করা হয়, এরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। প্রবৃত্তির বশে মানব যে সকল কর্ম্ম করিতে যায়, অনেক ক্ষেত্রেই তাহা মঙ্গলদায়ক হয় না। অধিকাংশ মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ভোগমুখিনী, এ জন্য মানব সচরাচর শ্রেয়কে উপেক্ষা

করিয়া প্রেয়কে বরণ করে। মানবের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে অধিকাংশ স্থলে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিয়মিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে তাহাকে চালিত করা প্রয়োজন হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে তাহাই করা হইয়াছে।

মানবকে যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাকে সেইরূপ কর্ম্ম করিতে না দিয়া, যে ভাবে কর্ম্ম করিলে সমাজের কল্যাণ হইবে, সেইভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত করা প্রয়োজন, ইহা পাশ্চাত্য দেশের কোনও কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিও উপলব্ধি করিয়াছেন। এ বিষয়ে মনীষী রস্‌কিন্ তাঁহার রচিত Political Economy of Art নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

National law has hitherto been only judicial; contented, that is, with an endeavour to prevent and punish violence and crime; but as we advance in our social knowledge we shall endeavour to make our Government paternal as well as judicial; that is, to establish such laws and authorities as may at once direct us in our occupations, protect us against our follies and visit us in our distress.

"এ পর্য্যন্ত আইন কেবলমাত্র অপরাধীর বিচার করিয়াছে, অর্থাৎ সমাজের উপদ্রব এবং পাপে বাধা দিয়া এবং দণ্ড দিয়াই সন্তুষ্ট আছে। কিন্তু আমাদের সমাজবিষয়ে যত জ্ঞান বেশী হইবে, ততই সামাজিক শাসন পারিবারিক শাসনের অনুরূপ হইবে। এইরূপ আইন ও অবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে, যাহা আমাদের জীবিকার পথ নির্দ্দেশ করিবে, মুর্খতার হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবে এবং বিপদের সময় আমাদের সাহায্য করিবে।"

পুনশ্চ রস্‌কিন্ বলিয়াছেন :—

The notion of discipline and interference lies at the root of all human progress or power; the "Let alone" principle is, in all things which man has to do with, the principle of Death"

[The Political Economy of Art]

"মানবের সকল প্রকার উন্নতির মূলে নিয়ম এবং শাসন বর্ত্তমান থাকে। মানব-সংক্রান্ত সকল বিষয়েই স্বেচ্ছাচার মৃত্যুরই কারণ।"

কোন্ ব্যক্তি কি বৃত্তি অবলম্বন করিবে, ইহা নিয়মিত করা প্রয়োজন,

রস্‌কিন্ তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু কিরূপে ইহা উত্তমরূপে নিয়মিত করা যায়, এ বিষয়ে তিনি সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য কতকটা এরূপ, কোন্ বালক কিরূপ শিক্ষার উপযোগী, তাহা পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়া তদনুকুল শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কিন্তু নানা কারণে এরূপ ব্যবস্থা সন্তোষজনক হয় না। প্রথমতঃ বিভিন্ন বৃত্তির জন্য ভিন্ন প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা বাল্যকাল হইতেই করা প্রয়োজন, কিন্তু কোন্ বালকের কোন্ বৃত্তির পক্ষে সমধিক উপযোগিতা, বাল্যকালে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। অনেক ব্যক্তির মধ্যে কোনও বিশেষ উপযোগিতা প্রকাশ পায় না; যাহাদের প্রকাশ পায়, তাবাদের হয়ত বেশী বয়সে প্রকাশ পায়, তত দিন পর্য্যন্ত বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা স্থগিত রাখা যায় না। কতকগুলি বৃত্তি আছে, যেগুলি সমাজের পক্ষে আবশ্যক হইলেও সেগুলি অপরিষ্কার অথবা কষ্টসাধ্য বলিয়া সে বৃত্তিগুলি অবলম্বন করিবার বিরুদ্ধে মানবের স্বাভাবিক অনিচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বৃত্তিগুলি কোন্ ব্যক্তির জন্য নির্দ্দেশ করা যাইবে? জন্মগত বৃত্তির ব্যবস্থা হইলে এই সকল প্রতিবন্ধক বহু পরিমাণে অপসারিত হয়। সন্তানের প্রবৃত্তি সাধারণতঃ তাহার পিতামাতার অনুকূল হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বহু পুরুষ ধরিয়া এক বৃত্তির চর্চ্চা হইলে সেই বংশে সেই বৃত্তির স্বাভাবিক উপযোগিতা বর্দ্ধিত হয়। আধুনিক Eugenics বা সুপ্রজনন বিদ্যা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই সত্য প্রচার করিয়াছে। সন্তান মাতার অনুকূল স্বভাব প্রাপ্ত হয়, ইহার স্থূল কারণ এই যে, মানবদেহ বহু অনুকোষ (Cell) দ্বারা গঠিত, মানবের প্রতি চিন্তা, প্রতি কর্ম্ম সেই কোষের মধ্যে একটা বিশেষ সংস্কার সঞ্চারিত করে, ফলে মানবদেহের প্রতি কোষের উপর তাহার চিন্তা এবং কর্ম্মের ছাপ থাকিয়া যায়। এই কারণে দেহ হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহার দেহ ও মন পিতামাতার অনুরূপ হইয়া থাকে। কখনও কখনও পুত্রের মধ্যে পিতার অনুরূপ আকৃতি-প্রকৃতি দেখা যায় না, কিন্তু পৌত্রের মধ্যে তাহা দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে যে, কোনও বাধা হেতু পুত্রের মধ্যে তাহার প্রকাশ না হইলেও সে প্রবৃত্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, পৌত্রের মধ্যে তাহার প্রকাশ হইয়াছে। সন্তানের আকৃতি-প্রকৃতি সাধারণতঃ পিতামাতার অনুরূপ হয়, ইহার স্থূলকারণ পূর্ব্বে বলা হইল; অধিকন্তু ইহার একটা সূক্ষ্মকারণও আছে। সে কারণ এই যে, ইহজন্মে মানব যেরূপ কর্ম্ম করে, যেরূপ চিন্তা করে, মৃত্যুর পর তদনুরূপ যোনিতে জন্মলাভ করে। ইহাই

হিন্দুধর্ম্মের সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মফলবাদ বা জন্মান্তরবাদ। ইহার মূল বেদে দেখিতে পাওয়া যায়,—

রমণীয়চরণাঃ রমণীয়াং যোনিমাপদ্যন্তে
কপূয়চরণাঃ কপূয়াং যোনিমাপদ্যন্তে
শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।

—ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫-১০-৭

"যাহারা উত্তম কর্ম্ম করে, তাহারা উত্তম যোনি প্রাপ্ত হয়, যাহারা নিন্দনীয় কর্ম্ম করে, তাহারা নিন্দনীয় যোনি প্রাপ্ত হয়, যথা—কুক্কুরযোনি বা শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি।"

কোনও ব্যক্তির বৃত্তিবিশেষের প্রতি উপযোগিতা প্রধানতঃ দুইটি বস্তুর উপর নির্ভর করে ;—(১) জন্মগত সংস্কার, (২) পারিপার্শ্বিক অবস্থা। এই এই দুইটি বস্তুই মানবকে তাহার পৈতৃক বৃত্তির উপযোগী করে। ব্রাহ্মণের পুত্র পিতার অনুরূপ ধীর শান্ত-স্বভাব এবং ধর্ম্মপরায়ণ হওয়াই সম্ভব। সে বাল্যকাল হইতে পিতাকে শাস্ত্রচর্চ্চা বা ক্রিয়াকর্ম্মনিরত দেখে, এ জন্য তাহার ঐরূপ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি ও উপযোগিতা বর্দ্ধিত হয়। ক্ষত্রিয়ের পুত্র স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ-দেহ হয়, বাল্যকাল হইতে সে যুদ্ধের কথা, শৌর্য্যেবীর্য্যের কাহিনী শুনে, সে-ও এইরূপ বীরত্বপূর্ণ কার্য্য করিবে, তাহার মনে স্বভাবতঃ এইরূপ আগ্রহ হয়। তাঁতির পুত্র বাল্যকাল হইতেই চরকা, লাটাই, মাকু প্রভৃতির সহিত পরিচিত হয়, পিতার নিকট তাঁত চালাইবার শিক্ষালাভ করাই তাহার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক ; তাহার পক্ষে ভাল তাঁতী হওয়া যেরূপ সহজ, ভাল কাঁসারি হওয়া তত সহজ নহে। সেইরূপ কাঁসারির ছেলের পক্ষে কাঁসারি হওয়াই সহজ ও স্বাভাবিক, তাহাকে তাঁতির কাজ শিখাইতে হইলে বেশী বেগ পাইতে হইবে। জন্মগত বৃত্তির ব্যাবস্থা থাকিলে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তিকে সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোনও বৃত্তিতে কুশল করা সম্ভব হয়। সে জন্য Weaving School, Technical school, Industrial school প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হয় না। বয়ন-বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র জাতির বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। জন্মগত বৃত্তির ফলে ভারতে যে নানাবিধ কলা ও শিল্পের চর্চ্চা সমধিক সফলতা লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতের ন্যায় সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র পৃথিবীতে কোথাও প্রস্তুত হইত না, পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাহা সমাদৃত হইত।

নানাবিধ কারুকার্য্যের জন্যও ভারত বিখ্যাত ছিল। পিতল, কাঁসা, হাতীর দাঁতের প্রস্তুত বিবিধ সুদৃশ্য দ্রব্য ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং দেশবিদেশে বিক্রীত হইয়া ভারতকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছিল। গভীর চিন্তাশীল এবং স্বদেশের ঐকান্তিক হিতৈষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত থাকায় ভারতবর্ষের সমুদয় শিল্পকার্য্য বহু পূর্ব্বকাল হইতে অপরিসীম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং সমস্ত পৃথিবীতে উহা তুলনারহিত হইয়াছে" (সামাজিক প্রবন্ধ ১০৪ পৃঃ)

ভারতবর্ষের অসংখ্য দেবালয়ের গঠন কৌশল এবং ভাস্কর্য্য-সৌন্দর্য্য, এলোরা ও অজন্তার চিত্রাবলি পৃথিবীর দূরদূরান্তর হইতে শ্রদ্ধাপূর্ণ দর্শক আকৃষ্ট করে জন্মগত বৃত্তিব্যবস্থাতেই এরূপ উন্নতি হইয়াছিল। সমাজের অপরিষ্কার কিন্তু প্রয়োজনীয় কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য জন্মগত বৃত্তি যেরূপ উপযোগী, অপর কোনও ব্যবস্থা সেরূপ উপযোগী নহে। পাশ্চাত্য সমাজে যে ব্যক্তির পক্ষে অপর কোনও বৃত্তি গ্রহণ করা সম্ভব হইল না, সেইরূপ ব্যক্তিই অনিচ্ছাপূর্ব্বক বাধ্য হইয়া এই সকল অপরিষ্কার এবং কষ্টসাধ্য বৃত্তি গ্রহণ করে। এইরূপ মনোভাব লইয়া কোনও জীবিকা গ্রহণ করিলে চরিত্রের অবনতি অপরিহার্য্য। কিন্তু হিন্দু সমাজে যে ব্যক্তি পৈতৃক ব্যবসা বলিয়া এই সকল বৃত্তি গ্রহণ করে, তাহার সেরূপ মানসিক অবনতি হয় না। "পূর্ব্বজন্মের কুকর্ম্মের জন্য আমাকে এই হীন বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছে, পাপ হইতে বিরত হইলে পরজন্মে এরূপ বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে না," এইরূপ চিন্তা মানসিক উন্নতির সহায়ক। "ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি এরূপ বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছি, ইহার জন্য আমি ভিন্ন অপর কেহ দায়ী নহে," এরূপ চিন্তায় উচ্চজাতির প্রতি বিদ্বেষভাব অপসারিত করে। সকল কর্ম্মই দোষযুক্ত, স্বজাতির নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম যতই হীন হউক, তাহা সম্পাদন করিলে কোনও দোষ হয় না, এইরূপ চিন্তা শ্রমের প্রতি গৌরবভাব বদ্ধিত করে। যাত্রা, গান, কথকতা প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই সকল ভাব সমাজের উচ্চনীচ সকল জাতির মধ্যে বিস্তারলাভ করিয়াছে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকে দেখিতে পাই, রাজশ্যালক যখন ধীবরকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "আহা, তোমার জীবিকা কি মহৎ," তখন ধীবর উত্তর করিল, "যে কুলে যাহার জন্ম, সেই কুলের কায তাহার পক্ষে কদাচ পরিত্যাজ্য নহে। ব্রাহ্মণকেও বংশগত কর্ম্ম বলিয়া যজ্ঞের সময় পশু বধ করিতে হয়।"

শ্যালঃ।—(বিহস্য) বিসুদ্ধো দাণিং আজীবো।

ধীবরঃ।—ভট্টা

শহজে কিল যে বিণিন্দিদে ণহু শে কম্ম বিবজ্জণীঅএ।

পশুমালণকম্ম দালুণে অণুকম্পামিদুকেবি শোত্তিএ॥

(ষষ্ঠ অঙ্ক)

বংশগত হীন জীবিকা যদি সাধু ব্যক্তিরা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সাধারণে সে জীবিকা হীন বলিয়াই মনে করিবে। পরন্তু বংশগত হীন জীবিকা যদি সাধু ব্যক্তি কর্তৃক পরিত্যক্ত না হয়, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণে সে জীবিকাকে গৌরবের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবে। মহাভারতোক্ত ধর্ম্মব্যাধ ব্যাধের জীবিকা অবলম্বন করিলেও তপস্বী ব্রাহ্মণকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতে সমর্থ হইয়াছিল। সাধু রুইদাস জুতা সেলাই করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিলেও আধ্যাত্ম-জগতের উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এইরূপ দৃষ্টান্ত অপর ব্যাধ এবং মুচির পক্ষে ধর্ম্মজীবনলাভে কিরূপ সহায়ক, তাহা সহজেই অনুমেয়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যাহার যে বৃত্তি জন্মগত, সেই বৃত্তি পালন করাই তাহার পক্ষে ঈশ্বর-সেবার উপায়, এবং এই ভাবে কর্ম্ম করিলে সকলেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে পারে।

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্

স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"

"যিনি মানবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন, যাঁহা দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে, নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার সেবা করিলে মানব সিদ্ধিলাভ করে।"

পাশ্চাত্য সমাজে জীবন-সংগ্রামে যাহারা নিকৃষ্ট বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়, তাহাদের অবস্থা কিরূপ, নিম্নলিখিত বাক্য হইতে ইহা উপলব্ধি হইবে। ইহা New York এর Supreme Courtএর Justice Wesley Howard লিখিত "Is Civlization Worth Having?" নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

Men in their modern cities construct great parks and erect statues and have zoological gardens and build hospitals; and they have damp, crowded basements and gloomy attics and unsanitary yards and poor houses and mad houses and penitentiaries. In these basements and

attics babies are born who never see the blue sky or smell the fresh air, and mothers die who never touched the green fields or walked in the silent forests. And this is civilization.

The development of man has also produced the underworld, the underworld where boys are taught to be thieves and girls trained to walk the streets : the land of dopefields, degenerates, hags, harlots, pick pokcets, paupers! those who prowl in the dark and flit like spectres in the gray of the morning ! Those who sleep with their clothes on in bunks or rags, eaten with virmin, stupefied with stench.

In this region of the wretched, babies are strangled, the old are abandoned, the sick neglected, the weak maltreated the insane tortured, the young polluted. In these crowded quarters of the lowly, women lie in confinement in the same room where thugs swear and gamble ; the dying gasp and struggle ; children play and prattle while harlots drink and gabble."

Statesman 18th November 1928.

"আধুনিক নগরে মানব বৃহৎ উত্থান এবং প্রস্তরমূর্ত্তি প্রস্তুত করে, পশুশালা স্থাপন করে, হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করে ; আবার অপরিষ্কার স্যাঁৎস্যাঁতে ক্ষুদ্র ও নিম্ন কক্ষও নির্ম্মাণ করে ; অন্ধকার ঘর, অস্বাস্থ্যকর প্রাঙ্গণ, পাগলা গারদ। ক্ষুদ্র অপরিষ্কার কক্ষে শিশুদের জন্ম হয়, যাহারা কখনও নীল আকাশ দেখিতে পায় না, নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পায় না ; প্রসূতিরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যাহা কখনও শ্যামল ক্ষেত্র স্পর্শ করে নাই, নিস্তব্ধ বনানীতে ভ্রমণ করে নাই।

"এবং ইহারই নাম সভ্যতা।

"মানবের উন্নতির সহিত নিম্ন-জগতের সৃষ্টি হইয়াছে,—যেখানে বালকদিগকে চৌর্য্যবৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয়, বালিকাদিগকে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইবার শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহা চোর, বদমাইস, গাঁটকাটা ও বেশ্যার

নিবাসভূমি। যাহারা অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং পূর্ব্বাকাশে ঊষার আলোক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই প্রেতাত্মার ন্যায় অদৃশ্য হয়; যাহারা কখনও বেশ পরিবর্ত্তন করে না; যেখানে শুইয়া ঘুমায় শয়নকক্ষের দুর্গন্ধে অভিভূত হইয়া পড়ে; ছারপোকা, পিশু প্রভৃতির দংশনে অস্থির হইয়া পড়ে।

"এই হতভাগ্যদের রাজ্যে শিশুদিগকে গলা টিপিয়া হত্যা করা হয়, বৃদ্ধদিগকে কেহ সেবা করে না, রোগীদের কেহ শুশ্রূষা করে না, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করা হয়। উন্মাদরোগগ্রস্তদিগকে যন্ত্রণা দেওয়া হয়, তরুণদিগকে অপবিত্র করা হয়। এই সকল জন বহুল স্থানে যখন স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রসব করে, তখন সেই কক্ষেই তাহাদের পাশে বসিয়া ঠগরা জুয়া খেলে এবং গালাগালি দেয়; মুমূর্ষু ব্যক্তিরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় খাবি খায়, তাহাদের পাশে বসিয়া চোরেরা ধূমপান করে, এবং মারামারি করে; শিশুগণ খেলা করে এবং অস্পষ্ট কথা বলে, এবং তাহাদের পাশে বসিয়া বেশ্যারা মদ খায় এবং প্রলাপোক্তি করে।"

আমাদের দেশের দরিদ্রতম সমাজেরও এরূপ নৈতিক অধঃপতন হইয়াছে মনে হয় না। যাঁহারা জাতিভেদের বিরোধী, তাঁহারা বলেন, পাশ্চাত্য সমাজে মুচির ছেলেও President, Prime Minister হইতে পারে। পাশ্চাত্য সমাজের এই ব্যবস্থাটি তাঁহাদের খুব ভাল মনে হয়; কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের নিম্নতম স্তরে কিরূপ অধঃপতন হয়, সে বিষয়ে তাঁহারা উদাসীন বোধ হয়। আমাদের দেশে মুচির ছেলে রাজা বা মন্ত্রী হয় ত হয় নাই। কিন্তু মুচির ছেলে রুইদাস ভক্তিবলে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছিল, দক্ষিণ-ভারতের "পারিয়া" (Pariah) সাধু নন্দ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বিগ্রহের সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়াছিল। যদি রাজ-মন্ত্রী হওয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্ত হওয়া অধিক গৌরবের বস্তু হয়, তাহা হইলে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের লজ্জিত হইবার কারণ নাই। পাশ্চাত্য সমাজের নিম্নতম স্তরের সকলেই কিছু রাজা উজীর হয় না, যাহারা হয় না, তাহারা কিরূপ জীবনযাপন করে, তাহার চিত্র পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে; আমাদের সমাজের নিম্নতম স্তরের জীবন এতদপেক্ষা অধিক লজ্জাকর নহে, বিশেষতঃ যখন মনে রাখা যায় যে, আমাদের সাধারণ লোক পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা কত দরিদ্র। ভারতবর্ষেই চাষী লাঙ্গল ঠেলিবার সময় গান গাহিয়াছে—

"মন তুমি কৃষিকাজ জান না,

এমন মানব-জনম রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।"

মাঝি দাঁড় টানিতে টানিতে গাহিয়াছে—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে"

কলু ঘানি চালাইতে চালাইতে গাহিয়াছে—

"মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।"

ভারতবর্ষেই ভিখারী ঘরে ঘরে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং ধর্ম্মসাধনা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত গাহিয়া যায়।

মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "একজন বহুদর্শী ইংরেজের সহিত এই বিষয়ে আমার কথোপকথন হইতেছিল।

তিনি বলিলেন, 'যদি ছোট লোক হইয়া জন্মিতে হয়, তবে ভারতবর্ষের ছোট লোক হওয়াই ভাল। অপর সকল সমাজের ছোট লোকরা পশুভাবাপন্ন, তাহাদের সহিত তুলনায় ইহারা দিব্যভাবাপন্ন'।" (সামাজিক প্রবন্ধ)।

রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন—

"From a careful survey and observation of the people and inhabitants of various parts of the country and in every condition of life. I am of opinion that the peasants or villagers who reside at a distance from large towns and head stations and courts of law are as innocent, temperate and moral in their conduct as the people of any country whatsoever" &c.

Quoted in Mr. P. N. Bose's National Education and Modern Progress.

"দেশের বিভিন্ন অংশের এবং সকল অবস্থার লোকদিগকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, নগর এবং বিচারালয় হইতে বহুদূরে যে সকল কৃষক এবং গ্রাম্য ব্যক্তি বাস করে, তাহারা যে কোনও দেশের লোক অপেক্ষা অধিক নির্দ্দোষ, মিতাচারী এবং পবিত্রচরিত্র।"

গান্ধীজি বলিয়াছেন—I ask you to accept the testimony given by Sir Thomas Munro, and I confirm that testimony, that the masses of India are really more cultured than any in the world.

Speech at Madras on the sea beach on the 8th April 1921.

"স্যার টমাস মনরো যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, আমি আপনাদিগকে তাহা বিশ্বাস করিতে বলি,—এবং আমি সে সাক্ষ্য সমর্থন করি, যে, ভারতের সাধারণ ব্যক্তি পৃথিবীর যে কোনও দেশের লোক অপেক্ষা অধিকতর সভ্য।"

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলিয়াছেন, যে, আমাদের দেশের দরিদ্র ব্যক্তিরা অপর দেশের দরিদ্র ব্যক্তি অপেক্ষা শান্ত, সংযত এবং ধর্ম্মবিষয়ে উন্নত। আপনারা অনেকে বোধ হয় সে গল্প শুনিয়াছেন যে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী যখন ইংলণ্ড গিয়াছিলেন, তখন এক জন কয়লার খনির কুলীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি যীশুখৃষ্টের বিষয় কি জান?" সে বলিয়াছিল, "তাহার নম্বর কত?" অর্থাৎ "তুমি ত এক জন কুলীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ। তাহার নম্বর বলিলে তাহাকে চিনিতে পারি।" এই সকল কুলী ধর্ম্মবিষয়ে কিরূপ উদাসীন, তাহা এই গল্প হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

জাতিভেদ হেতু সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীব লোকের মধ্যে বিদ্বেষের সঞ্চার হয়, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। অনিয়মিত জীবনসংগ্রামই বিদ্বেষের হেতু। "Each for himself and devil take the hindmost" "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সুবিধার চেষ্টায় থাকে, যে সর্ব্বাপেক্ষা পিছনে পড়ে, সে রাক্ষসের কবলে পড়ে" "Can I kill thee or canst thou kill me?" "আমি তোমাকে হত্যা করি, অথবা তুমি আমাকে হত্যা কর।" এই সকল বাক্য অনিয়মিত জীবন-সংগ্রামের স্বরূপ প্রকাশ করে। যাহারা জীবন-সংগ্রামে হটিয়া যায়, তাহাদের দুরবস্থার সীমা থাকে না, কাযে কাযেই ধনী লোকদের প্রতি তাহারা দারুণ বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে। French ও Russian Revolutionএ এই বিদ্বেষের আগুন প্রলয়ঙ্কররূপ ধারণ করিয়াছিল। জন্ম অনুসারে যদি কর্ম্ম নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে জীবন-সংগ্রাম নিয়মিত হয়, বিদ্বেষের ভাব কমিয়া যায়। এ জন্য পাশ্চাত্য জগতে নিম্নশ্রেণীর লোক উচ্চ শ্রেণীর প্রতি যেরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর প্রতি সেরূপ বিদ্বেষভাব কখনও পোষণ করে নাই। ব্রাহ্মণ তাহাকে ছুঁইল না, এ জন্য নিম্ন জাতি ব্রাহ্মণের প্রতি কখনও বিদ্বেষভাব পোষণ করে নাই। কারণ, ব্রাহ্মণই নিম্ন জাতির জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছে, এবং উচ্চ জাতির লোককে নিম্নজাতির জীবিকায় হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছে। আজকাল অনেকে নিম্নজাতির লোককে বলিতেছেন, "উচ্চ জাতির লোক তোমাদিগকে ঘৃণা করে,

কারণ, তাহারা তোমাদিগকে স্পর্শ করে না।" এই রূপ দীর্ঘকাল প্রচারের ফলে নিম্ন জাতির লোক উচ্চ জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে পারে, ইহা বিচিত্র নহে। বলা বাহুল্য, নিম্ন জাতির লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া, তাহাদের আর্থিক অবস্থা উন্নতির চেষ্টা করা, তাহাদিগকে পরিষ্কারভাবে জীবন যাপন করিবার উপায় দেওয়া অতি উত্তম কার্য্য। কিন্তু সেই উপলক্ষে যদি তাহাদিগকে বলা হয়—"উচ্চজাতির লোক তোমাদিগকে ঘৃণা করে," তাহা হইলে সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

জন্মের দ্বারা কাহাকেও বড়, কাহাকেও ছোট বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেই যে সমাজে অনৈক্য ও ঘৃণার সঞ্চার হইবে, ইহা মনে করা ভুল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জন্ম হেতুই কনিষ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে ভক্তি করিবে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে স্নেহ করিবে। এ কারণে কি উভয় ভ্রাতার মধ্যে ঐক্যের বন্ধন শিথিল হইবে, না উভয়ের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার হইবে? কনিষ্ঠ যদি জ্যেষ্ঠের সম্মান না করে, নিজকে জ্যেষ্ঠের সমান বলিয়া মনে করে, তাহা হইলেই কি ঐক্যের বন্ধন দৃঢ়তর হয়, না কনিষ্ঠের মঙ্গললাভের সম্ভাবনা সমধিক বর্দ্ধিত হয়? হইতে পারে যে, কোনও ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা কনিষ্ঠ অধিক গুণশালী। সে ক্ষেত্রে কি গুণানুসারে জ্যেষ্ঠের উচিত কনিষ্ঠকে প্রণাম করা? না, কনিষ্ঠের উচিত জন্মানুসারে জ্যেষ্ঠকে প্রণাম করা? আজকাল শুনা যায়, গুণহীন ব্রাহ্মণকে কিরূপে সম্মান করা যায়? ইহার উত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে চাহি যে, গুণ-দোষ লইয়া মানুষ। চেষ্টা করিলে সকলের মধ্যেই দোষ আবিষ্কার করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ নির্দ্দোষ হইলে তাহাকে ভক্তি করিবে, এরূপ স্থির করিয়া রাখিলে ভক্তি করিবার মত ব্রাহ্মণ পাওয়া দুরূহ হইবে। কনিষ্ঠের যেরূপ মনে করা উচিত যে, জ্যেষ্ঠের দোষগুণ বিচার করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয় নাই, বিচার না করিয়া জ্যেষ্ঠকে সম্মান করাই তাহার কর্ত্তব্য, তাহাতে তাহার কোনও ক্ষতি নাই, বরং লাভ আছে, ভগবান্ যে ব্যক্তিকে জ্যেষ্ঠ করিয়াছেন, তাহাকে সম্মান করিলে ভগবানের ব্যবস্থার প্রতিই সম্মান দেখান হয়, সেইরূপ নিম্নবর্ণের ব্যক্তির উচিত, উচ্চ বর্ণের ব্যক্তির দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে সম্মান করা, ইহাতে সম্মানকারীর কোনও অনিষ্ট হয় না, বরং ইষ্টলাভ হইবে। কারণ, ভগবান্ গুণকর্ম্ম বিচার করিয়া জন্মদান করিয়াছেন তাঁহার সে ব্যবস্থার প্রতি সম্মান দেখান হয়। সকল সাধারণ নিয়মের যেরূপ ব্যতিক্রম হইতে পারে, এই নিয়মগুলিরও সেইরূপ

ব্যতিক্রম হইতে পারে। মদ্যপায়ী দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণকেও যে সম্মান করিতে হইবে, আমার এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য নহে।

নিম্নবর্ণের উচিত ব্রাহ্মণকে সম্মান করা, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মণের উচিত নহে, কাহারও নিকট সম্মান দাবী করা।

মনু বলিয়াছেন,—

"সম্মানাদ্‌ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাংক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥"

"ব্রাহ্মণ সম্মানকে বিষের ন্যায় ভয় করিবে এবং অপমানকে অমৃতের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা করিবে।" পার্থিব সুখ ঐশ্বর্য্য যেরূপ কাহারও বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত নহে, লৌকিক সম্মানও সেইরূপ কাহারও বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত নহে। যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিতে হইবে—ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া ঈশ্বর-প্রীত্যর্থ কর্ত্তব্য করিতে হইবে,—লোক সম্মান করুক বা অপমান করুক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। সাধারণ মানব ভ্রমসঙ্কুল, তাহাদের কৃত সম্মান বা অপমানে কি আসিয়া যায়? মৃত্যুর পর লৌকিক সম্মান কিছু সুখ দিতে পারিবে না, লৌকিক অসম্মানে কোনও ব্যথা হইবে না।

যাঁহার কৃপা পাইলে শত দুঃখ ও অভাবগ্রস্ত দীন-দরিদ্রেরও জীবন সার্থক হয়, যাঁহার কৃপালাভ করিতে না পারিলে সকল সুখ ঐশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ সর্ব্বলোক-সম্মানিত জীবনও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, তাঁহার কৃপালাভ লক্ষ্য করিয়াই জীবনতরণী চালিত করিতে হইবে। বাহ্য সম্মানলাভ হইলে সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। তাই মনু বলিয়াছেন,—"সম্মানাদ্‌ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।" বাহ্য-জগতে অপমানিত হইলে অনেকে সান্ত্বনা-লাভের জন্য হৃদয়-গুহার মধ্যে অন্তর্য্যামীর সন্ধান করিয়া থাকেন, তাই মনু বলিয়াছেন' "অমৃতস্যেব চাকাংক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা।" সুতরাং যদি কোনও ব্রাহ্মণ সম্মানলাভের দাবী করেন, তাহা হইলে তিনি অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত আদর্শ অতি সুন্দর—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

"তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ হইবে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইবে। নিজে মান চাহিবে না, কিন্তু অপরের প্রাপ্য সম্মান দিবে এবং সদা হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।"

বস্তুতঃ সকলের সমান অধিকার প্রদান করিলে সমাজে শান্তিস্থাপন হয় না। কারণ, সকলেই বড় হইতে চেষ্টা করে, প্রত্যেকে নিজ ভোগ ঐশ্বর্য্য বাড়াইবার চেষ্টা করে; ইহার ফলে স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ হইয়া সমাজে অশান্তির সৃষ্টির হয়। কিন্তু সমাজে যে বড়, সে ছোটকে স্নেহ করিবে, যে ছোট, সে বড়কে সম্মান করিবে, সকলে নিজ নিজ বংশগত বৃত্তি অনুসরণ করিবে, এবং বাহ্য সুখ-ভোগ-বিষয়ে অল্পে সন্তুষ্ট থাকিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইবে, প্রত্যেক জাতির অন্তর্গত ব্যক্তি সকল নিজ জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য মিলিত হইবে, অপর জাতির সাহায্য অপরিহার্য্য বলিয়া অন্য জাতিব সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিবে, এইরূপ ব্যবস্থাই সামাজিক শান্তি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল। এইরূপ ব্যবস্থার উপর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। তাই শত শতাব্দীর রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া, দুর্দ্দিনের বহু ঝঞ্ঝাবাত অগ্রাহ্য করিয়া ভারতের জাতীয় জীবনতরী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। জাতীয় পরাধীনতার যুগেও ভারতের গ্রামে গ্রামে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করিয়া আসিয়াছে, পূজা-পার্ব্বণ সামাজিক উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আজ যদি আমরা পাশ্চাত্য মোহে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করি, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের পরিণাম ভয়াবহ হইবে সন্দেহ নাই। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।'

আমি বর্ণধর্ম্মের কথাই এতক্ষণ বলিলাম, কারণ, ইহা মঙ্গলজনক কি না, এ বিষয়ে আজকাল অনেকের সন্দেহ হইয়াছে। আশ্রমধর্ম্ম-বিষয়ে ততদূর সন্দেহ নাই। আশ্রম চারিটি;—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে গুরুগৃহে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা। এই সময় সকল প্রকার বিলাস বর্জ্জন করিতে হইবে, এবং গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া আনিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে এই ভিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। বিদ্যাশিক্ষা করিলে একটা অহঙ্কার হইবার আশঙ্কা আছে। সমাজ অন্নদান করিয়া যে বিদ্যাশিক্ষার্থীর জীবনরক্ষা করিতেছে, ইহা সে বিস্মৃত হয়। এ জন্য দেখিতে পাই যে, পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার্থীর জীবন বিলাসময় এবং জনসাধারণের প্রতি অবজ্ঞায় পরিপূর্ণ। এই অনিষ্টের প্রতীকারের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিলাসবর্জ্জন এবং গৃহস্থের গৃহে গৃহে ভিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ইহাতে ব্রহ্মচারীর মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে, সমাজের দানের উপরেই তাহার জীবিকা নির্ভর করিতেছে, এবং সমাজের কল্যাণসাধনার্থ নিযুক্ত হইলেই তাহার বিদ্যা সার্থক

হইবে। শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা এবং গুরুর প্রতি ভক্তি ব্রহ্মচারীর আর একটি লক্ষণ। ইহা ব্যতীত ছাত্রের মন বিদ্যাগ্রহণের উপযোগী হয় না উপযোগী না হইলে বিদ্যাশিক্ষা নিষ্ফল হয়।

ব্রহ্মচর্য্যের অব্যবহিত পরেই বিবাহ ও গার্হস্থ্য। জ্ঞান ও সংযম অভ্যাস দ্বারা চিত্তবৃত্তি আয়ত্ত করিবার পর গৃহস্থাশ্রম, ইহাতে ভোগ আছে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষার ফলে ভোগ উন্মার্গগামী হইতে পারে না। প্রতি পদে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে, গার্হস্থ্য আশ্রম নিজ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, সামাজিক কল্যাণের জন্য এবং নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য—পঞ্চ মহাযজ্ঞ, এই তত্ত্বই প্রচার করে। পঞ্চযজ্ঞের প্রথম যজ্ঞ অধ্যাপন—যে জ্ঞানলাভ করা হইয়াছে, উপযুক্ত পাত্রে তাহা দান করিতে হইবে। দ্বিতীয়—পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ, পূর্ব্বপুরুষদের নিকট আমাদের যে ঋণ, তাহা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা-নিবেদন। তৃতীয়—দৈবযজ্ঞ বা হোম, ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে যে সকল দেবতা আমাদের জীবনযাপনোপযোগী নানাবিধ দ্রব্য প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদের পূজা, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে হবিঃ-প্রদান। চতুর্থ—ভূতযজ্ঞ বা বলি; জগতের যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে যে এক পরমাত্মা বিরাজিত, তাহা স্মরণ করিয়া প্রাণীদিগকে নিত্য আহার-প্রদান। পঞ্চম—নৃযজ্ঞ বা অতিথিপূজন। সকল মানবই আমার পরমাত্মীয়, সকলকে সেবা করিবার, সকলের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিবার সুযোগ আমি পাই না, সকল মানবের প্রতিনিধিরূপে যে অতিথি আমার গৃহে উপস্থিত হয়, নারায়ণ জ্ঞানে তাহার সেবা করিতে হইবে। গৃহস্থ এই ভাবে পঞ্চ মহাযজ্ঞ পালন করিতে পারিলে তাহার জীবন সার্থক হয়, নচেৎ জীবনযাত্রায় অপরিহার্য্য প্রাণীপিড়ন করিয়া সে পাপের বোঝা বাড়ায় মাত্র। বলা বাহুল্য, পূজা, জপ, দান, গুরুজনের সেবা প্রতি গৃহস্থ-জীবনে অবশ্য কর্ত্তব্য। গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ। দেহাভিমান পরিত্যাগ করিবার ইহাই প্রথম সোপান। "আমি" এবং "আমার দেহ" যদি ভিন্ন বস্তু হয়, তাহা হইলে সংসারের প্রয়োজন কি? সংসারে থাকিলে "প্রকৃত আমির" সন্ধানে বাধা দেয়, "মিথ্যা আমি"কে "সত্য আমি" বলিয়া ভ্রম হয়। সত্য আমির সন্ধানের জন্য সংসার ত্যাগ করা প্রয়োজন। যাঁহাদের তাব্র বৈরাগ্য হইবে, তাঁহাদের সংসারত্যাগের জন্য পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না—তাঁহাদের পক্ষে ব্যবস্থা "যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ," যে দিন বৈরাগ্য হইবে, সেই দিন সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে। কিন্তু

তীব্র বৈরাগ্য সকলের হয় না। তাঁহাদের পক্ষে ব্যবস্থা—প্রথমে বানপ্রস্থ, পরে সন্ন্যাস। বানপ্রস্থাশ্রমে সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে হয়। এখানে আংশিক ত্যাগ, ঘরবাড়ী পুত্রকন্যা ঐশ্বর্য্য-সম্পদ ত্যাগ—তথাপি একটা আশ্রয় থাকে, সঙ্গে পত্নী থাকেন। কিছু দিন এখানে থাকিয়া যখন দেহাত্মবোধ ক্ষীণ হইয়া আসে, তখন সন্ন্যাস; গৃহ নাই, সঙ্গী নাই, সোজা চলিয়াছে—অরণ্য, প্রান্তর, গ্রাম, জনপদের মধ্য দিয়া, ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত-গ্রীষ্ম—সকলে সমবোধ—"দেহের সুখ-দুঃখ বোধ হয়, আত্মার এ সকল বোধ হয় না"—এইরূপ দৃঢ় ধারণা, এই ভাবে চলিতে চলিতে যখন দেহ হইতে প্রাণ নির্গত হয়, তখন আত্মা পরমাত্মাতে মিশিয়া যায়।

"নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা॥"

মনু ৬।৪৫

"মরণও আকাঙ্ক্ষা করিবে না, জীবনও আকাঙ্ক্ষা করিবে না; ভৃত্য যে ভাবে আদেশের প্রতীক্ষা করে, সেই ভাবে কালের প্রতীক্ষা করিবে।"

আপত্তি হইতে পারে, এক্ষণে হিন্দু-সমাজে কর্ম্মসঙ্কর বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে, এখন (অনেক স্থলে ব্রাহ্মণ শূদ্রের কর্ম্ম করে, শূদ্র ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করে) আর জাতিভেদ রক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু কর্ম্মসঙ্কর হেতু সমাজে যে অনিষ্ট হইয়াছে, জন্মসঙ্কর প্রচলিত করিলে সে অনিষ্টের কোনও প্রতীকার হইবে কি? বর্ণাশ্রমব্যবস্থা যদি কল্যাণজনক হয়, তাহা হইলে সেই ব্যবস্থা হইতে বিচ্যুতি যাহাতে বর্দ্ধিত না হয়, এ বিষয়ে আমাদের যত্নবান্ হওয়া উচিত। কর্ম্মসঙ্কর হেতু যে অনিষ্ট হইয়াছে, জন্মসঙ্কর প্রবর্ত্তন করিলে সে অনিষ্ট বর্দ্ধিত হইবে, সুতরাং তাহাতে বাধা দেওয়া উচিত। Ten commandmentsএর দুইটি commandment লঙ্ঘন করা হইয়াছে, এ হেতু আরও দুইটি commandment লঙ্ঘন করা কি যুক্তিসঙ্গত? জন্মসঙ্কর নিবারণ করিলে এবং সদাচার রক্ষিত হইলে ভবিষ্যতে বর্ণোচিত কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভবপর। জন্মসঙ্কর প্রচলিত হইলে সে আশা সুদূরপরাহত হইবে। কারণ, বংশগত জীবের বৈশিষ্ট্য সংস্কারের অভাবে ক্ষীণ হইলেও বহুকাল বিদ্যমান থাকে। কিন্তু জন্মসঙ্কর প্রচলিত হইলে বীজের বৈশিষ্ট্য শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

ভারতবর্ষে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের সংখ্যা বিরল হইলেও এখনও

দেশে অনেক প্রকৃত ব্রাহ্মণ আছেন—নির্লোভ, পরোপকারী, ঈশ্বরে নির্ভরশীল, দারিদ্র্যব্রতধারী ব্রাহ্মণ। দেশবাসীর সুগভীর ঔদাসীন্য সত্ত্বেও, বিজাতীয় প্রথায় তথাকথিত উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ও পাশ্চাত্য-মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিকূলতা এবং পরিহাস সত্ত্বেও এখনও যে অনেক ব্রাহ্মণ প্রাণপণে প্রাচীন আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচায়ক এবং প্রাচীন আদর্শের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতে যদি আবার কখনও সুদিন ফিরিয়া আসে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অত্যুগ্র আলোকের মোহ কাটাইয়া আবার যদি ভারতবাসী তাহার নিজস্ব প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকে নিজের ঘরের নিজের জিনিষের যথার্থ আদর করিতে শিখে, তাহা হইলে যে অল্প-সংখ্যক ব্রাহ্মণ আজিকার দুর্দ্দিনে দৈন্যের অন্ধকার এবং বিদ্রূপের শিলাবর্ষণ সহ্য করিয়াও বুকের রক্ত দিয়া প্রাচীন ভারতের শাশ্বত আদর্শ বাঁচাইয়া রাখিতেছেন, তাঁহাদের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। এক্ষণে যাঁহারা প্রাচীন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাঁহাদের উচিত এই সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বৃত্তির ব্যবস্থা করা, তাঁহাদের উক্তির সমর্থন করা এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবার চেষ্টা করা।

জীবিকার জন্য যাঁহারা অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যে ধর্ম্ম ও সদাচার সকলই বিসর্জ্জন করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। সন্ধ্যা-আহ্নিক করা, ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন করা, নিষিদ্ধ আহার বর্জ্জন করা, অনেক পরিমাণে সদাচার রক্ষা করা, চাকুরী করিতে করিতেও অনায়াসে করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে অবহেলা করিবার কারণ আমাদের আলস্য ও ঔদাসীন্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এ বিষয়ে আমরা মুসলমানগণের নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিয়মিত নমাজ পাঠ করেন। ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াও তাঁহারা ইহা বর্জ্জন করেন নাই। আমরাই ইংরাজী পড়িয়া শিখিয়াছি—পূজা-আহ্নিক করা, সদাচার রক্ষা করা উপহাসের বস্তু। এরূপ অধর্ম্মাচরণের ফলে আমরা যে দুঃখ পাইব, ইহা বিচিত্র নহে।

আজকাল অনেক ব্যক্তির মুখে শুনা যায় যে, জাতিভেদের ফলে ভারতবর্ষের অবনতি হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তির ধারণা, জাতিভেদের ফলে সমাজে একতার অভাব হইয়াছে, এ কারণে অবনতি হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, যে, এ ধারণা সত্য নহে। অনিয়মিত জীবন-সংগ্রামই সমাজে অনৈক্য উৎপাদন করে, জাতিভেদপ্রথায় জীবন-সংগ্রাম নিয়মিত হইবার ফলে সমাজে

শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপিত হয়। বাস্তবিক পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে কথনও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিব মধ্যে কলহ বা যুদ্ধ হইয়াছিল, এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ক্ষত্রিয় সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণের তপস্যায় সাহায্য করিয়াছে এবং শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশমত রাজ্য পালন করিয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্বে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশে যে সকল জ্ঞানী ও বিদ্বান্ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহারা কেহই জাতিভেদকে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর মনে করেন নাই। ব্যাস ও বাল্মীকি ইহার মহিমা প্রচার করিয়াছেন; কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য্য রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, মাধবাচার্য্য, সায়নাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রচারকগণ, কালিদাস, ভবভূতি, তুলসীদাস প্রভৃতি কবিগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রেব উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হিন্দুশাস্ত্রে প্রধান ভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের পরই এই কথা উঠিয়াছে যে জাতি বিভাগ সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। ইংরাজী শিক্ষায় যাঁহারা অতিরিক্ত আস্থাসম্পন্ন, যাঁহারা ইংরাজদের ধর্ম্ম এবং সমাজের অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করেন, প্রধানতঃ তাঁহারাই এই কথা বলিতেছেন। এমন ত হইতে পারে না যে, ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্বে দেশে কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি আবির্ভূত হন নাই। এ জন্য সন্দেহ হয় জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ ইংরাজের অনুচিকীর্ষাই জাতিভেদের প্রতি দোষারোপের কারণ। একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান কবিলে দেখা যাইবে যে, হিন্দুজাতির ইতিহাস অপর সকল প্রাচীন জাতির ইতিহাস অপেক্ষা কম গৌরবজনক নহে। ব্যাবিলনীয়া ফিনিশিয়া, কার্থেজ, মিশর গ্রীস ও রোমে যে সভ্যতা বিকশিত হইয়াছিল, আজ তাহা কোথায়? মৃত্তিকা-স্তরের নীচে তাহার ক্ষীণ নিদর্শন পাওয়া যায় মাত্র। যাদুঘরে যাইলে ইহাদের স্বরূপ কতকটা অনুমান করা যায়। এই সকল জাতি অপেক্ষাও প্রাচীন হিন্দু-জাতির সভ্যতা এখনও ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। কেবল যে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা নহে, অনেক বিষয়ে নিজ স্বরূপ অবিকল রক্ষা করিয়াছে। তিন চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য-ঋষিগণ যে সকল বৈদিক মন্ত্র গান করিতেন, আজিও আসমুদ্র হিমাচল বহু মন্দিরে ও গৃহপ্রাঙ্গণে সেই সকল মন্ত্র গান হইয়া থাকে; প্রাতে ও সন্ধ্যায় লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ সেই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া থাকেন; বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারে সেই সকল মন্ত্র

উচ্চারিত হয়। মুসলমান-রাজত্বের সময় হিন্দু নামে মাত্র পরাধীন হইয়াছিল, বাদশাহার কর্ম্মচারীকে কর দেওয়া ছাড়া অধীনতার অপর বিশেষ কোনও লক্ষণ ছিল না, কচিৎ দুই এক জন অত্যাচারী সম্রাট লুঠপাট বা মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল,—আবার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, সমাজ স্বাভাবিক ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল। ধর্ম্ম, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুরা নিজ বিশেষত্ব পরিত্যাগ করে নাই। মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল, ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, হিন্দু সভ্যতা অপকৃষ্ট ছিল। ভূদেব বাবু বলিয়াছেন,—

"কোনও সমাজ অন্য কর্ত্তৃক বিজিত হইলেই যে তাহাকে অপকৃষ্ট বলিতে হয়, তাহা নহে। মূর্খ স্পার্টিয়েরা পণ্ডিত এথিনীয়দিগকে জয় করিয়াছিল, অসভ্য ম্যাকিডনিয়েরা গ্রীকদিগকে অধীন করিয়াছিল, বন্য তাতারীয়েরাও সুসভ্য চীনীয়দিগকে পরাজয় করিয়াছিল,অসভ্য বর্ব্বর জাতীয়েরা রোম সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, পশুপাল্যোপজীবী আহমেরা সুসমৃদ্ধ আসাম দেশকে অধিকার করিয়াছিল। যে যুদ্ধে হারে, সে হীন, এটা গোঁয়ারের কথা, বিচক্ষণ লোকের কথা নহে,।" (সামাজিক প্রবন্ধ ৩৫-৩৬ পৃঃ)

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "আরবেরা একপ্রকার দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল। * * * তাহারা মিশর ও সিরিয়দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, তুর্কস্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণ অধিকার করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ-জয়ের জন্য তিন শত বৎসর ধরিয়া যত্ন করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই।" (ভারতবর্ষ পরাধীন কেন ?" বিবিধ প্রবন্ধ) পুনশ্চ এই প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"যখন কোনও প্রাচীন দেশের নিকট নব অভ্যুদয়-বিশিষ্ট বিজয়াভিলাষী জাতি অবস্থান করে তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ সর্ব্বান্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি—প্রাচীন যুরোপে রোমকেরা, এসিয়ায় আরব্য এবং তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের সংস্রবে আসিয়াছে, তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদের অধীন হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যতদূর দুর্জ্জেয় হইয়াছিল, এতাদৃশ আর কোনও জাতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্ত্তৃক যত অল্পকালমধ্যে মিশর উত্তর-আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য, তুরস্ক এবং কাবুলরাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে

গ্রাস আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসরমধ্যে ঐ রাজ্য একেবারে নিঃশেষে বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দে প্রথম রোমকদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দে অর্থাৎ ১২০ বৎসরমধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্ত্তৃক ধ্বংসিত হয়। পূর্ব্বরোমক বা গ্রীস সাম্রাজ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরকীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ পঞ্চদশ বৎসরমধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম রোমক,—যাহার নাম অদ্যাপি জগতের বীরদর্পের পতাকাস্বরূপ,—তাহাই ২৮৬ খৃঃ অব্দে উত্তরীয় বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ প্রথম বর্ব্বর-বিপ্লবের ১৯০ বৎসরমধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খৃঃ অব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদব্দ হইতে ৫২৯ বৎসর পরে শাহাবুদ্দিন ঘোরী কর্ত্তৃক উত্তর ভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দিন বা তাঁহার অনুচর আরব্যজাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেরূপ বিফলযত্ন হইয়াছিল, গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রূপ। যাহারা পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তর-ভারত অপহরণ করে, তাহারা পাঠান বা আফগান। পাঠানেরা কখনই আরব্য বা তুরকীবংশীয়দিগের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে। তাহারা কেবল পূর্ব্বগত আরব্য এবং তুরকীয়দের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য, তুরকী এবং পাঠান এই তিন জাতির যত্ন-পারম্পর্য্যে সার্দ্ধ পাঁচ শত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়।"

পৃথ্বীরাজ প্রথমে শাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং দয়া করিয়া প্রাণদান করেন। পরে শাহাবুদ্দিন সন্ধি করিবার প্রস্তাব পাঠাইয়া অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া হিন্দুগণকে পরাস্ত করেন। অতএব হিন্দুর পরাধীনতার একটা কারণ শাহাবুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা। অপর কারণ গৃহ-বিবাদ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে বিরোধ নহে—জ্ঞাতিবিরোধ, পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রের শত্রুতা। জাতিভেদকে কোনওরূপে পরাধীনতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। কয়েকশত বৎসর পাঠান-রাজত্বের পর পাঠানের রাজশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, হিন্দু-রাজশক্তি আবার প্রতাপশালী হয়। বাবরের আবির্ভাব না হইলে হিন্দুগণ স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিত সন্দেহ নাই। পুনশ্চ কয়েক শত বৎসর মোগল-রাজত্বের পর মোগল-রাজশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। পুনরায় হিন্দু শক্তির অভ্যুদয় হয়। এই সময় নবীন পাশ্চাত্য জাতির আবির্ভাব না হইলে ভারতের পুনরায় হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপিত হইত সন্দেহ নাই। সুতরাং

হিন্দু জাতির এমন একটি বিশেষত্ব ছিল, যাহার ফলে পরাধীন হইয়াও সে নিস্তেজ হয় নাই, এবং স্বাধীনতা উদ্ধারের চেষ্টায় বারম্বার পুনর্জীবনের পরিচয় দিয়াছে। অপর কোনও জাতি এরূপ করিতে পারে নাই। ভারতের ইতিহাস এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস তুলনা করিয়া মহামতি Todd লিখিয়াছেন—

What nation on earth would have maintained the semblance of civilization, the spirit or the customs of their forefathers, during so many centuries of overwhelming oppression but one of such singular character as the Rajputs ? * * How did the Britons at once sink under the Romans and in vain strove to save their groves, their Druids or their altars of Bal from destruction ! To the Saxons they alike succumbed ; and this heterogenous to the Normans. Empire was lost or gained by a single battle and the laws and religion of the conquered merged in those of the conqueror. Contrast with these the Rajputs ; not an iota of their religions and customs have they lost though many an acre of land [Annals of Mewar, chapter V],

"রাজপুতদের ন্যায় অসাধারণ চরিত্রের জাতি ব্যতীত পৃথিবীর অপর কোন্ জাতি বহু শতাব্দীব্যাপী প্রভূত অত্যাচার সত্ত্বেও নিজ সভ্যতা এবং পূর্ব্বপুরুষদের ভাব এবং আচার রক্ষা করিতে সমর্থ হইত? * * * বৃটনরা কি ভাবে রোমানদের অধীনতা স্বীকার করিল ! তাহাদের উপবন, পুরোহিত এবং "বল" দেবতার বেদি রক্ষা করিবার জন্য তাহারা বৃথাই চেষ্টা করিয়াছিল। সেই ভাবেই তাহারা স্যাক্সনদের অধীন হইল, পুনরায় তাহারা ডেন জাতির অধীন হইল, এবং এই মিশ্রজাতি নরম্যানদের অধীন হইল। এক একটী যুদ্ধে এক-একটি রাজত্ব ধ্বংস বা প্রতিষ্ঠা হইল এবং বিজিত জাতির ধর্ম্ম এবং ব্যবহার (law) বিজেতা জাতির ধর্ম্ম ও ব্যবহারে বিলীন হইল। ইহাদের সহিত রাজপুতদের কত প্রভেদ দেখ ; যদিও রাজপুতরা বহু ভূখণ্ড হারাইয়াছে, তথাপি তাহাদের ধর্ম্ম এবং আচার এক বিন্দুও হারায় নাই।"

ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, হিন্দু-সমাজের এমন একটা বিশেষত্ব ছিল, যাহার ফলে সে সুদীর্ঘকাল নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম,

দর্শন, সাহিত্য, শিল্প সকল বিষয়ে প্রভূত উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, পরাধীনতার সময় নিজ ধর্ম্ম এবং কৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং বারম্বার স্বাধীন রাজ্য স্থান করিবার প্রশংসার্হ উদ্যম করিয়াছিল। বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে হিন্দু-সমাজের প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মই হিন্দু জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে এবং বলবীর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আজকাল যে দৈহিক অবনতি দেখা যায়, তাহার প্রধান কারণ অনাচার, বিলাস, দারিদ্র্য এবং ম্যালেরিয়া। মুসলমান-রাজত্বের সময় এরূপ দৈহিক অবনতি হয় নাই, কারণ, সে সময় সমাজে অনাচারের প্রাবল্য হয় নাই। ফলতঃ যত দিন হিন্দু স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল, তত-দিন সে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে এবং অবান্তরকারণে পরাধীন হইলেও নিজ শক্তি এবং শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল অনেক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি পাশ্চাত্য মোহের প্রভাবে এবং দাসজনসুলভ অনুচিকীর্ষায় প্রণোদিত হইয়া যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম হিন্দু-সমাজের শক্তির প্রকৃত কারণ, তাহা ধ্বংশ করিতে অথবা যথেচ্ছভাবে পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাঁহারা সমাজের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যাঁহাদের ঋষি এবং সাধু মহাপুরুষদের উপর আস্থা আছে, আধুনিক অশাস্ত্রীয় আন্দোলনের প্রতিরোধকল্পে তাঁহাদের সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, কারণ,—সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে।

(মাসিক বসুমতী—আষাঢ়, ১৩৪০)

উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম

বেদ বলিয়াছেন, "ন হি অবেদবিদ্ মনুতে তং বৃহন্তং" অর্থাৎ যিনি বেদজ্ঞ নহেন, তিনি সেই বৃহৎ ব্রহ্মকে ভাবিতে পারেন না। কিন্তু সকল ধর্ম্মেই ত ঈশ্বর আছেন। বিভিন্ন ধর্ম্মের বিশিষ্ট সাধু মহাত্মাগণ কি ঈশ্বর লাভ করেন না? বেদের এই উক্তি কি সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক?

আমাদের মনে হয় যে, বেদের এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য, ইহা সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক নহে। মুসলমান ও খৃষ্টানগণ ধর্ম্মগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া চলিলে মৃত্যুর পরে স্বর্গে দীর্ঘকাল সুখভোগ করা যায়, এবং ঈশ্বর স্বর্গে থাকেন। এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থে অনন্তকাল স্বর্গে বাস করিবার কথা আছে, কিন্তু সৎকর্ম্মের ফলে অনন্তকাল স্বর্গবাস যুক্তি-যুক্ত নহে। কারণ, কোনও ব্যক্তি যে সকল সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহা সসীম বা সান্ত (finite), তাহার ফল (infinite) অনন্ত হইতে পারে না। সেই প্রকার অনন্ত নরকের কল্পনা ও যুক্তিহীন এবং হৃদয়হীন, বিশেষতঃ এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থে যখন বলা হইয়াছে যে, তাহাদের ধর্ম্মে বিশ্বাস না করিলেই অনন্ত নরক; অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই সকল গ্রন্থে অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরক বলিয়া যাহা উল্লেখ আছে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বর্গ ও নরক ব্যতীত আর কিছু নহে। মানবের দীর্ঘতম পরমায়ু কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর। তাহার তুলনায় স্বর্গে দশসহস্র বৎসর বাস অতিশয় দীর্ঘকাল, এত দীর্ঘকাল যে, তাহাকে অনন্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থে স্বর্গকে অনন্ত বলিবার আর একটা কারণ— এইদশ সহস্র বৎসর পরে, স্বর্গবাস শেষ হইলে তাহাব পরে, কি গতি হইবে, এত বেশী দূরদৃষ্টি হয় ত ঐ গ্রন্থকারগণের ছিল না, কালেব অনন্ত পরিমাণ হিন্দু শাস্ত্রকারগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, অনন্তকালের তুলনায়, দশ সহস্র বৎসর ও ক্ষণস্থায়ী, দশ সহস্র বা বিংশ সহস্র বৎসর স্বর্গবাসের পর জীবের কি গতি হয়, তাহাও তাঁহারা দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা বলিয়াছেন যে, স্বর্গবাস অনন্ত নহে, সান্ত।

খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মে যে ঈশ্বরের কথা আছে, তাঁহার সহিত চতুর্মুখ ব্রহ্মার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদুক্ত ব্রহ্মের কল্পনা তাহা

অপেক্ষা আরও উচ্চ। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে জগতের ব্যাপার সকল নিষ্পন্ন হয়। "উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ" (ঋগেদ সংহিতা, হিরণ্যগর্ভসূক্ত) অর্থাৎ দেবগণ যাঁহার আদেশ পালন করেন। যিনি হিন্দুর নিকট ব্রহ্মা, তিনি খৃষ্টানের নিকট খৃষ্ট বা তাঁহার পিতা। তিনিই মুসলমানের নিকট আল্লা। হিন্দু তাঁহাকে ব্রহ্মা রূপে উপাসনা করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, খৃষ্টান তাঁহাকে খৃষ্ট রূপে উপাসনা করিয়া স্বর্গে গমন করিয়া তাঁহাকে খৃষ্ট রূপে প্রাপ্ত হয়, মুসলমান তাঁহাকে আল্লারূপে উপাসনা করিয়া স্বর্গে গিয়া তাঁহাকে আল্লারূপে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই ভাবে তাঁহাকে পাইলে অনন্তকালের জন্য পাওয়া হয় না। এই সকল স্বর্গলোকই অনন্তকাল স্থায়ী নহে, স্বর্গ বাস কিরূপে অনন্তকাল ধরিয়া হইতে পারে?

উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ যে ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই বস্তু মুসলমান এবং খৃষ্টানের ভজনীয় ঈশ্বর হইতে বহু উচ্চ।

"যৎ তৎ অদৃশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃ শ্রোত্রম্ তৎ অপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তৎ অব্যয়ং তৎ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" (মুণ্ডকোপনিষদ)। অনুবাদঃ—"তাহা অদৃশ্য, তাহা হস্তাদি দ্বারা গ্রহণীয় নহে, তাহা কোনও বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় নাই, তাহার বর্ণ নাই, চক্ষু-কর্ণ নাই, হস্ত-পদ নাই, তাহা নিত্য সর্ব্বব্যাপক, সকল বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট, অনন্ত সূক্ষ্ম, পরিবর্ত্তন-রহিত, সকল প্রাণীর উৎপত্তিস্থল, ধীমান্ ব্যক্তিগণ তাহা দর্শন করিতে পারে।"

এই উপনিষদ্-বাক্যে ব্রহ্মকে প্রথমে অদৃশ্য বলা হইল এবং শেষে বলা হইল যে, ধীমান্ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে। এই দুইটি কথা আপাততঃ পরস্পর বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রহ্মকে অদৃশ্য বলিবার অর্থ এই যে, চক্ষু দ্বারা যেরূপ বাহ্য বস্তু দর্শন করা যায়, সেই ভাবে ব্রহ্মকে দর্শন করা যায় না। কিন্তু কামনাহীন বিশুদ্ধ মন দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করা যায়, তখন দেখা যায় যে, জগতে সর্ব্বত্রই তিনি রহিয়াছেন, এজন্য বলা হইয়াছে যে, ধীমান্ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে "পরিপশ্যন্তি" চারিদিকেই তাঁহাকে দেখেন—সম্মুখে তিনি, পশ্চাতে তিনি, উর্দ্ধে তিনি, অধোভাগে তিনি। এইভাবে ঈশ্বরের দর্শন পাইয়া অর্জ্জুন ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—

'নমঃ পুরস্তাদথপৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।'

"তোমাকে সম্মুখে প্রণাম, পশ্চাতে প্রণাম, জগতের সকল বস্তুই তুমি। তোমাকে সকল প্রকারে প্রণাম।"

উপনিষদে পুনরায় ব্রহ্মের স্বরূপ এই ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি" যাঁহা হইতে সকল প্রাণীর উৎপত্তি, যাঁহার দ্বারা সকল প্রাণী প্রাণ ধারণ করে, মৃত্যুর সময় যাঁহাতে প্রবেশ করে, ব্রহ্ম কেবল প্রাণীগণের উৎপত্তিস্থল নহেন, তিনি নিখিল বিশ্বের উৎপত্তিস্থল। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্", এই সকলই (নিখিল বিশ্বই) ব্রহ্ম, (কারণ সকল বস্তুই) ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, প্রলয়ের সময় ব্রহ্মেই বিলীন হইতেছে।

এই প্রকার যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে পাইবার উপায়, কোনও কর্ম নহে, তাঁহাকে পাইবার উপায় জ্ঞান, তাঁহাকে জানা, অজ্ঞানের অপসারণ, যে অজ্ঞানের ফলে তাঁহার মধ্যে থাকিয়াও আমরা তাঁহাকে অনুভব করিতে পারি না; তাঁহাকে পাইবার ফল, মোক্ষ, দীর্ঘকালের জন্য নহে, চিরকালের জন্য মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ।

'তম্ এব বিদিত্বা অতি মৃত্যুম্ এতি,
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।'

"কেবল তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, মোক্ষ লাভের জন্য অন্য উপায় নাই।"

তাঁহাকে জানিবার উপায়,—ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে মোক্ষ। একজন চিন্তাশীল ব্রাহ্ম লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায় বলিয়াছেন, "জ্ঞান হইতে মোক্ষ হইবে, একথা বলিবার সাহস কেবল হিন্দুধর্ম্মের হইয়াছে, অন্য কোনও ধর্ম্মের হয় নাই।" ইহার কারণ এই যে, হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মে মোক্ষের যথার্থ স্বরূপ কল্পনা করিতে পারে নাই। মোক্ষের অনেক নীচের অবস্থা স্বর্গ সুখভোগ, ইহাই অন্য সকল ধর্ম্মে জীবের শ্রেষ্ঠ গতি বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। স্বর্গলাভের উপায় অনেক, জগতের স্রষ্টাকে যে কোনরূপে পূজা করিলেই স্বর্গবাস হইতে পারে। তাহা খুব দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিয়া অন্যধর্মপ্রচারকের নিকট তাহাই অনন্তকাল স্থায়ী বলিয়া মনে হইতে পারে, তাঁহারা ইহার "অন্ত" দেখিতে পান না; এজন্য ইহাই "অনন্ত" বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উপনিষদের ঋষিগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। স্বর্গসুখ অপেক্ষা অনন্তগুণ সুখ, স্বর্গবাস অপেক্ষা অনন্তগুণ

দীর্ঘকাল স্থায়ী মোক্ষের অবস্থা তাঁহারা দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাও দর্শন করিয়াছিলেন যে, উপনিষদুক্ত ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই এই অবস্থা লাভ হয়, তাই তাঁহারা অন্য ক্ষুদ্র জ্ঞানের প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন,—

'তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি,—

উপনিষদে যে পুরুষের কথা আছে, তাঁহার কথা জানিতে চাহি, কারণ— 'ন হি অবেদবিদ্ মনুতে তং বৃহন্তং' যিনি বেদবিদ্ নহেন, তিনি সেই বৃহৎ বস্তুকে ভাবিতে পারেন না।

শঙ্কর ও রামানুজ

শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিশেষ, শুভ বা অশুভ কোনও প্রকার গুণ তাঁহার নাই। ঈশ্বরকে দয়ালু ও সর্বশক্তিমান বলা হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এক নহেন। মায়াযুক্ত ব্রহ্মকে ঈশ্বর কহে। কাঁচের কোন বর্ণ নাই; কিন্তু নিকটে যদি জবাফুল থাকে, তাহা হইলে কাঁচকে লালবর্ণের বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ ব্রহ্মের কোন গুণ নাই, কিন্তু মায়ার সান্নিধ্য বশতঃ ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। জবাফুলকে কাঁচের উপাধি এবং মায়াকে ব্রহ্মের উপাধি বলা হয়। ব্রহ্মের যেমন কোন গুণ নাই, সেইরূপ ব্রহ্মকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, অর্থাৎ ইহা বলা যায় না যে ব্রহ্ম এই প্রকারের।

অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘং

তাঁহাকে স্থূল বা সূক্ষ্ম, হ্রস্ব ব দীর্ঘ বলা যায় না।

রামানুজ কিন্তু এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম -অসংখ্য কল্যাণগুণের আধার এবং সকলপ্রকার দোষবর্জ্জিত। ঈশ্বর এবং ব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই। ব্রহ্ম নির্গুণও নহেন, নির্বিশেষও নহেন। রামানুজের মতে

নির্বিশেষ বস্তু হইতেই পারে না। কারণ নির্বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রয়োগ করা যায় না, সকল প্রমাণ সবিশেষ বস্তু প্রতিপাদন করে। এ কথাও বলিতে পার না যে,—নির্বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করা না যাইতে পারে, কিন্তু এরূপ বস্তু অনুভব করা যায়। কারণ সকল অনুভব সবিশেষ। সবিশেষ অনুভব হইতে নির্বিশেষ অনুভব নিষ্কর্ষণ করিবার যতই চেষ্টা কর, তাহার মধ্যে কিছু বিশিষ্টতা থাকিয়া যাইবেই,—অর্থাৎ সে অনুভব সবিশেষই থাকিবে। শব্দময় বেদ দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হইতে পারে না, কারণ শব্দ সবিশেষ. বস্তুকেই বোঝায়, নির্বিশেষ বস্তু বুঝাইবার শব্দের কোন সামর্থ্য নাই।

রামানুজের মতে বেদান্ত বাক্য সকল নির্বিশেষ নিগুর্ণ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে না ; সবিশেষ সগুণ ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে। জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন,—

সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং
তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় তত্তেজোঽসৃজত ইত্যাদি।

"হে সৌম্য, পূর্বে সেই একমাত্র সৎ ব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না ; তিনি ইচ্ছা করিলেন 'আমি বহু হইব, সৃষ্টি করিব' ; তিনি তেজ (অগ্নি) সৃষ্টি করিলেন" এই শ্রুতি বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারন এবং যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সৃষ্টি করিতে পারেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব, সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণ আছে। অতএব শ্রুতি-বাক্য নিগুর্ণ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করেন না, সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করেন।

শ্রুতি বলিয়াছেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম

শঙ্করাচার্য্য বলেন যে এখানে সত্য, জ্ঞান এবং অনন্তকে ব্রহ্মের গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই, ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই ব্রহ্ম, যাহা জ্ঞান তাহাই ব্রহ্ম, যাহা অনন্ত তাহাই ব্রহ্ম। কিন্তু রামানুজ বলেন তাহা নহে। এখানে সত্য জ্ঞান এবং অসীমতাকে ব্রহ্মের গুণ বলিয়া নির্দে'শ করা হইয়াছে। সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত সকলেই যদি এক বস্তুকেই (ব্রহ্মকেই) বুঝাইত, তাহা হইলে সত্য শব্দের অর্থ এবং জ্ঞান শব্দের অর্থ এক হইত, কিন্তু তাহা নহে। অতএব সত্য, জ্ঞান প্রভৃতি ব্রহ্মের বিশেষণ।

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে কোথাও নির্গুণ বলা হইয়াছে, কোথাও সগুণ বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বলেন নির্গুণবাচক শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করে, সগুণবাচক শ্রুতি মায়ারূপ উপাধিযুক্ত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ নির্গুণবাচক শ্রুতি-ই ঠিক; সগুণবাচক শ্রুতি ঠিক নহে! রামানুজের মতে সগুণ ও নির্গুণবাচক শ্রুতি উভয়ই ব্রহ্মের স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। সগুণবাচক শ্রুতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম অনন্ত রকমের কল্যাণগুণযুক্ত; নির্গুণবাচক শ্রুতির উদ্দেশ্য ব্রহ্মে কোন নিকৃষ্ট গুণের লেশমাত্রও নাই। রামানুজ বলেন যে, কতকগুলি শ্রুতি গ্রহণ করিয়া, অপর কতকগুলি পরিত্যাগ করা ঠিক নহে। শ্রুতি যে ব্রহ্মকে কল্যাণগুণযুক্ত এবং নিকৃষ্টগুণরহিত বলিয়া প্রতিপাদন করেন, তাহা নিম্নলিখিত শ্রুতি-বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—

এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো
বিজিঘিৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ

"এই আত্মার পাপ নাই, জরা মৃত্যু ও শোক নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই; ইনি সত্যকাম এবং সত্যসংকল্প।" এখানে ব্রহ্মে নিকৃষ্ট গুণগুলি নিষেধ করিয়া উৎকৃষ্ট গুণগুলি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব যেখানে কেবল সগুণবাচক শ্রুতি আছে তাহার উদ্দেশ্য যে, ব্রহ্ম কল্যাণগুণযুক্ত; যেখানে কেবল নির্গুণ-বাচক শ্রুতি আছে তাহার উদ্দেশ্য ব্রহ্ম দোষরহিত।

শঙ্করাচার্য্য বলেন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; আমাদের যে মনে হয় বিশাল বিচিত্র জগৎ রহিয়াছে তাহা মনের ভ্রম; একমাত্র ব্রহ্মই আছেন আর কিছুই নাই। রামানুজ ইহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন শ্রুতিতে নানা স্থানে জগৎ-সৃষ্টির কথা আছে। জগৎ যদি মনের ভ্রম হইবে, তাহা হইলে এই সকল শ্রুতি-বাক্য নিরর্থক বলিতে হইবে। ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে বটে "তুমিই সত্য" "তুমিই পরমার্থ।" তাহার উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে জগৎ মিথ্যা। উদ্দেশ্য এই যে জগতের যাবতীয় বস্তু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মেই অবস্থান করে এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয়; অতএব সকল বস্তুই ব্রহ্মাত্মক; অতএব ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নাই। জগৎকে যেখানে "নাস্তি" বলা হইয়াছে, সেখনে উদ্দেশ্য এই যে জগৎ বিনাশশীল, জগতের প্রতি বস্তুর প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তন হইতেছে। যাহার আদি অন্ত নাই, যাহা সর্বদা একরূপ,

যাহার কথনও বিনাশ হয় না, সেইরূপ বস্তুকেই অস্তি বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম ও জীব সেরূপ বস্তু, এজন্য তাহাদিগকে অস্তি বলা হইয়াছে। জগৎ সেরূপ বস্তু নহে, এজন্য তাহাকে নাস্তি বলা হইয়াছে।

জগৎ যদি মিথ্যা, তাহা হইলে জগৎ আছে এইরূপ ভ্রম হয় কেন? শঙ্করাচার্য্য বলেন, অবিদ্যার ফলে এইরূপ ভ্রম উৎপন্ন হয়। এই অবিদ্যার অপর নাম অজ্ঞান বা মায়া। ইহা কিরূপ বস্তু তাহার পরিচয় দিবার সময় শঙ্করাচার্য্য বলেন, ইহা সৎ নহে, কারণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু; আবার ইহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসৎও নহে; ইহা জ্ঞানের অভাব মাত্র নহে, ইহা ভাবরূপ বস্তু। অর্থাৎ জ্ঞানের অভাবকে অজ্ঞান বলা হয় না, অজ্ঞান বলিয়া একটা বস্তু আছে; ইহার স্বরূপ অনির্বচনীয়। এই অবিদ্যার প্রভাবে জীব বুঝিতে পারে না যে সে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, কারণ এই অবিদ্যা ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া থাকে।

রামানুজ এই প্রকারের অবিদ্যা বা অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, এমন কোন বস্তু থাকিতে পারেন না, যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে; সকল বস্তুই হয় সৎ, নয় অসৎ। রামানুজ যে অবিদ্যা স্বীকার করেন তাহা ভিন্ন প্রকারের,—তাহা জীবের পূর্বকৃত কর্মের ফল। এই অবিদ্যা হেতু জীব ব্রহ্মকে অনুভব করিতে পারে না এবং সংসারে কষ্ট পাইয়া থাকে। এই অবিদ্যা ব্যতীত মায়াকেও রামানুজ স্বীকার করেন; সেই মায়া ব্রহ্মের শক্তি; তাহা সত্য বস্তু।

শঙ্করের মতে মায়া ও অবিদ্যা এক বস্তু, যাহা হইতে জগৎ ভ্রম উৎপন্ন হয়। রামানুজের মতে মায়া ও অবিদ্যা ভিন্ন বস্তু; ঈশ্বরের শক্তির নাম মায়া, জীবের পূর্বকৃত কর্মের ফল অবিদ্যা, এই অবিদ্যা জীবের চক্ষু আবরণ করিয়া রাখে, ব্রহ্মকে দেখিতে পায় না।

শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অতএ সকল জীব এক বস্তু। রামানুজ বলেন জীব ও ব্রহ্ম এক নহে, জীবসকল পরস্পর বিভিন্ন। শঙ্করাচার্য্য বলেন জীব এবং ব্রহ্ম উভয়েই কেবল অনুভূতি মাত্র; অর্থাৎ আত্মা জ্ঞাতা নহে, জ্ঞানস্বরূপ, অনুভবিতা নহে, অনুভূতি মাত্র। রামানুজ বলেন আত্মা জ্ঞাতা এবং অনুভবিতা। শঙ্করাচার্য্য বলেন জ্ঞাতৃত্ব অহঙ্কারের ধর্ম। রামানুজ বলেন জ্ঞাতৃত্ব আত্মার ধর্ম। শঙ্করাচার্য্য বলেন অহং জ্ঞান, অর্থাৎ "আমি" এইরূপ বোধ, আত্মার ধর্ম নহে, অহঙ্কারের ধর্ম; ইহা মিথ্যা জ্ঞান, মোক্ষ অবস্থায় অহং জ্ঞান থাকে না। রামানুজ বলেন দেহকে অহং বলিয়া মনে করা মিথ্যা জ্ঞান,

ইহা অহঙ্কারের ধর্ম ; কিন্তু দেহব্যতিরিক্ত আত্মাকে অহং মনে করা সত্য জ্ঞান, মোক্ষ অবস্থাতেও এরূপ অহং জ্ঞান থাকে। ভগবানেরও এরূপ অহং জ্ঞান আছে। গীতায় শ্রীভগবান বহুবার নিজকে অহং বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামানুজ আরও বলেন যে, মোক্ষ অবস্থায় যদি অহং জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে আত্মার বিনাশ হইত এবং সেরূপ মোক্ষ কেহ চাহিত না।

শঙ্করাচার্য্যের মতে মোক্ষ হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায় ; রামানুজের মতে মোক্ষ হইলেও জীব ব্রহ্মের সহিত এক হয় না, তবে ব্রহ্মের দর্শন পায় এবং নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে।

রামানুজ বলেন, সকল আত্মার স্বরূপ জ্ঞানাকার ; এজন্য শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে সকল আত্মাকে এক বলা হইয়াছে ; কিন্তু বিভিন্ন জীবের আত্মা বিভিন্ন, এবং পরমাত্মা সকল জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। পরমাত্মা সকল জীবের মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া বেদে কোন কোন স্থানে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, যেমন তৎ ত্বম্ অসি। কিন্তু অন্যত্র জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে ; যেমন

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পি প্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি

"একটী বৃক্ষে দুইটি সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী থাকে। একটী পক্ষী স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া অবলোকন করে। একটী পক্ষী জীবাত্মা, অপরটি পরমাত্মা ; জীব কর্ম্মফল ভোগ করে ; পরমাত্মা ফল ভোগ করেন না, সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন।"

অবিদ্যা বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, এ বিষয়ে রামানুজ এবং শঙ্করাচার্য্যের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি, এ বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে। শঙ্করাচার্য্য শ্রুতিবাক্য শ্রবণ ও বিচারকে প্রধান উপায় বলেন. রামানুজ উপাসনাকে প্রধান উপায় বলেন। উপাসনা যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়ক তাহা শঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে সহজে জ্ঞানের প্রকাশ হয় ; কিন্তু জ্ঞানের উৎপত্তি হয় শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া। রামানুজ বলেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় ব্রহ্মকে উপাসনা করা। রামানুজ আরও বলেন যে,

ব্রহ্মজ্ঞান হইতেছে উপাসনাত্মক। অর্থাৎ বাক্য শুনিয়া যে বাক্যার্থ জ্ঞান হয়, ব্রহ্মজ্ঞান তাহা নহে; কারণ তাহা হইলে শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে এরূপ বিধান দিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না। বাক্য শুনিলেই ত তাহার অর্থজ্ঞান হয়, তাহার জন্য বিধানের প্রয়োজন কি? অধিকন্তু ব্রহ্ম বিষয়ে বাক্যার্থ জ্ঞান হইলেও অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না ইহা সুবিদিত। অতএব শাস্ত্রে যে আছে ব্রহ্মকে জানিবে, তাহার অর্থ ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে। সে উপাসনা তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিধারা-রূপ ধ্রুবস্মৃতি। এই ধ্রুবস্মৃতি এবং দর্শন একই বস্তু। ইহাকেই আবার ভক্তি বলা হয়। এই জ্ঞান বা ভক্তির সাধন যজ্ঞাদি কর্ম। অতএব জ্ঞানের জন্য কর্ম প্রয়োজন। সৎকর্ম দ্বারা জ্ঞানের বিরোধী পাপের বিনাশ হয়।

শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজ উভয়ের মধ্যে প্রধান কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ উল্লেখ করা হইল। উপনিষদ পাঠ করিলে কখনও মনে হয় শঙ্করাচার্য্যের মতই ঠিক, আবার কখনও মনে হয় রামানুজের মতই ঠিক। ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ যেন রামানুজের মতের অধিকতর অনুকূল বলিয়া বোধ হয়। শঙ্করাচার্য্যের মত জ্ঞানের পথ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে, রামানুজের মত ভক্তিপথ আলোকিত করিয়াছে। কোন মত ভাল, তাহা লইয়া তর্ক চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে, আবার চিরকাল চলিবে। যিনি মনে করিবেন অগ্রে তর্ক দ্বারা কোন্ মতটি ঠিক তাহা স্থির করিয়া পরে সেই পথ গ্রহণ করিব, তিনি বোধ হয় অনর্থক কালক্ষেপ করিবেন। কোন্ মতটি ঠিক তাহা নির্দ্ধারণ করা তত প্রয়োজনীয় নহে,—বেশী প্রয়োজন, একটি মত গ্রহণ করিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হওয়া। বোম্বাই যাইবার দুইটি পথ আছে। ঘরে বসিয়া কেবলই রেলের বহি দেখিয়া যিনি ঠিক করিতে চেষ্টা করিবেন কোন্ পথটি ভাল, তাঁহার বোধ হয় কখনও বোম্বাই যাওয়া হইবে না। যে হোক একটী পথে বাহির হওয়া আবশ্যক, সে পথটি সবচেয়ে ভাল না হইলেও তত বেশী ক্ষতি নাই, কারণ শেষ পর্য্যন্ত বোম্বাই-ই পৌছান যাইবে। সেখানে গিয়া বরং আলোচনা করা যাইতে পারে কোন্ পথে কষ্ট কম। ঈশ্বরকে লাভ করিবার পথ সম্বন্ধেও সেই কথা। যে পথ হৃদয়ের অনুকূল সেই পথ আগাইয়া পড়, দুঃখ কষ্ট বিলম্ব দেখিয়া নিরুৎসাহ হইও না, দুঃখ কষ্ট সব পথেই আছে। উৎসাহের সহিত আগাইয়া যাও। শেষ পর্য্যন্ত সকল দুঃখ কষ্ট সার্থক হইবে।

(ভারতবর্ষ শ্রাবণ ১৩৩২)

শাস্ত্র-বিশ্বাস

শাস্ত্র কাহাকে বলে ?

বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণের নাম শাস্ত্র। শাস্ ধাতু (শাসন করা) হইতে শাস্ত্র শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে মানবের কর্ত্তব্য বিষয়ে অনুশাসন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এজন্য ইহাদের নাম শাস্ত্র। মানব সাধারণতঃ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। ধর্ম্ম এবং মোক্ষ লাভের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা যে গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, সাধারণতঃ তাহাকেই শাস্ত্র বলা হয়।

অর্থ এবং কামলাভ উদ্দেশ্য হইলে কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, তাহা অর্থ-শাস্ত্র এবং কামশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র এবং মোক্ষশাস্ত্রকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

শাস্ত্র কাহার রচনা ?

হিন্দুর বিশ্বাস, বেদ অপৌরুষেয়, অন্য শাস্ত্র ঋষি-প্রণীত। যাঁহারা সত্যদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা ঋষি। আমাদের চিত্ত রাগদ্বেষাদি-দোষযুক্ত বলিয়া আমরা সত্যদর্শন করিতে পারি না। আদর্শ বা আয়নাতে ময়লা থাকিলে যেমন তাহাতে বস্তুর স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ চিত্তে রাগদ্বেষাদি দোষ থাকিলে তাহাতে সত্য প্রকাশিত হয় না। অসংখ্য পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারই আমাদের রাগদ্বেষের কারণ। ইচ্ছা করিলেই বা অল্প চেষ্টা করিলেই আমরা আমাদের চিত্ত রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্ত করিতে পারি না। এ জন্য দীর্ঘকালব্যাপী ঐকান্তিক সাধনার প্রয়োজন। ঋষিগণ এইরূপ সাধনা করিয়া তাঁহাদের চিত্ত রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহাদের চিত্তে জগতের যাবতীয় বস্তুর সত্যরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহারা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কল্পনা নহে, তাহা বস্তুর স্বরূপ। এ জন্য হইাও বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁহারা রচনা করেন নাই, তাঁহাদের চিত্তে সত্যের যে রূপ প্রকাশিত

হইয়াছিল, শাস্ত্রগ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আলোকচিত্র (photograph) রচনায় যন্ত্রের (camera) যেরূপ কর্তৃত্ব, শাস্ত্রগ্রন্থ রচনায় ঋষিদের সেইরূপ কর্তৃত্ব। এইভাবে আলোচনা করিলে বলিতে হয় যে, শাস্ত্রের প্রকৃত কর্তৃত্ব ঈশ্বরের।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

কিমু বক্তব্যমনেকশাখাভেদভিন্নস্য দেবতির্য্যঙ্-মনুষ্যবর্ণাশ্রমাদি-প্রবিভাগ-হেতোর্ঋগ্বেদাখ্যস্য সর্ব্বজ্ঞানাকরস্য (শাস্ত্রস্য) অপ্রযত্নেনৈব লীলান্যায়েন পুরুষ-নিঃশ্বাসবদ্ যস্মান্মহতো ভূতাদ্ যোনেঃ সম্ভবঃ—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদঃ" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২০)—তস্য মহতো ভূতস্য নিরতিশয়সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিমত্ত্বং চ ইতি।

ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য ১।১।৩

অনুবাদ—বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "এই ঋগ্বেদ সেই মহাপুরুষ (ঈশ্বর) হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় অনায়াসপ্রসূত।" ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র অনেক শাখায় বিভক্ত, দেব, পশু, মনুষ্য, বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতি বিভাগের কারণ, এবং সর্ব্বজ্ঞানের আকর। পুরুষের নিঃশ্বাস যেরূপ অনায়াসপ্রসূত, ঈদৃশ গৌরবপূর্ণ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সেইরূপ বিনাপ্রয়াসে ও অবলীলাক্রমে যে মহাপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাপুরুষ যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান, ইহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখানে শঙ্করাচার্য্য প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন যে, শাস্ত্র সকল জ্ঞানের আকর এবং শাস্ত্র ঈশ্বরেরই রচনা।

শাস্ত্রের বিভাগ—দর্শন ও স্মৃতি

শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়—(১) তত্ত্ব; (২) কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দর্শনের পরিভাষা অনুসারে "তত্ত্ব"ভাগকে Metaphysics বলা যায় এব "কর্ত্তব্য" ভাগকে Ethics বলা যায়। ঈশ্বরের স্বরূপ কি, জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইল, ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ কি, প্রধানতঃ এই সকল বিষয় শাস্ত্রের তত্ত্বভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই অংশকে "দর্শন" বলা হয়। বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া যে সকল দার্শনিক তত্ত্ব স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনে এবং বাদরায়ণকৃত

উত্তরমীমাংসা-দর্শনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সাজাইয়া সে সকল বিষয়ে বেদের যাহা অভিমত, প্রধানতঃ তাহাই এই দুই দর্শন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বেদের যে বাক্যগুলি আপাত-দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয়, সেই বাক্যগুলিরও সামঞ্জস্যবিধান পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। সে প্রণালী এত সুন্দর ও স্বাভাবিক যে, তাহা আলোচনা করিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়! যেখানে সামঞ্জস্য বিধানের কোনও উপায় নাই বলিয়া প্রথমে মনে হয়, সেখানেও অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত অতিশয় সন্তোষজনকভাবে সামঞ্জস্যবিধান করা হইয়াছে। পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা এই দুইটি দর্শনই সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর প্রধান অবলম্বন। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগ এই চারিটি দর্শনের যে সকল অংশ বেদবিরোধী নহে, সে সকল অংশ গ্রহণ করিতে সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীর কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু বেদবিরোধী অংশ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কারণ, বেদই সনাতন ধর্ম্মের পরম অবলম্বন।

যে শাস্ত্রগ্রন্থে হিন্দুর কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে "স্মৃতি" গ্রন্থ বলা হয়। ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, এইরূপ অতি সাধারণ রকমের উপদেশ দর্শনগ্রন্থেও আছে, যথা:—"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিধিধ্যাসিতব্যঃ" (ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রবণ করা উচিত, বিচার করা উচিত, ধ্যান করা উচিত।) কিন্তু কর্ত্তব্য বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা স্মৃতি-গ্রন্থেই আছে। স্মৃতি-গ্রন্থ বিংশতি-সংখ্যক। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ এক একটি স্মৃতি-গ্রন্থের প্রণেতা। মানবের কর্ত্তব্য বিষয়ে স্মৃতি গ্রন্থে যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল উপদেশ বেদের উপরেই পতিষ্ঠিত। কোথাও স্মৃতিব্যবস্থার সমর্থক সুস্পষ্ট বেদবাক্য পাওয়া যায়, কোথাও সেরূপ স্পষ্ট বেদবাক্য পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, বেদের কিয়দংশমাত্র এক্ষণে প্রচলিত আছে, বহু অংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। ঋষিগণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া সমগ্র বৈদিক আচার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থে সে সকল আচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

জন্মান্তরবাদ

মানবের জন্মগত অবস্থাভেদ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেহ প্রাচুর্য্য ও পবিত্রতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে কেহ দৈন্য ও অপবিত্রতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্বজন্ম এবং কর্ম্মফল স্বীকার না করিলে এই প্রভেদের

হেতু নির্দ্দেশ করা যায় না। ঋষিগণ দিব্যদৃষ্টিতে পূর্ব্বজন্ম ও কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মফলের প্রভাবেই পিতামাতার গুণদোষ সন্তানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সত্যের উপর ঋষিগণ সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ধর্ম্মে এই সকল সত্য স্বীকৃত হয় নাই, এবং সে জন্য পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুর অনুরূপ সামাজিক ব্যবস্থা নাই। আমাদের দেশের অনেক ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তির মনোভাব তাঁহাদের শিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্য মনোভাবের অনুরূপ হইয়াছে। এ জন্য পাশ্চাত্য সমাজই তাঁহাদের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইয়াছে এবং তাঁহারা আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া পাশ্চাত্য সামাজিক অব্যবস্থাকেই প্রশংসা করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সামাজিক অব্যবস্থার ফলে পাশ্চাত্য সমাজে যে অশান্তি ও অপাবিত্রতা উগ্রভাবে দেখা দিয়াছে, আমাদের সামাজিক সুব্যবস্থার ফলে ঐরূপ অশান্তি ও অপবিত্রতা নিবারিত হইয়াছে, ইহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না।

দর্শন ও স্মৃতি তুল্যভাবে শ্রদ্ধেয়

সাধারণতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিন্দুর স্মৃতি-গ্রন্থের প্রশংসা করেন নাই, কিন্তু হিন্দু-দর্শনের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। এ জন্য যে সকল ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি হিন্দুর স্মৃতিগ্রন্থের নিন্দা করেন, তাঁহারা, হিন্দুর দর্শন-গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দু-দর্শন যে ঋষিদের রচনা, হিন্দুর স্মৃতিগ্রন্থও সেই ঋষিদের রচনা, এবং হিন্দু-দর্শনের তত্ত্ব-সমূহের উপরেই স্মৃতি বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠীত। হিন্দু-দর্শন আলোচনা করিলে ইহা দেখা যায় যে, সর্ব্বত্রই ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, স্মতিগ্রন্থগুলি ঋষি-প্রণীত, অতএব প্রামাণিক। গীতা ও উপনিষদ প্রধানতঃ দার্শনিক গ্রন্থ, সামাজিক ব্যবস্থার বিষয় ইহাতে বিশেষ-ভাবে আলোচনা করা হয় নাই। তথাপি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, জন্ম অনুসারে জাতিনির্ণয় প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থার মূলতত্ত্বগুলি গীতা ও উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়।

স্মৃতির ব্যবস্থা সর্ব্ববাদি সম্মত

শাস্ত্রকারগণ যে দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন এবং শাস্ত্রবাক্য যে প্রামাণ্য, ইহা কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি অসংখ্য সাধু মহাপুরুষগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে এক হিসাবে

দার্শনিক তত্ত্ব অপেক্ষা সামাজিক ব্যবস্থাগুলির প্রামাণিকতা অধিকতর অবিসংবাদিত। দার্শনিক তত্ত্বগুলি অতিশয় সূক্ষ্ম এবং জটিল, এ জন্য কোনও কোনও বিষয়ে আচার্য্যদের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থাগুলি অতিশয় সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নাই। এ জন্য সকল আচার্য্যই স্মৃতি-প্রতিপাদিত সামাজিক ব্যবস্থাকে মান্য করিয়াছেন। সামাজিক বিষয়ে আচার্য্যদের মধ্যে বিশেষ কোনও মতভেদ দেখা যায় না।

শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

মনে হইতে পারে যে, সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে শাস্ত্র মানিবার প্রয়োজন কি? নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধি অনুসারে চলিলেই হয়। কিন্তু কোন্ ব্যবস্থা হিতকর, কোন্ ব্যবস্থা অহিতকর, তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে সঠিক প্রতিভাত হয় না। অনেক সময় অহিতকর ব্যবস্থা হিতকর বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যখন কলকারখানা আবিষ্কার হইয়াছিল, তখন সাধারণতঃ অনেকেরই মনে হইয়াছিল, ইহাতে মানবসমাজের যথেষ্ট উপকার হইবে। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে যে, ইহাতে বহু অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। যে সকল দেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠা হইতেছে, তাহারা এত অধিক পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে যে, সমগ্র দ্রব্য ঐ দেশের লোক ক্রয় করিতে পারে না, অন্য দেশেও ঐ দ্রব্য বিক্রয় করা প্রয়োজন হইতেছে। অপর দরিদ্র দুর্ব্বল জাতির নিকট ঐ সকল কলের দ্রব্য বিক্রয় করা হইতেছে। ফলে ঐ সকল দরিদ্র জাতি আরও দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। বিভিন্ন সভ্য জাতি একই দরিদ্র জাতির নিকট তাহাদের দ্রব্য বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ জন্য জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ হইতেছে। চিন্তাশীল প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু "The World Crisis—Its cause and cure" নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন—"Over production and capitalism,—the effects of unrestricted industrial application of natural science—are the principal causes of the growing spirit of militarism and imperialism in the west" "পাশ্চাত্যদেশে যে যুযুৎসা এবং প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ অতি-উৎপাদন এবং

অতি-ঘনিষ্ঠ,—এবং ইহাদের কারণ শিল্পবিষয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অবাধপ্রয়োগ।"

পুনশ্চ তিনি লিখিয়াছেন,—

"The recent wonderful development of Natural Science in the West instead of being the blessing which it was expected and is still supposed to be, has on the whole proved to be rather a curse to a large section of the human race."

"আধুনিক যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে, তাহা জগতের হিতকর হইবে বলিয়া লোক প্রথমে মনে করিয়াছিল, এখনও অনেকে তাহা মনে করিয়া থাকে; কিন্তু ইহা জগতের হিতকর না হইয়া ঘোরতর অনিষ্টকর হইয়াছে।"

পুনশ্চ তিনি বলিয়াছেন :—

"The ancient civilizations strove to restrict the application of science to industry within the bounds of cottage industry. Manu condemned the establishment of big industries as a sin." "প্রাচীনকালে সভ্যজগতে শিল্পবিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিদ্যার প্রয়োগকে কুটীর শিল্পের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। মনু মহাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠাকে পাপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"

শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসু কলের যে অনিষ্টকারিতা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত ইহার আরও অনিষ্টকারিতা আছে। কলে কাজ করিলে যেরূপ স্বাস্থ্যহানি ও চরিত্রহানির আশঙ্কা আছে, গৃহশিল্পে সেরূপ আশঙ্কা নাই; কলকারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্বেষভাব বাড়িয়া যাইতেছে। "মহাযন্ত্র প্রবর্ত্তন" করা মনু যে একটি পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উপরিলিখিত যুক্তিগুলি আলোচনা করিলে তাহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। যাহার প্রচলনে দুর্ব্বলজাতির গৃহশিল্প বিনষ্ট হয়, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, বেকার-সমস্যা উদ্ভূত হইয়া জাতিকে অন্তঃসারশূন্য করে, যাহা শ্রমজীবিদের মধ্যে দুর্নীতি বাড়ায়, স্বাস্থ্য বিনষ্ট করে, প্রভূত ধনাগমের কারণ হইলেও তাহা যে পাপ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ অপেক্ষা প্রাচীন ঋষিই অধিকতর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন।

অল্পব্যয়ে ও দ্রুতভাবে অধিক দ্রব্য উৎপাদন করা অপেক্ষা সকল ব্যক্তির জীবিকার ব্যবস্থা করাই সামাজিক শান্তির পক্ষে অধিকতর প্রয়োজন।

আমি একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইলাম যে, সহজ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইলে যাহা অনিষ্টকর, তাহাকেও আপাততঃ হিতকর বলিয়া মনে হইতে পারে। অপরদিকে যে ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে হিতকর, সহজ বুদ্ধিতে তাহাকে অনিষ্টকর বলিয়া মনে হইতে পারে। গীতায় শ্রীভগবান্ সাত্ত্বিক সুখের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—ইহা প্রথমে দুঃখপ্রদ, পরিণামে সুখপ্রদ। সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যায় যে, কতকগুলি ব্যবস্থা আপাততঃ সুখপ্রদ, কিন্তু পরিণামে দুঃখপ্রদ, এবং অপর কতকগুলি ব্যবস্থা প্রথমে দুঃখপ্রদ, কিন্তু পরিণামে সুখপ্রদ। যাঁহারা অদূরদর্শী, তাঁহারা যে ব্যবস্থা আপাততঃ সুখপ্রদ, তাহার জন্য আগ্রহান্বিত হন, যাহা আপাততঃ দুঃখপ্রদ, তাহা পরিহার করেন; এই সকল ব্যবস্থা পরিণামে ভিন্ন ফল প্রসব করে কি না, তাঁহারা তাহা আলোচনা করেন না। যাঁহারা দূরদর্শী, তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত কোন্ ব্যবস্থার কিরূপ ফল হইবে, তাহা আলোচনা করিয়া ব্যবস্থাটি হিতকর কিনা ইহা স্থির করেন। শেষ পর্য্যন্ত কোন্ ব্যবস্থার কিরূপ ফল হইবে ইহা বিচার করিবার ক্ষমতা যোগপ্রভাবে ঋষিগণের সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যে ফল প্রথমে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সাধারণ বুদ্ধিতে অনেক সময় সে ফলের প্রতি লক্ষ্য থাকে না, কিন্তু ঋষিগণের রাগদ্বেষরহিত চিত্তে তাহা সহজে উপলব্ধি হয়। এইজন্য তাঁহাদের ব্যবস্থা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত নিরীক্ষণ করা উচিত।

পাশ্চাত্য সমাজের অনুচিকীর্ষা

ঋষিপ্রণীত ব্যবস্থা সকলের ফল সমাজের পক্ষে হিতকর হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন কালের সকল সুধী ব্যক্তি এই সকল ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। শত সহস্র বৎসর ধরিয়া দেশের কবি, নাট্যকার, গীতরচয়িতা, গল্প-লেখক বিদ্বান্, সাধু, মহাপুরুষ সকলেই স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। সম্প্রতি ইংরাজী শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের ফলে একটা পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রভূত পরিমাণে পাশ্চাত্য বিদ্যা অর্জ্জন করিলেন, কিন্তু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন না। বিজেতা জাতির মনে বিজিত জাতির বিদ্যা ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি যে অবজ্ঞার উদয় হয়, এই সকল ইংরাজীশিক্ষিত ভারতবাসীর মনে সেই

অবজ্ঞা সঞ্চারিত হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন, প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই ছিল না, শাস্ত্রবিদ্যা অধিকাংশ স্থলে অনিষ্টকর কুসংস্কার মাত্র। মোট কথা, ভারতবাসীদের নিজস্ব বস্তু সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে Inferiority-complex বা কাল্পনিক নিকৃষ্টতার ভাব উদয় হইল; ইহারা ঘরের অমূল্য রত্নরাজি উপেক্ষা করিয়া পরের রঙ্গীন কাচের জন্য প্রলুব্ধ হইলেন। এই সকল পাশ্চাত্য ভাবগ্রস্ত ভারতবাসীকে লক্ষ্য করিয়া Sir John Woodroffe বলিয়াছেন যে, ইঁহারা ইংরাজদের মানসপুত্র। যদি দেখিতাম যে, পাশ্চাত্য-সমাজে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি সর্ব্ববাদিসম্মত ধর্ম্মের লক্ষণগুলি বৃদ্ধি পাইতেছে, যদি দেখিতাম, তাহাদের মধ্যে জাতিতে জাতিতে মৈত্রী বাড়িতেছে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রীতি বিকশিত হইতেছে, গৃহে শান্তি বিরাজ করিতেছে, দরিদ্রজাতিদের প্রতি তাহারা সদয় ও সরল ব্যবহার করিতেছে, তাহা হইলে আধুনিক ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিদের পাশ্চাত্য-সমাজের অনুচিকীর্ষা মার্জ্জনীয় হইত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি দেখা যাইতেছে? রসনা-তৃপ্তির জন্য নিত্য লক্ষ লক্ষ প্রাণিহিংসা হইতেছে, ইহা যে অন্যায়, ইতরপ্রাণীর জীবনও যে পবিত্র, পাশ্চাত্যসমাজে এ বোধই নাই; দুর্ব্বল জাতির অর্থ এবং দেশ অধিকার করিতে পাশ্চাত্য জাতিগণ সর্ব্বদাই সমুদ্যত, আহারবিহারে শৌচাচারের ধারণাই নাই, আছে কেবল সৌখীনতা; দুর্নীতিপূর্ণ উপন্যাস নাটক থিয়েটার বায়স্কোপে সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাই আত্মতৃপ্তির সর্ব্বসম্মত প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত; শ্রদ্ধাহীনভাবে সপ্তাহে এক দিনমাত্রগির্জ্জায় বেড়াইয়া আসাই ভগবদ্ভক্তির পরিচায়ক,—পূজা, জপ, ধ্যান নাই বলিলেই চলে, স্বার্থের জন্য জাতিতে জাতিতে প্রবল সংঘর্ষ নিত্য দৃষ্ট হয়, বিষাক্ত বাষ্প দ্বারা শত্রুসৈন্য সংহার করিতে, আকাশ হইতে বোমা ফেলিয়া নিরীহ স্ত্রী শিশু বৃদ্ধ হত্যা কল্পিতে তাহারা সঙ্কুচিত হয় না; সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে হিংসাদ্বেষ নিত্য বাড়িয়া উঠিতেছে; বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ উগ্রভাবে প্রকাশিত হইতেছে; বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক বিবাহিত জীবনের শান্তি ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে; দুশ্চরিত্রতার জন্য বিবাহবিচ্ছেদ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা; বিলাস এবং ইন্দ্রিয়সুখভোগই জীনের উদ্দেশ্য; এই সকল প্রবল ত্রুটির জন্য বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য সকলই বিফল হইয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য সমাজের অবস্থা দেখিয়া, ইহাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হক্সলি বলিয়াছিলেন, যদি কোনও ধূমকেতু আসিয়া

আসিয়া পৃথিবী ধ্বংস করিয়া ফেলে, তাহাই ভাল হয়।* এই ত পাশ্চাত্য সমাজের অবস্থা। তথাপি ইহার অনুকরণে আমাদের সমাজ গঠন করিবার নিমিত্ত কতিপয় পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ব্যক্তি একান্ত আগ্রহ-সম্পন্ন; অহিংসা, সত্য অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতির উৎকর্ষসাধনের জন্য ঋষি-প্রণীত বিধি-ব্যবস্থাগুলি উপহাস করিয়া অপসারিত করিবার জন্য তাঁহাদের উৎসাহের সীমা নাই।

শাস্ত্রে আংশিক আস্থা

কেহ কেহ বলেন যে, শাস্ত্রে তাঁহাদের আস্থা আছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সকল শাস্ত্রবাক্য তাঁহারা মানিতে পারেন না। যে শাস্ত্রবাক্য তাঁহাদের নিকট ভাল বলিয়া মনে হইবে, তাঁহারা সে বাক্যগুলি মানিবেন; কিন্তু যেগুলি ভাল মনে হইবে না, সেগুলি মানিবেন না। কিন্তু যাঁহাদের এরূপ মনোভাব, তাঁহাদের শাস্ত্রে আস্থা আছে, ইহা বলা যায় না। শাস্ত্রে আস্থা থাকিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, শাস্ত্রকারগণ আমাদের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী, কোন্ ব্যক্তির কিরূপ কর্ম্ম করিলে মঙ্গল হইবে, কিরূপ কর্ম্ম করিলে অমঙ্গল হইবে, তাহা তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেম। আমরা যখন জীবের পূর্ব্বজন্ম এবং ইহলোক-পরলোক দর্শন করিতে পারি না, তখন আমরা কিরূপে বলিতে পারি, কোন্ কর্ম্ম করিলে জীবের প্রকৃত মঙ্গল বা অমঙ্গল হইল? শাস্ত্রকারগণ যোগপ্রভাবে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া এ সকল দেখিতে পাইতেন, তাঁহাদের আস্থা থাকিলে তাঁহাদের সকল ব্যবস্থাই মানিতে হয়। তাহা না মানিলে বলিতে হয় যে, তাঁহারা যে পূর্ব্বজন্ম এবং পরলোকের কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্য নহে, অর্থাৎ তাঁহারা প্রবঞ্চক। "শাস্ত্রবাক্য উত্তম মনে হইলে তাহার অনুকরণ করিব, নচেৎ করিব না", যিনি এ কথা বলিবেন, তিনি বস্তুতঃ শাস্ত্রকার অপেক্ষা নিজেকে বেশী জ্ঞানী মনে করেন; সুতরাং তিনি শাস্ত্র মানেন, এ কথা বলা যায় না। আমরা যখন কোনও পুস্তকে অথবা বন্ধুর মুখে উপদেশ শ্রবণ করি, তখন যে উপদেশ ভাল মনে হয়, তাহা গ্রহণ করি, যাহা ভাল মনে হয় না, তাহা গ্রহণ করি না, শাস্ত্রের উপদেশ সম্বন্ধে যদি সেই পথই

* Huxley contented himself by expressing the pious wish for the advent of "a kindly comet which would sweep the whole affair away. —The World Crisis—its cause and cure—by Mr. P. N. Bose, Ranchi.

অনুসরণ করি, তাহা হইলে অপর গ্রন্থকার এবং সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা শাস্ত্রকারের প্রতি কিরূপে অধিক সম্মান প্রদর্শন করিলাম? কোনও খৃষ্টান আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলে যে অংশ তাহার বুদ্ধিতে ভাল মনে হইবে, তাহা গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবে না—যে অংশ মন্দ মনে হইবে, তাহাই সে অমান্য করিবে। আমরাও যদি তাহা করি, তাহা হইলে কিরূপে আমরা শাস্ত্রের প্রতি খৃষ্টান অপেক্ষা অধিক মান্য প্রদর্শন করি?

শাস্ত্রবিধান কি পরিবর্ত্তনীয়?

কেহ কেহ বলেন, যে সময় শাস্ত্র লিখিত লইয়াছিল। সে ,সময় শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে হয় ত মঙ্গলকর ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহার পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু "সত্য কথা বলিবে", "পিতামাতার আজ্ঞা ।পাল করিবে", "জীবে দয়া করিবে", এ সকল ব্যবস্থা যেরূপ যুগে যুখে পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হয় না, অধিকাংশ সামাজিক ব্যবস্থাও সেইরূপ যুগে যুগে পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হয় না। যে ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে শাস্ত্রই সেরূপ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অধিকন্তু যাঁহারা এরূপ আপত্তি করেন, তাঁহারা ইহা বুঝাইতে পারেন না, কি কারণে যে ব্যবস্থা পূর্ব্বে সমাজের হিতকর ছিল, এক্ষণে তাহা সমাজের অনিষ্টকর হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহাদের মনে শাস্ত্রের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নাই, অথচ "শাস্ত্র মানিব না" এরূপ বলিবার ইচ্ছা বা সাহসও তাঁহাদের নাই, এ জন্য তাঁহারা বলেন যে, শাস্ত্র পরিবর্ত্তন করা উচিত। 'শাস্ত্র মানিব না' এবং 'শাস্ত্র পরিবর্ত্তন করা উচিত' এই উভয় মতের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য।

দোষেয় তারতম্য আছে

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, আজকাল শাস্ত্রের অনেক নিয়ম পালন করা হয় না, সুতরাং আরও কয়েকটি নিয়ম লঙ্ঘন করিতে দোষ নাই। ব্রাহ্মণ যদি পৌরোহিত্য বা অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না করেন, তাহা হইলে শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতে বা শূদ্রের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে তাঁহার আপত্তি করা উচিত নহে। ইঁহাদের যুক্তি এইরূপ,—যখন ten commandmentsএর কয়েকটি আদেশ পালন করা হয় না, তখন আরও কয়েকটি লঙ্ঘন করা উচিত,—অর্থাৎ যখন কয়েকটি অন্যায় করা

হইয়াছে, তখন আরও কয়েকটি নূতন অন্যায় করিতে দোষ নাই। বলা বাহুল্য, এইরূপ সিদ্ধান্ত বিচার-সহ নহে। শাস্ত্রের প্রতি যাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, তিনি কয়েকটি শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘিত হইতেছে দেখিয়া আরও কয়েকটি বিধান লঙ্ঘিত করিতে উদ্যত হইবেন না। তিনি চেষ্টা করিবেন—যাহাতে যে শাস্ত্র-লঙ্ঘন হইয়াছে, সেগুলি ভবিষ্যতে পালন করা হয়। যিনি আরও বেশী করিয়া শাস্ত্র-বিধান লঙ্ঘন করা সমর্থন করিবেন, তাঁহার শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আন্তরিক নহে, মৌখিক। যিনি কম নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহার দোষ অল্প, যিনি বেশী নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহার দোষ বেশী।

শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্তবাদ

কেহ বলিয়া থাকেন যে, শাস্ত্রের সকল কথা প্রামাণিক নহে, ইহাতে বহু কথা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্রের কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত, ইহা স্থির করিবার জন্য তাঁহারা সাধারণতঃ এইরূপ বিচার করেন,—যে অংশগুলি তাঁহাদের নিকট যুক্তিবিরুদ্ধ মনে হইবে, সেই অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত। ফলতঃ ইঁহারা নিজবুদ্ধিকে শাস্ত্রের প্রামাণিকতার মাপকাঠী করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের বুদ্ধিতে যাহা মন্দ হয়, যদি শাস্ত্রকারের বুদ্ধিতে তাহা ভাল মনে হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা শাস্ত্রের সেই অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন। শাস্ত্রমধ্যে যাহাতে কোনও আগন্তুক বস্তু প্রক্ষিপ্ত না হয়, এজন্য শাস্ত্রব্যবসায়িগণ যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, শিষ্যের অধিকার ও যোগ্যতা বিচার করিয়া তাহাকে শাস্ত্র উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মানিবে না, যাহার দ্বারা নিজ রচনা শাস্ত্র মধ্যে প্রক্ষেপ করিবার সম্ভাবনা থাকিবে, তাহাকে শাস্ত্র উপদেশ দেওয়া হইত না। ভারতের সুদূরবর্ত্তী বিভিন্ন অংশে একই শাস্ত্রগ্রন্থের যে সকল পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, সেই সকল পাণ্ডুলিপির যে অংশগুলি মিলিয়া যায় (প্রায় সকল অংশই মিলিয়া যায়, প্রভেদ অতি সামান্যই হয়), সেই অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না। বস্তুতঃ যিনি মনে করিবেন যে, শাস্ত্রের অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত, তাঁহার শাস্ত্রে কিছুই আস্থা নাই, কারণ, শাস্ত্রে আস্থার অর্থ—যে শাস্ত্র যে আকারে প্রচলিত আছে, তাহাতেই আস্থা বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রের যে অংশ আমার মতের সহিত মিলিল না, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া

শাস্ত্রের অবশিষ্ট অংশ মানিলে যে ফলতঃ শাস্ত্র না মানার তুল্য হয়, ইহা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা

যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্র মানেন না, অথচ সে কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন না, তাঁহাদের আর একটি কৌশল হইতেছে—শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা করা। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা নিরপেক্ষভাবে স্মৃতিগ্রন্থ সম্যক্ আলোচনা করিলেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আজকাল ইংরাজী-শিক্ষিত অনেক ব্যক্তিই স্মৃতি-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা করেন নাই। ইঁহাদের ভ্রম উৎপাদন করিবার জন্য সমাজসংস্কারকগণ শাস্ত্র হইতে সুবিধামত দুইচারিটি শ্লোক তুলিয়া তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া নিজপক্ষ সমর্থন করেন। ফলে অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মনে করেন, শাস্ত্রে সকল প্রকার মতেরই সমর্থক বাক্য পাওয়া যায়। কিন্তু সকল প্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ মতই যদি শাস্ত্রানুমোদিত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্য উন্মত্ত প্রলাপের সমতুল্য হইয়া যায়। শাস্ত্রমধ্যে এরূপ বাক্য পাওয়া যায়—যাহা আপাততঃ পরস্পর-বিরোধী মনে হইতে পারে। এরূপ স্থলে উভয় বাক্যের বিরোধ পরিহার করিয়া শাস্ত্রীয় প্রণালীতে সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্রে বহু স্থলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জাতি জন্মগত; আবার কোথাও এরূপ কথাও আছে, "যে ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমা দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেখিবে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।" এস্থলে উভয় বাক্যের সামঞ্জস্যবিধান করিবার প্রণালী এইরূপ। উভয় বাক্যের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা যায় না, কারণ, তাহা হইলে পরস্পর-বিরোধিতা-দোষের আবির্ভাব হয়। অতএব একটি বাক্যের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে এবং অন্য বাক্যটির আক্ষরিক অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। জাতি জন্মগত, এই বাক্যটির আক্ষরিক অর্থ ত্যাগ করিলে বাক্যটি নিরর্থক হইয়া যায়। "যে ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমা দয়া প্রভৃতি দেখিবে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে" এই বাক্যটির আক্ষরিক অর্থ ত্যাগ করিয়া অপর অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে, সে অপর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমা দয়া প্রভৃতি গুণ অধিক পরিমাণে দেখা যায়, সে ব্রাহ্মণের ন্যায় মাননীয়। একটু বিচার করিলে ইহাও বুঝিতে পারা যাইবে যে, দ্বিতীয় বাক্যটির আক্ষরিক অর্থ হইতেই পারে না। কারণ, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি গুণ অল্পাধিক

পরিমাণে সকলের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। কি পরিমাণে এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যাইবে? পুনশ্চ এক ব্যক্তি এক সময়ে ক্ষমা দেখাইয়া অপর সময়ে যদি ক্ষমার অভাব দেখায়, তাহা হইলে কিরূপে তাহার জাতি-নির্ণয় করা যাইবে? এই ভাবে বিচার করিলে আপাততঃ পরস্পরবিরোধী শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে।

মাসিক বসুমতী অগ্রহায়ণ ১৩৪০

বৈষ্ণব-দর্শন

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ভগবান হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহা ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, জগতের প্রতি অণুপরমাণু ভগবানের আয়ত্ত এবং ভগবানের দ্বারা পরিচালিত; ভগবান জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন বস্তু নাই,—এই সকল কথা হিন্দুধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সকল কথা শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"

যাঁহা হইতে এই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে,

"সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ"

জগতে যাহা কিছু আছে সকলই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্"

এই সকলই ব্রহ্ম—সকল বস্তুই তাঁহা হইতে উৎপন্ন (তজ্জ্) হয়, (প্রলয়ের সময়) তাঁহাতেই বিলীন হয় (তল্ল) এবং (প্রলয়ের পুর্ব্বে) তাঁহাতেই অবস্থাক করে (তদন)।

"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"

তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা বড় আর কিছুই দেখা যায় না

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"

ব্রহ্ম সত্য তিনি জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত

এই সকল শ্রুতিবাক্য—অতএব সকল হিন্দুরই স্বীকার্য্য। কিন্তু এই বিষয়গুলিতে সকল সম্প্রদায় একমত হইলেও অপর কতকগুলি বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়। ব্রহ্ম বা ভগবান কি জীব হইতে ভিন্ন? ভগবানের স্বরূপ নির্বিশেষ না সবিশেষ, নির্গুণ না সগুণ? ভগবান লাভ করিলে জীবের কিরূপ অবস্থা হয়?—তখন জীব কি ভগবানের সহিত এক হইয়া যায়, কিম্বা তখনও ভগবান জীব হইতে পৃথক ভাবে অবস্থান করেন? ভগবানকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি? জীব এবং জগতের প্রকৃত কোন অস্তিত্ব আছে, না ইহারা কেবলমাত্র মনের ভ্রম?—এই সকল বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি প্রধানতঃ দুইদলে বিভক্ত করা যায়। এক দলের মত—ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন নহেন; ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিশেষ; ব্রহ্মকে লাভ করিলে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়, কোনরূপ প্রভেদ থাকে না; মোক্ষ লাভ করিবার উপায় হইতেছে—"জীব ও ব্রহ্ম এক" "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ অনবরত চিন্তা করা। যাঁহারা জ্ঞান বা যোগমার্গ অবলম্বন করেন তাঁহাদের এই মত। শাক্তদিগের মতও এইরূপ। অপর দলের মত—ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন; ব্রহ্ম সগুণ সবিশেষ; ভগবানকে লাভ করিলে জীব ভগবানের সহিত এক হইয়া যাব না; ব্রহ্ম বা ভগবানের উপাসনা করা, তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে ডাকাই তাঁহাকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধক, তাঁহাদের এই মত। প্রথম দলের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক শঙ্করাচার্য্য। দ্বিতীয় দলের মধ্যে রামানুজ, মধ্বাচার্য্য এবং চৈতন্য অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ। এই দ্বিতীয় দলের মধ্যে আবার বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। রামানুজ-প্রচারিত মতাবলম্বিগণ শ্রীবৈষ্ণব নামে পরিচিত; মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী; শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত মতাবলম্বী গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে পরিচিত। রূপ, সনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি পণ্ডিগণ গৌড়ীব বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত সমূহের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে।

শ্রুতি ব্রহ্মকে কোথাও নির্বিশেষ, আবার কোথাও সবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন,—যে শ্রুতিবাক্যগুলি ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়ায়ছন, সেই শ্রুতিবাক্যগুলিই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ প্রতিপাদন করেন; এবং যে শ্রুতিবাক্যগুলি ব্রহ্মকে সবিশেষ এবং সগুণ ললিবা বর্ণনা করিবাছেন, সেই বাক্যগুলি ব্রহ্মের স্বরূপ অর্থাৎ যথার্থ ব্রহ্মকে প্রতিদান করেন

না, মায়াযুক্ত ব্রহ্মকে বর্ণনা করেন। মায়াযুক্ত ব্রহ্মই ঈশ্বর বা ভগবান। ঈশ্বর বা ভগবান ব্রহ্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট তত্ত্ব, কারণ ঈশ্বর বা ভগবানের সহিত মায়ার সংশ্রব আছে। ব্রহ্মের যে যথার্থ স্বরূপ, যাহার সহিত মায়ার কোন সংশ্রব নাই, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। বৈষ্ণব বলেন—ব্রহ্মের শক্তিকে ছাড়িয়া ব্রহ্ম কখনও থাকেন না। শক্তিযুক্ত যে ব্রহ্মের স্বরূপ ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, ইহারই নাম ভগবান। ব্রহ্মের যে নির্বিশেষ অভিব্যক্তি তাহা অপকৃষ্ট তত্ত্ব; এই নির্বিশেষ অভিব্যক্তিকে ভগবানের অঙ্গকান্তি বলিয়া বৈষ্ণবেরা বর্ণনা করিবাছেন। তাঁহাদের মতে ভগবান যে কেবলমাত্র সবিশেষ তাহা নহে, তাঁহার বিগ্রহ অর্থাৎ দেহ আছে। কিন্তু সে দেহ পার্থিব পদার্থের সমষ্টি নহে; তাহা চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় এবং নিত্য। জগতে যে সকল পদার্থ মায়ার সৃষ্টি, তাহারা স্থূল, এবং অনিত্য। কিন্তু ভগবানের ধামে মায়ার কোন অধিকার নাই; সেখানে সকলই চিন্ময় এবং নিত্য। কেবল যে ভগবানের দেহ চিন্ময় এবং নিত্য তাহা নহে। ভগবানের ধামে যাঁহারা থাকেন, যাঁহাদিগকে লইরা ভগবান লীলা করেন, তাঁহারা সকলেই নিত্য। এবং সেখানকার লীলার বস্তুগুলিও নিত্য। সেখানকার ফলফুল, বাতাস জল সকলই নিত্য এবং চিন্ময়। ভগবান সর্বশক্তিমান। তাঁহার ইচ্ছায় এই সকল বস্তু নিত্য হইবে ইহা বিচিত্র কি?

বৈষ্ণব-দর্শনের সিদ্ধান্ত শ্রুতি এবং পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতির কোন কথা বৈষ্ণবেরা অগ্রাহ্য করেন নাই। শ্রুতিতে যে সকল কথা আছে তাহা ব্যতীত স্মৃতি ও পুরাণে অনেক নূতন কথা আছে। তাহাদেরও মূলস্বরূপ শ্রুতিবাক্য ছিল, কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এজন্য এগুলিও হিন্দুর পক্ষে প্রামাণিক। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদিত তত্ত্বগুলির সমর্থন করিবার জন্য অনেক স্থলে স্মৃতি এবঃ পুরাণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব বৈষ্ণব-দর্শনের কতকগুলি সিদ্ধান্ত স্মৃতি এবং পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করা যায় না।

জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রুতি যাহা বলিবাছেন, তাহা মোটামুটি এই—ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কোনও স্বতন্ত্র উপাদান হইতে জগৎ সৃষ্ট হয় নাই। ঈশ্বরই জগতের উপাদান; ঈশ্বরই জগতের কর্ত্তা। এজন্য প্রলয়ের সময় জগৎ ঈশ্বরের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। তখন ঈশ্বরই থাকেন, আর কিছুই থাকে না এইরূপে ঈশ্বর একবার জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, আবার জগতের প্রলয়

করিতেছেন। অনন্ত কাল ধরিয়া এইরূপ চলিয়া আসিতেছে—সৃষ্টি অনাদি। সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—ঈশ্বর প্রথমে আকাশ সৃষ্টি করেন, আকাশের পর বায়ু, বায়ুর পর অগ্নি, অগ্নির পর জল, জলের পর ক্ষিতি। তাহার পর অহঙ্কার মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্মদেহের সৃষ্টি হয়। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি সাতটি ঊর্দ্ধ লোক; অতল, বিতল প্রভৃতি সাতটি অধোলোক; জরায়ুজ, অণ্ডজ প্রভৃতি চারি প্রকার জীবের দেহ;—এই সকল ক্রমশঃ সৃষ্টি হয়। বৈষ্ণব দর্শনে এ সকল কথাই স্বীকার করা হইয়াছে। অধিকন্তু স্মৃতি ও পুরাণ হইতে সৃষ্টি সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন তত্ত্ব ইহার সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন "পাদস্য বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" অর্থাৎ এই বিশ্ব-জগৎ এবং জীবসমূহ ঈশ্বরের এক পাদ বা এক চতুর্থ অংশ; তাঁহার অপর তিন পাদ অমৃত স্বরূপ, উহা দ্যুলোকে অবস্থান করে। এই তিনপাদ যে কি, তাহার বিশেষ বিবরণ শ্রুতিতে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব-দর্শনে ঈশ্বরের এই তিন পাদকে পরব্যোম বলা হইয়াছে। ইহা নিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী বস্তু; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন ইহা "অমৃত স্বরূপ"। ইহা মায়ার রচনা নহে। ইহা ঈশ্বরের চিন্ময় বিভূতি—মায়ার সেখানে কোন প্রতিপত্তি নাই।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে এই বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের এক চতুর্থ অংশ মাত্র। এই বিশ্বজগতের মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ ৫০ কোটি যোজন। কিন্তু সকল ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ সমান নহে। কোনটি ১০০ কোটি যোজন, কোনটি লক্ষ কোটি যোজন, কোনটি নিযুত কোটি, কোনটি কোটি কোটি। এই সকল ব্রহ্মাণ্ড কত বিশাল তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন গোস্বামীকে নিম্নলিখিত পৌরাণিক আখ্যায়িকাটি বলিয়াছিলেন। একদিন ব্রহ্মা কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য দ্বারকায় গিয়াছিলেন। দ্বারপাল কৃষ্ণকে জানাইলেন, "ব্রহ্মা আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।" শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী, কে আসিয়াছেন তাহা বিলক্ষণ জানিতেন; তথাপি ব্রহ্মাকে কিছু নূতন কথা শিখাইবার অভিপ্রায়ে দ্বারপালকে বলিলেন, "দ্বারপাল, তুমি তাঁহাকে বল যে আপনি কোন্ ব্রহ্মা, আপনার নাম কি—শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে চাহিয়াছেন।" দ্বারপাল ব্রহ্মার নিকট গিয়া তাহাই বলিল। ব্রহ্মা ত শুনিয়াই আশ্চর্য্য! ব্রহ্মা আবার কয়জন আছেন? তাঁহার আবার কি বলিয়া পরিচয় দিবেন? যাহা হউক, কিছু চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "দ্বারি, তুমি শ্রীকৃষ্ণকে বলিও যে সনকের পিতা চতুর্মুখ ব্রহ্মা আসিয়াছেন।" দ্বারী গিয়া

শ্রীকৃষ্ণকে তাহাই বলিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "তাহাকে লইয়া আইস।" ব্রহ্মা গিয়া দণ্ডবৎ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে যথোচিত মান্য দেখাইয়া বসিতে বলিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ প্রয়োজনে আসিয়াছেন বলুন।" ব্রহ্মা বলিলেন, "তাহা পরে বলিব। প্রথমে আমার একটি সংশয় অনুগ্রহ করিয়া ছেদন করুন। আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমি কোন্ ব্রহ্মা'। আমি ইহার অর্থ বুঝিলাম না। আমি ভিন্ন জগতে কি আর কোনও ব্রহ্মা আছেন?" শ্রীকৃষ্ণ একটু হাসিয়া বলিলেন, "আছেন। আপনি বসুন—এখনই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন।" এই বলিয়া কৃষ্ণ ক্ষণকালের জন্য ধ্যান করিলেন। অমনি অসংখ্য ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাহারও কুড়িটি মুখ, কাহারও একশত মুখ, কাহারও সহস্র মুখ, কাহারও অযুত, কাহারও লক্ষ, কাহারও কোটি। এইরূপ অসংখ্য ইন্দ্রও উপস্থিত হইলেন। আমাদের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার ত চক্ষু স্থির। তিনি যে কত ক্ষুদ্র—আজ তাহা অনুভব করিলেন। যে সকল ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র প্রভৃতি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন, এবং বলিলেন, "প্রভো, আপনাকে দেখিয়া আমরা সকলে কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে বলুন কি আজ্ঞা।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তোমাদিগকে একত্র দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই ডাকিয়াছিলাম। তোমরা সকলে সুখী হও। এক্ষণে সকলে নিজ নিজ স্থানে যাইতে পার।"

এক দিকে এই সকল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অপর দিকে পরব্যোম; উভয়ের মধ্যে বিরজা নামে নদী আছে। পরব্যোমের দুই ভাগ। এক ভাগের নাম কৃষ্ণলোক; অপর ভাগের মধ্যে অনন্ত কোটি বৈকুণ্ঠ বিদ্যমান। কৃষ্ণলোকের তিন ভাগ—(১) গোলোক বা গোকুল (২) মথুরা (৩) দ্বারকা। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ যশোদা রাখালগণ শ্রীরাধিকা গোপীগণ এবং অন্য ব্রজবাসিগণের সহিত নিত্য-লীলা করেন। মথুরায় মথুরা-লীলা এবং দ্বারকায় দ্বারকালীলা হয়। কৃষ্ণলোক এবং অনন্ত বৈকুণ্ঠ ইহারা সকলেই মায়াতীত এবং নিত্য।

বৈষ্ণব মতে শ্রীকৃষ্ণই ভগবানের স্বরূপ। ভগবানের অপর এক রূপ হইতেছেন বলরাম। ভগবান বলরামের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। কৃষ্ণ ও বলরাম একই বস্তু—কেবল রূপ ভেদ। ভগবান কৃষ্ণরূপে প্রধানতঃ মাধুর্য্য ভোগ করেন; বলরামরূপে প্রধানতঃ জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করেন। জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পৌরাণিক বৃত্তান্ত বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠের বাহিরে একটি সমুদ্র আছে। এই সমুদ্রের

নাম কারণার্ণব। এই সমুদ্র প্রাকৃত বস্তু নহে। ইহার জল চিন্ময় এবং নিত্যপদার্থ। বলরাম মহাবিষ্ণু রূপ ধারণ করিয়া সেই কারণার্ণবে শয়ন করেন এবং জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া কারণার্ণবের বাহিরে অবস্থিত মায়া বা প্রকৃতিকে 'ঈক্ষণ' করেন, অর্থাৎ মায়ার দিকে চাহিয়া দেখেন। তাঁহার ইচ্ছাতে মায়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন। মহাবিষ্ণুর প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত এই সকল ব্রহ্মাণ্ড বাহিরে প্রকাশিত হয়, আবার মহাবিষ্ণু যখন নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন তখন এই সকল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাতে বিলীন হইয়া যায়। গবাক্ষের রন্ধ্রের মধ্য দিয়া যেমন অসংখ্য ধূলিকণা ভিতর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে ভিতরে যাতায়াত করে, সেইরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের সহিত তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বাহিরে আসে।

মহাবিষ্ণু এইরূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক স্থান তিনি নিজ স্বেদ জলে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে শয়ন করেন। ভগবানের এই রূপের নাম গর্ভোদকশায়ী। ইঁহার অপর নাম—হিরণ্যগর্ভ, বা সহস্র শীর্ষ। ইঁহার নাভি হইতে একটী পদ্ম উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা সেই নাভিপদ্মে জন্মগ্রহণ করিয়া চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি করেন।

নারায়ণের নাভিপদ্মে যে চতুর্দশ ভুবন উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে সপ্ত সমুদ্র থাকে। ক্ষীরোদ সমুদ্র তাহাদের মধ্যে একটি। এই ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যে শ্বেতদ্বীপে ভগবান যে রূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করেন তাহার নাম ক্ষীরোদকশায়ী। ইনি জগৎ পালন করেন। এজন্য ইঁহার অপর নাম অন্তর্যামী। ইনি বিভিন্ন মন্বন্তরে এবং বিভিন্ন যুগে অবতাররূপে আবির্ভূত হন এবং ধর্ম সংস্থাপন এবং অধর্ম সংহার করেন। দেবগণ দৈত্য কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে ক্ষীরোদকতীরে গিয়া ইঁহার স্তব করেন। তখন ইনি দেবগণকে দর্শন দেন।

হিন্দুধর্ম্মে দেশের কল্পনা কি বিশাল, তাহা পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। দেশের অনুরূপ কালের কল্পনাও চমৎকার। আমাদের যেমন ২১ ঘণ্টায় দিন, এবং ১২ ঘণ্টায় রাত্রি হয়, পিতৃপুরুষদের সেইরূপ এক কৃষ্ণপক্ষে

এক দিন এবং এক শুক্লপক্ষে এক রাত্রি হয় (১)। উত্তরায়ণের ছয়মাসে দেবতাদের এক দিন, দক্ষিণায়নের ছয় মাসে এক রাত্রি হয় (২)। আমাদের এক বৎসরে, দেবতাদের এক অহোরাত্র। অতএব আমাদের ৩৬৫ বৎসরে দেবতাদের এক বৎসর। দেবতাদের ৪০০০ বৎসরে এক সত্য যুগ হয়। প্রতি যুগের পূর্ববর্ত্তী কালকে সন্ধ্যা এবং পরবর্ত্তী কালকে সন্ধ্যাংশ বলে। সত্যযুগের সন্ধ্যার পরিমাণ ৪০০ দৈব বৎসর; সন্ধ্যাংশেরও পরিমাণ তাহাই। ত্রেতাযুগের পরিমাণ ৩০০০ দৈব বৎসর; ত্রেতাযুগের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের পরিমাণ ৩০০ বৎসর করিয়া। কলিযুগের পরিমাণ ১০০০ দৈব বৎসর; ইহারও ১০০ বৎসর করিয়া দুই সন্ধ্যা। অতএব চারিযুগ এবং আট সন্ধ্যার মোট পরিমাণ এইরূপ—

সত্যযুগে	৪,০০০	দৈব বৎসর
সত্যযুগের দুই সন্ধ্যা	৮০০	”
ত্রেতাযুগ	৩,০০০	”
ত্রেতাযুগের দুই সন্ধ্যা	৬০০	”
দ্বাপর যুগ	২,০০০	”
দ্বাপরযুগের দুই সন্ধ্যা	৪০০	”
কলিযুগ	১,০০০	”
কলিযুগের দুই সন্ধ্যা	২০০	”
	মোট—১২,০০০	”

অতএব ১২,০০০ দৈব বৎসরে অর্থাৎ ১২,০০০ × ৩৬৫ মানব বৎসরে এক চতুর্যুগ হয়। ১০০০ চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিবস হয়; ১০০০ চতুর্যুগে এক

---

(১) আধুনিক জ্যোতির্বেত্তারা জানেন যে চন্দ্র এক মাসে নিজ মেরুদণ্ডের (Axis) চারিদিকে ঘুরে। অতএব চন্দ্রমণ্ডলের যদি কোন অধিবাসী থাকেন, তাঁহাদের একমাসে এক অহোরাত্র হইবে। যাঁহারা পুণ্য কর্ম করেন তাঁহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গিয়া বাস করেন—ইহাও বেদের সিদ্ধান্ত। অতএব পিতৃগণের একমাসে এক অহোরাত্র হওয়া যুক্তিযুক্ত।

(২) মেরুর অধিবাসিগণের ছয় মাসে এক দিন, ছয় মাসে এক রাত্রি। দেবতাদের বাসস্থান স্বর্গভূমি মেরু প্রদেশে অবস্থিত ?

রাত্রি হয়। ব্রহ্মার এক দিবস পরিমাণ কাল সৃষ্টি থাকে ; ব্রহ্মার রাত্রিকালে প্রলয় হয়, পুনরায় দিবসে সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মার এক দিবসে চৌদ্দ মন্বন্তর—এক এক মন্বন্তর এক এক মনুর অধিকার।

এইবার একবার হিসাব করিয়া দেখা যাউক।

৩৬৫	মানব বৎসর =	১ দৈব বৎসর
১২,০০০	দৈব বৎসর =	১ চতুর্যুগ
১,০০০	চতুর্যুগ =	১ ব্রহ্মার দিন
৩৬৫	ব্রহ্মার দিন =	১ ব্রহ্মার বৎসর
১০০	ব্রহ্মার বৎসর =	ব্রহ্মার পরমায়ু

= মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাস পরিমাণ কাল।

প্রলয় দুই প্রকার। ব্রহ্মার রাত্রিকালে যে প্রলয় হয়, তাহাতে জগতের প্রলয় হয় কিন্তু ব্রহ্মা বিদ্যমান থাকেন। ইহা খণ্ড প্রলয়। ব্রহ্মার পরমায়ু অবসান হইলে যে প্রলয় হয়, তাহাতে ব্রহ্মাও বর্ত্তমান থাকেন না। ইহা মহাপ্রলয়।

ব্রহ্মার এক দিবস = ১০০০ চতুর্যুগ

= ১০০০ × ১২০০০ দৈব বৎসর

= ১০০০ × ১২০০০ × ৩৬৫ মানব বৎসর

= ৪৩৮ কোটি মানব বৎসর।

অতএব ৪৩৮ কোটি মানব বৎসর কাল সৃষ্টি বর্ত্তমান থাকে, তাহার পর খণ্ড প্রলয় হয়।

ব্রহ্মার পরমায়ু = ১০০ ব্রহ্মার বৎসর

= ১০০ × ৩৬৫ ব্রহ্মার দিবস

= ১০০ × ৩৬৫ × ৪৩৮ কোটি মানব বৎসর

= ১৫৯৮৭০০০ কোটি মানব বৎসর

এই পরিমাণ কাল পরে মহাপ্রলয় হয়। এবং এই পরিমাণ কাল মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাসের সময়। মহাবিষ্ণু যখন নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন তখন মহাপ্রলয় হইয়া যায়, তখন ব্রহ্মাও থাকে না। তিনি যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন সৃষ্টি হয়। মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের অবধি নাই। এখন অনুমান করুন—কাল কত বিশাল। এই বিশাল কাল এবং দেশের ধারণা করিতে পারে মানবের এরূপ

ক্ষমতা নাই। তবে ইহা ধারণা করিতে চেষ্টা করিলে মানব বুঝিতে পারে—সে কত ক্ষুদ্র; তাহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যের জন্য সে কখনও অহঙ্কার করিতে পারে না।

বৃন্দাবনে, মথুরাতে এবং দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, সে সকল লীলা নিত্য বলিয়া বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন। সংশয় হইতে পারে,—তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? বৃন্দাবন, মথুরা এবং দ্বারকা ত পৃথিবীর ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; এবং পৃথিবী একটী মাত্র অনিত্য ব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র অংশ। বৈষ্ণব গোস্বামীগণ এই সমস্যার এইভাবে মীমাংসা করিয়াছেন—সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন যে, ভগবান বিভু; অর্থাৎ ভগবান সকল স্থানে সকল সময়েই অবস্থান করেন। বৈষ্ণব-মতে যেমন ভগবান বিভু, তাঁহার শ্রেষ্ঠ ধাম কৃষ্ণলোকও সেই প্রকার বিভু। (১) অর্থাৎ ভগবানের বাসস্থান গোকুল, মথুরা এবং বৃন্দাবন সকল সময় সকল স্থানে বিদ্যমান থাকে। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বত্রই সর্বসময়েই ভগবানের নিত্যধাম অর্থাৎ কৃষ্ণলোক বিদ্যমান থাকে। কিন্তু মায়ার দ্বারা তাহা আবৃত থাকে, এ জন্য আমরা তাহা দেখিতে পাই না। যখন কোন এক স্থানে ভগবানের কৃষ্ণলোক প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়, তখন তিনি সেইখানে মায়ার প্রভাব অপসারিত করেন। তখন সেখানে কৃষ্ণলোকের প্রকাশ হয় এবং মানুষ চর্মচক্ষেও তাঁহার নিত্যলীলা দর্শন করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন এইরূপে মায়ার আবরণ বিনষ্ট হইয়াছিল।

---

(১) দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে,—ভগবান, তাঁহার ধাম ও লীলা দেশকালাতীত বা Transcendental.

ভারতবর্ষ বৈশাখ, ১৩৪৪

বৈষ্ণব ধর্ম্মসাধন

সন্ন্যাস লইয়া চৈতন্যদেব দুই তিন মাস নীলাচলে বাস করিয়া দাক্ষিণাত্যের তীর্থসমূহ দর্শন করিতে বাহির হইলেন। পুরী হইতে ছয় সাত ক্রোশ দূরে আলালনাথের মন্দির, সে পর্য্যন্ত ভক্তগণ সঙ্গে চলিলেন। ভক্তদিগকে সেখান হইতে ফিরাইয়া মহাপ্রভু দক্ষিণে চলিলেন। কেবল কৃষ্ণদাস সেবার জন্য সঙ্গে চলিল। যথাসময়ে মহাপ্রভু শ্রীকূর্ম্মের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটি আধুনিক গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত। তাহার পর জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্র দর্শন করিলেন। ইহা Waltair এর নিকটে, ইহার বর্ত্তমান নাম সীমাচল বা সিংহাচল। এখান হইতে রাজামান্দ্রীর (Rajamundry) নিকটে গোদাবরীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এখানে রামানন্দ রায়ের সহিত মহাপ্রভুর প্রথম দেখা হইল। রামানন্দ উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী, পণ্ডিত এবং ভক্ত। রামানন্দ সন্ধ্যাকালে প্রহাপ্রভুর নিকট আসিতেন। সারারাত্রি উভয়ে কৃষ্ণকথার আলোচনায় কাটাইতেন। সকালে রামানন্দ নিজস্থানে ফিরিয়া যাইতেন। এইরূপে দশরাত্রি ধরিয়া মহাপ্রভু এবং রামানন্দ ভক্তি ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু রামানন্দকে সাধ্যের নির্ণয় করিতে বলিলেন. অর্থাৎ কোন্ বস্তু লাভ করিবার জন্য মানবের চেষ্টা করা উচিত।

রামানন্দ কহিলেন, "মানব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্ম পালন করিবে। তাহা হইলেই তাহার ঈশ্বরকে আরাধনা করা হইবে।" হিন্দুর পক্ষে এই স্বধর্ম্ম হইতেছে নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। এই প্রসঙ্গে রামানন্দ বিষ্ণুপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিলেনঃ—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থাঃ নান্যত্তত্তোষ কারণম্॥

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিলে পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনা করা হয়। তাঁহাকে তুষ্ট করিবার অপর উপায় নাই।

গীতাতেও এই কথা আছে, যথা,—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ১৮।৪৬

"যাঁহা হইতে জীবগণের কর্ম্মে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, যিনি এই সকল ব্যাপ্ত

করিয়া আছেন, নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলে মানব সিদ্ধিলাভ করে।" এখানে "স্বকর্ম্ম" অর্থে নিজ বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচটি শ্লোকে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং নিজবর্ণাশ্রম-বিহিত-কর্ম্মকে স্বকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ধর্ম্মজীবনের প্রথম সোপান। মানবের স্বাভাবিক যথেচ্ছাচার প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া তাহার মন ভগবদভিমুখে ফিরাইবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। যেরূপ আচরণ করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের এবং সমাজের কল্যাণ বিধান করিতে পারিবে এবং সকলে শান্তিময় জীবন যাপন করিয়া ঈশ্বরারাধনা পূর্ব্বক অবশেষে ঈশ্বর লাভ করিতে পারিবে, তাহাই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।

মহাপ্রভু রামানন্দের কথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি যাহা বলিলে তাহা বাহ্য বা সাধারণ কথা। ধর্ম্ম জীবনের আরও কিছু গূঢ় কথা বল।"

রামানন্দ বলিলেন, "জীবনে যাহা কিছু করা যায় প্রত্যেক কর্ম্মই ঈশ্বরকে অর্পণ করা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম"। গীতা বলিয়াছেন,

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৯।২৭

"ভোজন, হোম, দান, তপস্যাদি যাহা কিছু কর্ম্ম কর তাহাই আমাকে অর্পণ কর।"

ধর্ম্ম জীবনে কিছু দূর উন্নতি লাভ করিলে মানবের এইরূপ অবস্থা হয়। মানব সর্ব্বদা ভগবানকে চিন্তা করে এবং ভগবানকে নিবেদন না করিয়া কিছু করিতে পারে না। সাধারণ মানবের পক্ষে ইহা অতি উচ্চ অবস্থা। কিন্তু যিনি ঈশ্বর-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার চক্ষে ইহা সামান্য অবস্থা মাত্র। তাই মহাপ্রভু পুনরায় বলিলেন "ইহা বাহ্য কথা, আরও কিছু গূঢ় কথা বল।"

রামানন্দ বলিলেন, "যিনি ঈশ্বর ভক্তিতে প্রণোদিত হইয়া নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণ মাত্র লইয়া অবস্থান করেন তিনি উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিক।" গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮।৬৬

যে ধার্ম্মিক ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, ঈশ্বর নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ঈশ্বর প্রত্যেক জীবকে বিবিধ কর্ম্মে প্রণোদিত করিতেছেন; আবার সকলকে কর্ম্ম অনুসারে কর্ম্মফল দিতেছেন,—যিনি এই সকল কথা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন,—তিনি ক্ষুদ্র সাংসারিক লাভের জন্য আর কর্ম্মে লিপ্ত হন না, একান্তভাবে ভগবানের শরণ লইয়া অবস্থান করেন। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীদের এইরূপ অভিপ্রায়। কিন্তু ইহাও মহাপ্রভুর আদর্শের বহু নিম্নে। শুধু সংসার ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়িলে চলিবে না। একট সুস্পষ্ট আদর্শ, একটা প্রগাঢ় অনুভূতি চাই। নহিলে কিছুই হইল না। তাই মহাপ্রভু বলিলেন, "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

তখন রামানন্দ বলিলেন "জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।" জ্ঞানী বিচার করিয়া দেখেন, সংসারে সকলই অনিত্য, সুখ-ঐশ্বর্য্য আজ আছে কাল নাই তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া কি হইবে? তিনি কাম ক্রোধাদি বশীভূত করেন, ইন্দ্রিয় সংযম করেন, এবং সকল অবস্থায় উদাসীন থাকিয়া এই অনিত্য-সংসার অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ বস্তু—ঈশ্বর—তাঁহাকে ধারণা করিতে সচেষ্ট থাকেন। কঠিন পর্ব্বত বক্ষে উৎস ধারার ন্যায় জ্ঞানীর হৃদয়ে ক্রমশঃ ভক্তির মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হয়। কিন্তু ইহাও শ্রীচৈতন্যদেব যথেষ্ট উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে করিলেন না। বিচার ও জ্ঞান দ্বারা সেই অবাঙ্‌মনসগোচর পুরুষকে লাভ করিবার চেষ্টা বৃথা। যিনি পরিপূর্ণ প্রেম এবং আনন্দ স্বরূপ এই উপায়ে তাঁহার অতি অসম্পূর্ণ ধারণামাত্র সম্ভব। তাই মহাপ্রভু পুনরায় বলিলেন, "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

তখন রামানন্দ বলিলেন; "জ্ঞান-শূন্য ভক্তি অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা।" শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—

> জ্ঞানে প্রায়সমুদপাস্য নমন্ত এব
> জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং।
> স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ
> যে প্রায়শো ঽজিতজিতো ঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

"হে ভগবান্! তোমাকে পাওয়া কঠিন বটে কিন্তু যাহারা সাধুদের মুখে তোমার কথা শুনিয়া কায়মনোবাক্যে তোমাকে পূজা করে, সর্ব্বদা তোমাকে প্রণাম করে এবং জ্ঞান দ্বারা তোমাকে লাভ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করে, তাহারা তোমাকে নিশ্চয়ই পাইয়া থাকে।"

এতক্ষণে মহাপ্রভু কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইলেন। কর্ম্ম, সন্ন্যাস, জ্ঞান এ সকল কথা তাঁহার তত ভাল লাগিতেছিল না। শুদ্ধভক্তি কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের পূজা, ইহা ভাল কথা। তাঁহার দয়া না হইলে কেহ কেবল জ্ঞান বা বিচারের দ্বারা, ধুমধাম করিয়া যজ্ঞ বা দান করিয়া, কিংবা উগ্র তপস্যা করিয়া তাঁহাকে পাইতে পারে না। এবং তাঁহার দয়া হইবার উপায় তাঁহাকে ভক্তি করা, জীব অতি ক্ষুদ্র তাহার শক্তি অতি নগণ্য, ঈশ্বরের কৃপাই জীবের একমাত্র অবলম্বন জানিয়া তাঁহাকে পূজা করা। কিন্তু ভক্তি একটি সাধারণ কথা। ঈশ্বরকে পাইতে হইলে যে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রয়োজন তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া ধারণা করা আবশ্যক। তাই মহাপ্রভু বলিলেন, "এহো হয়, আগে কহ আর"—অর্থাৎ এতক্ষণে ভাল কথা বলিয়াছ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থার কথা বল।

তখন রামানন্দ প্রেমের কথা তুলিলেন। বলিলেন প্রেম-ভক্তিই শ্রেষ্ঠ বস্তু। প্রেম না থাকিলে নানা উপচারে ঈশ্বরকে পূজা করিয়াও কোন ফল নাই, প্রেম থাকিলেই পূজা সার্থক হয়, ঈশ্বর সে পূজা গ্রহণ করেন। ঈশ্বর-ভক্তি যখন এত প্রগাঢ় হয় যে, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা উৎপাদন করে তখন তাহাকে প্রেম বলে।

মহাপ্রভু বলিলেন, "বেশ কথা বলিয়াছ। ঈশ্বর ভজন সম্বন্ধে আরও কিছু নিগূঢ় কথা বল।"

তখন রামানন্দ প্রেমের সূক্ষ্ম বিভাগ সকল নির্দ্দেশ করিলেন। প্রেম পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। সাধারণ প্রেমের নাম শান্ত প্রেম। প্রভুর জন্য দাসের যে প্রেম, তাহার নাম দাস্য প্রেম। সখার জন্য সখার যে প্রেম তাহার নাম সখ্য প্রেম। পুত্রের জন্য পিতা বা মাতার যে প্রেম তাহার নাম বাৎসল্য প্রেম, স্বামীর জন্য স্ত্রীর যে প্রেম তাহার নাম মধুর প্রেম।

ঈশ্বরের জন্য মানবের যে প্রেম তাহা এই পাঁচ প্রকারের মধ্যে কোনও এক প্রকার হইতে পারে। যে ভক্তের যেরূপ প্রকৃতি তাহার প্রেম তদনুরূপ হয়। যে ভক্ত সাধারণ ভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসে তাহার শান্ত প্রেম। প্রভুভক্ত ভৃত্য প্রভুকে যে ভাবে ভালবাসে, যে ভক্ত ঈশ্বরকে সেইভাবে ভালবাসে তাহার দাস্য প্রেম। দাস্য প্রেমের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হনুমান। যে ভক্ত ঈশ্বরকে সখার ন্যায় ভালবাসে তাহার সখ্য প্রেম। ব্রজের রাখালদের সখ্য প্রেম। ঈশ্বরকে যে সন্তানের ন্যায় ভালবাসে তাহার বাৎসল্য প্রেম। যশোদার ও মেনকার

বাৎসল্য প্রেম। ঈশ্বরকে যে স্বামীর ন্যায় ভালবাসে তাহার মধুর প্রেম। লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, রুক্মিণী ও সত্যভামার মধুর প্রেম। এই পাঁচ প্রকার প্রেমের মধ্যে প্রত্যেক রকম প্রেম তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রেম অপেক্ষা প্রগাঢ়তর। শান্ত প্রেম অপেক্ষা দাস্য প্রেম প্রগাঢ়, তাহা অপেক্ষা সখ্য প্রেম, তাহা অপেক্ষা বাৎসল্য প্রেম,—সর্ব্বপেক্ষা মধুর প্রেম প্রগাঢ়। শান্ত প্রেমে যে সকল গুণ আছে, দাস্য প্রেমে সে সকল গুণ আছে, সে সকল ছাড়া আরও অধিক গুণ আছে। দাস্য প্রেমে যে সকল গুণ আছে সখ্য প্রেমে সে সকলই আছে, তদ্ব্যতীত অধিক গুণ আছে। এইভাবে সখ্য প্রেমের সকল গুণ বাৎসল্য প্রেমে, এবং বাৎসল্য প্রেমের সকল গুণ মধুর প্রেমে বিদ্যমান। অবএব শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য প্রেমে যে সকল গুণ আছে মধুর প্রেমে সে সকল গুণই আছে তাহা ব্যতীত আরও কিছু নূতন গুণ আছে। এই কারণে মধুর প্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত , মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মধুর প্রেমের যতগুলি দৃষ্টান্ত আছে তন্মধ্যে শ্রীরাধার প্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে প্রেমে শ্রীরাধা দিবানিশি তন্ময় হইয়া থাকিতেন, কৃষ্ণ-চিন্তা ব্যতীত অপর কোনও চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে উদয় হইত না, যে প্রেমে তিনি জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেন, যাহার জন্য দুঃখ, বিপদ, লাঞ্ছনা মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন সে প্রেমের সমতুল্য অপর কোনও প্রেম দেখা যায় না। *

* বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রেমের যে পাঁচ প্রকার ভেদ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে মাতৃপ্রেমের উল্লেখ নাই। বৈষ্ণব সাধনায় ঈশ্বরকে মাতৃভাবে পূজা করিবার কথা নাই; কিন্তু শক্তি সাধনায় ইহা উৎকৃষ্ট পন্থা। রামপ্রসাদ সেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ঈশ্বরকে মাতৃভাবে ভজন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। মাতৃ-প্রেমকে বোধ হয় বাৎসল্য প্রেমের কাছাকাছি কিঞ্চিৎ নিম্নে স্থান দিতে পারা যায়। কারণ, সন্তান মাকে যত পরিমাণে ভালবাসে, মাতা সন্তানকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

"যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করি।" ঈশ্বরকে যে প্রভু রূপে ভজনা করে সে প্রভু রূপেই ঈশ্বরকে পায়। যে সখারূপে ভজনা করে সে সখা রূপে পায়, যে সন্তানরূপে ভজনা করে সে সন্তানরূপে পায়, যে পতিরূপে ভজনা করে সে পতিরূপেই পায়। ঈশ্বরকে প্রভুরূপে পাওয়া অপেক্ষা সখারূপে পাইলে বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে পাওয়া হয়; সন্তানরূপে পাইলে আরও বেশী; পতিরূপে পাইলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া হয়।

কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

ঈশ্বরকে যাঁহারা নির্গুণ, নিরাকার ভাবে পূজা করেন তাঁহারা ঈশ্বরকে নিরাকার ভাবে পাইয়া থাকেন যাঁহারা সগুণভাবে, প্রভু, সখা, সন্তান বা পতিরূপে উপাসনা করেন তাঁহারা সেই ভাবেই ভগবানকে পাইয়া থাকেন। বৈষ্ণব মতে ঈশ্বরকে নির্গুণভাবে পাওয়া অপেক্ষা সগুণ ভাবে কোন বিশেষরূপে পাইলে বেশী ঘনিষ্টভাবে পাওয়া হয় এবং তাহাতে বেশী আনন্দ হয়।

ঈশ্বরকে কি ভাবে পাওয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এতক্ষণে তাহাই আলোচনা হইতেছিল। যে বস্তু পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় তাহাকে 'সাধ্য' বলা হয়। ঈশ্বরকে পতিরূপে পাওয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এজন্য ইহাকে সকল সাধ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। অতঃপর মহাপ্রভু রামানন্দকে বলিলেন কৃষ্ণ এবং রাধা কি বস্তু তুমি তাহা বুঝাইয়া বল। তুমি ভিন্ন আর কেহ এই তত্ব নিরূপণ করিতে পারে না।

উত্তরে রামানন্দ রায় বিনয় করিয়া কহিলেন, "আমার কি সাধ্য যে, আমি এই সকল দুরূহ তত্ব বুঝিতে পারি বা ব্যাখ্যা করিতে পারি। তুমি অন্তর্যামী ভগবান। আমার হৃদয়ে থাকিয়া তুমি আমাকে যেরূপ বলাইতেছ আমি সেইরূপ বলিতেছি।"

রাম কহে আমি ইহা কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥

তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণ করি, জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিব ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

রামানন্দ বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণই ভগবান। মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি ভগবানের যেরূপ অবতার আছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ ভগবানের অবতার নহেন। তিনি স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণ হইতেই অবতারগণের উদ্ভব হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণ অবতারী। তিনিই বিশ্বজগতের আদি কারণ। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই অবস্থান করে। তাঁহার দেহ, রক্ত মাংসের দেহ নহে। তাঁহার চিন্ময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাঁহার শক্তি অনন্ত, তাঁহার ঐশ্বর্য্য অনন্ত, তাঁহার মাধুর্য্য অনন্ত। তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান,—মায়া শক্তি, জীব শক্তি এবং চিৎ শক্তি। মায়া শক্তি দ্বারা ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করেন। জীবশক্তি দ্বারা তিনি জীব সমুহকে বিভিন্ন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন এবং কর্ম্ম অনুসারে সকলকে ফল প্রদান করেন। চিৎশক্তি তিন ভাগে বিভক্ত; উহারা সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী নামে পরিচিত। ঈশ্বরের রূপ সচ্চিদানন্দ। সৎ চিৎ এবং আনন্দের সহিত সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী এই তিনটি শক্তি সম্বদ্ধ। যে শক্তির দ্বারা ঈশ্বর সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা অবস্থান কবেন তাহা তাঁহার সন্ধিনী শক্তি। যে শক্তি দ্বারা তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল বস্তু জানিতে পারেন তাহা সংবিৎ শক্তি। যে শক্তির দ্বারা তিনি পরমানন্দ লাভ করেন তাহা হ্লাদিনী বা আহ্লাদিনী শক্তি।

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে পুন আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে পুন আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

হ্লাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠ অংশের নাম প্রেম। প্রেমের যাহা পরম সারভাগ তাহার নাম মহাভাব। এই মহাভাবই শ্রীরাধিকার স্বরূপ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের

অনন্ত শক্তির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ শক্তি—হ্লাদিনী শক্তি—তাহার যে উৎকৃষ্টতম অংশ মহাভাব—ইহাই শ্রীরাধিকার স্বরূপ।"

শ্রীভগবানের স্বরূপ কি এবং কি ভাবে ভগবানকে পাইলে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া হয় এতক্ষণ তাহার আলোচনা হইল। দেখা গেল যে, শ্রীকৃষ্ণই ভগবানের স্বরূপ—তাঁহার দেহ সচ্চিদানন্দময়। স্ত্রী যে ভাবে স্বামীকে পায়, ভক্ত সেই ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পাইলে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহাকে পাওয়া হয়। কি উপায়ে ভগবানকে সে ভাবে পাওয়া যায়, মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ অনুসারে রামানন্দ তাহাও বলিলেন। ভক্ত নিজকে একজন গোপী বলিয়া মনে করিবেন এবং দিবানিশি রাধাকৃষ্ণের বিহার চিন্তা করিবেন, ইহাই ভগবানকে ঘনিষ্ঠভাবে প'ইবার শ্রেষ্ঠ উপায়।* রাধাকৃষ্ণ যেখানে বিহার করেন, গোপীগণ ব্যতীত কাহারও সেখানে যাইবার অধিকার নাই। গোপীগণ রাধাকৃষ্ণের লীলা বিস্তার করিবার সহায়তা করেন। কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য গোপীর তাদৃশ আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কৃষ্ণ রাধিকার সহিত মিলিত হইলেই গোপীগণ বেশী আনন্দ পায়। কিন্তু রাধিকা নানা ছলে কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের মিলন করাইতে ভালবাসেন। গোপীগণ নিজেরা সুখী হইবার জন্য কৃষ্ণের সহিত মিলিত হন না, কৃষ্ণকে সুখ দিবার জন্য তাঁহারা মিলিত হন। গোপীর প্রেম, কাম হইতে ভিন্ন বস্তু। কামীর উদ্দেশ্য নিজ ইন্দ্রিয় সুখ। গোপীদের উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে সুখী করা। †

এইরূপে দশ রাত্রি রামানন্দ সঙ্গে।
সুখে গোঙাইল প্রভু কৃষ্ণ কথা রঙ্গে॥

---

* অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লয়ে যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহপাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

† নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

গীতা ও বেদ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলিয়াছেন যে, গীতা বেদবিরোধী। তাঁহাদের প্রতিধ্বনি করিয়া আমাদের দিগ্‌গজ পণ্ডিতরাও সেই কথা বলিয়াছেন; * কারণ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতের প্রতিধ্বনি করাই আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। অপর দিকে শঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, গীতা হইতেছে সমগ্র বেদের সার-সংগ্রহ,—"তৎ ইদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং"। রামানুজও তাঁহার ভাষ্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য যে ভক্তিযোগ, তাহা "বেদান্তোদিত" অর্থাৎ উপনিষদে তাহা উক্ত হইয়াছে। মধ্বাচার্য্য গীতা ভাষ্যের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে, জগতে বেদ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিলেন, বিষ্ণু ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া "সর্ব্ববেদার্থোপবৃংহিত মহাভারত" রচনা করিলেন। সুতরাং আধুনিক পণ্ডিতদের মত গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে, শঙ্কর রামানুজ মধ্বাচার্য্য—ইঁহারা বেদ বা গীতার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই।

আধুনিক পণ্ডিতদের মত যে অন্তঃসারশূন্য, ইহা দেখাইবার জন্য আমরা তাঁহাদের যুক্তি বিচার করিয়া দেখিব। গীতায় বেদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও আলোচনা করিব। প্রধান প্রধান দার্শনিক বিষয়ে গীতার মতের সহিত বেদের মতের তুলনা করিব। প্রসঙ্গক্রমে গীতার কয়েকটি শ্লোকের সহিত বেদের শ্লোকের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিব। আমরা বেদ শব্দে উপনিষদ্‌ সকলকেও গ্রহণ করিতেছি; কারণ, উপনিষদ্‌ বেদের অন্তর্গত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ং" (আপস্তম্ব—যজ্ঞপরিভাষাসূত্র) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়েরই নাম বেদ। উপনিষদ সকল হয় মন্ত্র নয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত।

---

* "The repudiation of sacrifice of animals and inefficacy of sacrificial worship are common to Vaishnavism and Buddhism."—Vaishnavism, Saivism and other minor religious systems by Sir Ramkirshna Gopal Bhandarkar "যজ্ঞে পশুবধ নিষেধ এবং যজ্ঞের বিফলতা, এই দুই বিষয়ে গীতোক্ত বৈষ্ণবমত এবং বৌদ্ধমতের সাদৃশ্য দেখা যায়।' সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর।

গীতা বেদবিরোধী ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য আধুনিক পণ্ডিতগণ গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উল্লেখ করেন :—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

২।৪২, ৪৩, ৪৪।

"বেদে যে সকল অর্থবাদ (স্বর্গাদি কর্ম্মফলের প্রশংসাবাচক বাক্য) আছে, যে সকল বিদ্যাহীন ব্যক্তি সেই সকলে আসক্ত, যাহারা বলে যে, বেদে যজ্ঞাদি কর্ম্ম এবং স্বর্গাদি কর্ম্মফল ব্যতীত আর কিছু নাই, যাহাদের চিত্ত ভোগাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ, যাহারা স্বর্গলাভকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহারা শ্রোতার চিত্তে ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত করিবার জন্য নানা অলঙ্কারযুক্ত কথা বলে, এবং বহু অনুষ্ঠানপূর্ণ যজ্ঞ করিতেই উপদেশ দেয়, যাহারা এই সকল কথা বলে, তাহাদের চিত্তও ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত হয়, তাহারা তাহাদের বুদ্ধি হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিতে পারে না (বাহ্য বিষয়ে চিন্তা করে, এ জন্য আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না)।"

এখানে বেদের কোনও নিন্দা নাই। যাঁহারা বলেন যে, বেদে স্বর্গভোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কথা নাই, তাঁহাদের ব্যাখ্যার নিন্দা আছে। যজ্ঞেরও নিন্দা নাই, স্বর্গলাভের আশায় যজ্ঞ করার নিন্দা আছে। ভগবান্ গীতায় পরে বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ ত্যাগ করা উচিত নহে (১৮।৫), * কারণ, যজ্ঞ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় কিন্তু স্বর্গলাভের আশা ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ করা উচিত (১৮।৬)। † সুতরাং উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে বেদেরও নিন্দা নাই, যজ্ঞেরও নিন্দা নাই। বেদের ভুল ব্যাখ্যার নিন্দা আছে মাত্র।

---

* যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ। গীতা ১৮।৫

† এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ১৮।৬

গীতায় ভগবান্ পুনরায় বলিয়াছেন,—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ২।৪৫

"বেদে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের বিষয় বলা হইয়াছে। হে অর্জ্জুন, তোমাকে এই তিন গুণের উর্দ্ধে উঠিতে হইবে,—গুণাতীত হইতে হইবে। তুমি সুখ দুঃখ শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি বিপরীত অবস্থায় সমভাবে অবস্থান করিবে, ধৈর্য্য অবলম্বন করিবে, যাহা তোমার নাই তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিও না, যাহা আছে তাহা কিসে রক্ষা হয় সে চিন্তায় ব্যাকুল হইও না, আত্মা কি বস্তু, তাহারই অন্বেষণ কর।"

"বেদ ত্রৈগুণ্যবিষয়", এখানে বেদের কর্ম্মকাণ্ডকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, * জ্ঞানকাণ্ডকে লক্ষ্য করা হয় নাই, কারণ, বেদের জ্ঞানকাণ্ডে ত্রিগুণাতীত অবস্থার উল্লেখ আছে। যথা,—অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্ (কঠোপনিষৎ ৩।১৫) অর্থাৎ ব্রহ্মের শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, পরিবর্ত্তন নাই।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥
(কঠোপনিষৎ ৬।১৪)

"হৃদয়ের সকল কামনা যখন অপগত হয়, তখন মানব অমৃত হইয়া যায় এবং এই জীবনেই ব্রহ্মলাভ করে।"

যৎ তৎ অদৃশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ (মুণ্ডকোপনিষৎ) ব্রহ্মকে দেখা যায় না, গ্রহণ করা যায় না, তাঁহার গোত্র নাই, বর্ণ নাই।

যদি স্বর্গলাভ অতিশয় তুচ্ছ বস্তু, তাহা হইলে কেন বেদ যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভের কথা বলিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে রামানুজ বলিয়াছেন,—করুণাময় বেদ সকল মানবেরই হিতাকাঙ্ক্ষী, যাহাদের রজোগুণ বা তমোগুণ অধিক, তাহাদেরও হিতাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তাহারা বিষয়সুখভোগের জন্য বড় ব্যাকুল, মোক্ষলাভ তাহারা চায় না (সত্ত্বগুণ প্রচুর হইলে মোক্ষলাভের ইচ্ছা হয়), তাহাদের জন্য বেদ বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ করিয়া তোমরা স্বর্গে গিয়া অনেক বিষয়-সুখভোগ করিতে পারিবে, যদি বেদ সে কথা না বলিতেন,

* বেদশব্দেন অত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে—আনন্দগিরি।

তাহা হইলে তাহারা ইহলোকে অধিক ভোগের চেষ্টায় অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়া বিনষ্ট হইত।

অতএব এখানে বেদকে মিথ্যাও বলা হইল না, বেদকে মন্দও বলা হইল না। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যে সকল সুখভোগের কথা আছে, তাহা নিম্ন অধিকারীর পক্ষে উপযোগী। অর্জ্জুন উচ্চ অধিকারী। এ জন্য অর্জ্জুনকে বিষয়-সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে বলা হইল,—আত্মা কি বস্তু তাহা জানিতে বলা হইল। বলা বাহুল্য, এই আত্মজ্ঞানের কথা বেদ-বেদান্তেও বহুল পরিমাণে উল্লেখ আছে। যথা,—

আত্মানং চেৎ বিজানীয়াৎ অয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ॥
—বৃহদারণ্যক ৪-৪-১২।

"জীব যদি জানিতে পারে, আত্মা কি বস্তু, তাহা হইলে আর শরীর লইয়া কেন দুঃখ পাইবে?"

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

"আত্মাকে জানিতে হইবে। (জানিবার উপায়) প্রথমে গুরুর নিকট উপদেশ লইতে হইবে, তাহার পর বিচার করিতে হইবে, তাহার পর ধ্যান করিতে হইবে।"

গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটিও অনেকে বেদবিরোধী মনে করেন,—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ২।৪৬

শঙ্কর এইভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—অনেকগুলি ক্ষুদ্র জলাশয় দ্বারা যত প্রয়োজন সাধিত হয় (কোনটির জল পান করা হয়, কোনটিতে স্নান করা হয়, কোনটিতে বস্ত্র ধৌত করা হয়)। একটি মাত্র বিশাল হ্রদে সেই সকল প্রয়োজন সাধিত হয়। সেইরূপ বেদে যে সকল যজ্ঞের উল্লেখ আছে, সেই সকল যজ্ঞ করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান হইতে সেই ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্মানন্দের মধ্যে সকল ক্ষুদ্র আনন্দ অন্তর্ভুক্ত।

রামানুজ এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—বিশাল জলাশয় হইতে যেটুকু জল আমাদের প্রয়োজন, আমরা সেইটুকু গ্রহণ করি, সমস্ত জল গ্রহণ করি না; সেইরূপ বেদে যত রকম যজ্ঞাদি কর্ম্মের উল্লেখ আছে, সকল কর্ম্ম করিতে হয় না। যে ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করিতে চাহে, সে (বেদোক্ত) যেটুকু তাহার মুক্তিলাভের সহায়ক, সেই কর্ম্মটুকুই গ্রহণ করে।

মধ্বাচার্য্য শঙ্করের অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইহার সহজ অর্থ এইরূপ—বিশাল জলাশয় পাইলে যেরূপ ক্ষুদ্র জলাশয়ে কোনও প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে বেদের আর কোনও প্রয়োজন থাকে না।

যে ভাবেই এই শ্লোকের অর্থ করা যাউক, ইহাতে বেদবিরোধী কিছু নাই। ব্রহ্মলাভ করিবার জন্য-ই বেদ প্রয়োজন। ব্রহ্মলাভ হইলে আর বেদের প্রয়োজন নাই বলিলেও বেদের গৌরবের কিছু হানি হয়না।

গীতার অপর যে সকল স্থানে বেদের উল্লেখ আছে, সেই সকল অংশের আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, গীতায় বেদবিরোধী কিছুই থাকিতে পারে না। গীতা ৪।২৮ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কোনও কোনও সাধক "স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ" অর্থাৎ কেহ স্বাধ্যায় বা বেদপাঠই যজ্ঞ বা ঈশ্বর-আরাধনা করিবার উপায় মনে করে, কেহ বা বেদের অর্থজ্ঞানকে যজ্ঞ মনে করে, এই সকল সাধক এই যজ্ঞের দ্বারা পাপক্ষয় করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মলাভ করে, তাহা পরবর্ত্তী ৩০ ও ৩১ শ্লোকে বলা হইয়াছে। যিনি বেদবিরোধী মত প্রচার করিবেন, তিনি একথা বলিতে পারেন না। ৬।৪৪ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি যোগকে জানিতে ইচ্ছা করে, সেই "শব্দব্রহ্মকে" অতিক্রম করিতে পারে। এই শব্দব্রহ্ম শব্দের অর্থ শঙ্কর বলিয়াছেন বেদ। তিনি বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ করিবার কথা বেদ বলিয়াছেন, যোগ অভ্যাসের চেষ্টা করিলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারা যায়। সকামভাবে বৈদিক কর্ম্ম করিলে শ্রেষ্ঠ গতি—মুক্তিলাভ হয় না, ইহাই এখানে বলা হইল। গীতায় অন্যত্র যে বলা হইয়াছে, নিষ্কামভাবে বৈদিক কর্ম্ম করিলে চিত্তশুদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপযোগী হয়, এখানে তাহার বিরোধী কথা থাকিতে পারে না, কারণ, ভগবান্ পরস্পর-বিরোধী বাক্য বলিতে পারেন না। রামানুজ "শব্দব্রহ্ম" এই কথাটির অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এখানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ প্রকৃতি, এবং শব্দব্রহ্ম কথার অর্থ দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি প্রকৃতির অন্তর্গত যে সকল অবস্থা আছে, সেই সকল অবস্থা। রামানুজ বলেন যে, যোগ অভ্যাস করিলে দেহকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয় না, আত্মার যাহা স্বরূপ, যাহা প্রকৃতির উর্দ্ধে—সেই স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মধ্ব বলিয়াছেন, "শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে" এই কথার অর্থ "পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।"

৮।১১ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, তোমাকে ঈশ্বরলাভের উপায় বলিতেছি,

যে ঈশ্বরকে বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ অক্ষর শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করেন। ১১।৪৮ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, বেদ, যজ্ঞ এবং অধ্যয়ন দ্বারা ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারা যায় না। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ভগবান্ ৪।২৭-৩১ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, বেদ-পাঠ এবং বেদের অর্থজ্ঞানকে যাঁহারা যজ্ঞ বা ঈশ্বর-আরাধনার উপায় বলিয়া সাধনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরলাভ করিতে পারেন। ঐ বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ১১'৪৮ শ্লোক ব্যাখ্যা করিলে বুঝিতে হইবে যে যাঁহারা বেদপাঠ এবং যজ্ঞকে ঈশ্বর-আরাধনা করিবার উপায় মনে না করিয়া স্বর্গাদিলাভের জন্য যজ্ঞ বা বেদপাঠ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলাভ করিতে পারেন না, তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। ১১।৫৩ ও ৫৪ শ্লোকেও ভগবান্ বলিয়াছেন, বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না, অনন্যভক্তির দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। বেদপাঠ, যজ্ঞ প্রভৃতি নিষ্কামভাবে করিলে অনন্যভক্তি লাভ হয়, ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, কিন্তু নিষ্কামভাবে না করিলে অনন্যভক্তিলাভ হয় না, ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না, ইহাই ভগবানের উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে, নচেৎ পূর্ব্বোক্ত ৪।২৮-৩১ শ্লোকের সহিত ১১ অধ্যায়ের এই শ্লোকগুলির সামঞ্জস্য হয় না। গীতা ১৩।৪ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, ক্ষেত্র কি আমি তোমাকে বলিব, যে সকল বিষয় ঋষিগণ বহুভাবে বিবিধ ছন্দে গান করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মসূত্রেও যে বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋষিরা বিবিধ ছন্দে গান করিয়াছেন,*—এখানে অবশ্য ঋগ্বেদ এবং সামবেদকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, কারণ, ইহার পরেই ব্রহ্মসূত্রের কথা বলা হইয়াছে,—যে ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদের বাক্যগুলি বিচার করা হইয়াছে। অতএব আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেদ প্রামাণিক, ঋষিগণ সত্য দর্শন করিয়াছিলেন, এখানে তাহা লক্ষ্য করা হইয়াছে।

গীতা ১৫।১ শ্লোকে সংসারকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, এবং বেদকে বৃক্ষের পত্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, পত্র

---

*শঙ্কর এবং রামানুজ উভয়েই বলিয়াছেন যে, 'ঋষিভিঃ গীতং' এখানে ঋষি-প্রণীত পুরাণাদি এবং "ছন্দোভিঃ গীতং" এখানে ঋক্ সাম প্রভৃতি বেদকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; বলা বাহুল্য, তাহাদের ব্যাখ্যা অতিশয় সমীচীন। কারণ. বেদ ঋষি-প্রণীত নহে। তাঁহাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিলেও এখানে যে বেদকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। শঙ্কর—রামানুজ—মধ্ব সকলেই বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্মসূত্র" শব্দে বাদরায়ণ বা ব্যাস-প্রণীত শারীরিক-মীমাসাসূত্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

সকল যেমন বৃক্ষকে রক্ষা করে, বেদও সেইরূপ সংসারকে রক্ষা করে। কারণ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল বেদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। রামানুজ এই উপমাটির অন্য হেতু দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পত্র যেমন বৃক্ষকে বর্দ্ধিত করে, বেদও তেমনই সংসারকে বর্দ্ধিত করে,—বেদোক্ত যজ্ঞ করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ, পুত্রলাভ প্রভৃতি হইয়া থাকে। মধ্ব বলিয়াছেন যে, পত্র না হইলে যেমন ফল হয় না, সেইরূপ বেদোক্ত কর্ম্ম ব্যতীত স্বর্গাদি ফললাভ হয় না। এই শ্লোকের শেষে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর হইতে সংসারের উৎপত্তি এবং বেদ সকল ইহার পত্র-স্থানীয়, যে ব্যক্তি ইহা জানে, সেই বেদবিৎ। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এই সংসার বৃক্ষের স্বরূপ অবগত হইতে হইলে, ইহার উৎপত্তিস্থল ঈশ্বরকেও জানিতে হইবে, সুতরাং জানিতে কিছু বাকি থাকিবে না, যিনি ইহা জানেন তাঁহাকে বেদজ্ঞ বলা যায়। রামানুজ বলিয়াছেন যে, সংসারের স্বরূপ অবগত হইলে সংসারকে ছেদন করিবার মত জ্ঞান লাভ করা যায়। এই শ্লোকে বেদবিৎ ব্যক্তিকে পূর্ণজ্ঞানি-রূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৫।১৫ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্

"সকল বেদ দ্বারা আমাকেই জানা উচিত। আমি বেদান্ত রচনা করিয়াছি। আমিই বেদের প্রকৃত অর্থ অবগত আছি।"

শঙ্কর "বেদান্তকৃৎ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন যে, বেদান্ত-অর্থ-সম্প্রদায়-কৃৎ। বেদান্ত বা উপনিষদের অর্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্নরূপে করা হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় অদ্বৈত, দ্বৈত প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় ঈশ্বরের দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছে,—ঈশ্বরই বিভিন্ন আচার্য্যকে উপনিষদের বিভিন্ন ব্যাখ্যার অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন; মানবের বিভিন্ন শক্তি এবং রুচি অনুসারেই ঈশ্বর কর্তৃক বিভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। 'বেদান্তকৃৎ' শব্দকে শঙ্কর উপনিষদের রচয়িতা এভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, বেদ ও উপনিষদ্ নিত্য,—সুতরাং ঈশ্বরের রচনা বলা ঠিক হয় না। এই জন্য রামানুজও 'বেদান্তকৃৎ' শব্দের অর্থ 'উপনিষদের রচয়িতা' এরূপ না করিয়া 'বেদের অন্ত বা ফলপ্রদাতা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, বেদের প্রকৃত

অর্থ তিনিই জানেন। বেদ যদি মনুষ্যের রচনা হইত, তাহা হইলে বেদের অর্থ সেই সকল রচয়িতারা অবশ্যই জানিতেন। ভগবান্ যখন বলিতেছেন যে, তিনিই বেদের প্রকৃত অর্থ জানেন, তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বেদ কাহারও রচনা নহে,—ইহা ঋষিদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল মাত্র।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ—সকল বেদের দ্বারা আমাকেই জানিতে হয়,—ঈশ্বরকে জানাই সকল বেদের তাৎপর্য্য,—ঈশ্বরলাভের উপায় বেদে বিবৃত হইয়াছে, এইভাবে সকল বেদবাক্যের সামঞ্জস্য করিতে হয়। উপনিষদ্‌ও এই কথা বলিয়াছেন,—সর্ব্বে বেদাঃ যৎ পদম্ আমনন্তি (কঠোপনিষদ্) সকল বেদই যাঁহার কথা বলে। 'তৎ তু সমন্বয়াৎ' এই ব্রহ্মসূত্রেও (১।১।৪) এই কথা বলা হইয়াছে,—বিভিন্ন বেদবাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ নাই,—বিভিন্ন বেদবাক্যে ঈশ্বরলাভের বিভিন্ন পথের বিভিন্ন অংশ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—আপাততঃ সে সকল বাক্য পরস্পর-বিরোধী মনে হইতে পারে, কিন্তু সকল পথই শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মে গিয়া মিশিয়াছে, এই ভাবে সকল বেদবাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দর্শন করিতে হইবে। ১৫।১৮ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে, তিনি বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ,—তিনি যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ইহা সকল বেদেরই মত।

১৭।২৩ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, বাক্যের দ্বারা যে তপস্যা করা যায়, "স্বাধ্যায়" বা বেদপাঠ তাহার একটি অঙ্গ। গীতা যদি বেদবিরোধী হইত, তাহা হইলে এ কথা বলা হইত না। ১৭।২৩ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের তিনটি নাম,—(১) ওঁ, (২) তৎ এবং (৩) সৎ; এই তিনটি নাম হইতে ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞের সৃষ্টি হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য এবং শ্রীধর স্বামী শ্লোকটি এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামানুজ বলিয়াছেন যে, এখানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ বেদ; ওঁ তৎসৎ এই কয়টি শব্দ উচ্চারণ করিয়া বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্ম করা হয়, এজন্য বলা হইয়াছে যে, এই তিনটি শব্দ বেদের নাম। যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হউক, এখানে যে বেদকে উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২।৫৩ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন, "শ্রুতি"র দ্বারা তোমার বুদ্ধি বিচলিত হইয়াছে, যখন তোমার বুদ্ধি সমাধি অবলম্বন করিয়া স্থির হইবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে। কেহ কেহ বলেন যে; এখানে শ্রুতি শব্দের অর্থ বেদ, অতএব এখানে বেদের নিন্দা আছে। কিন্তু এখানে

শ্রুতি শব্দের অর্থ বেদ নহে। পূর্ব্বের শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অর্জ্জুনের বুদ্ধি যখন মোহমুক্ত হইবে, তখন অর্জ্জুন 'শ্রোতব্য' এবং 'শ্রুত'—যাহা কিছু তিনি পূর্ব্বে শুনিয়াছেন এবং যাহা পরে শুনিবেন,—সকল বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবেন। ইহার পরেই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, শ্রুতির দ্বারা অর্জ্জুনের বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বের শ্লোকের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে শ্রুতি শব্দের অর্থ, 'অর্জ্জুন যাহা কিছু শুনিয়াছেন' এই ভাবে গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। শঙ্কর এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রুতিভিঃ—শ্রবণৈঃ। শ্রীধরস্বামী স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন, "লৌকিক-বৈদিক-অর্থ-শ্রবণৈঃ" লৌকিক ও বৈদিক যে সকল কথা অর্জ্জুন শুনিয়াছেন। কিন্তু যদিও ইহা স্বীকার করা যায় যে, এখানে শ্রুতি শব্দের অর্থ বেদ, তথাপি ইহাতে বেদের নিন্দা করা হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। অর্জ্জুন বেদ শুনিয়াছেন কিন্তু বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, অথবা ভুল অর্থ বুঝিয়াছেন, এজন্য তাঁহার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়াছে, বেদের প্রকৃত অর্থ জানিলে বুদ্ধি স্থির হইবে, কারণ, "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" সকল বেদে ঈশ্বরকে জানিবার কথাই আছে, যদিও গূঢ়ভাবে আছে, এবং অনেকে সেজন্য বুঝিতে পারে না। ঈশ্বরই বেদের প্রকৃত অর্থ জানেন, "বেদবিদেব চাহং।" মধ্বাচার্য্য এখানে শ্রুতি শব্দের অর্থ বেদই লইয়াছেন। রামানুজ ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এখানে 'বিপ্রতিপন্না' শব্দের অর্থ "বিভ্রান্ত" নহে, বিপ্রতিপন্না অর্থাৎ বিশেষভাবে প্রতিপন্ন, অর্জ্জুনের বুদ্ধি বাহ্য বস্তু ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম আত্ম-তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াছে, এবং ইহার পরেই অর্জ্জুন 'যোগমবাপ্স্যসি' অর্থাৎ যোগ লাভ করিবেন। অতএব এই শ্লোকে বেদের নিন্দা আছে, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

১৬।২৪ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্র শব্দের অর্থ বেদ স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ। * এই শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, গীতার মতে বেদ অভ্রান্ত। সুতরাং গীতা কখনও বেদ-বিরোধী হইতে পারে না। ১৭।৫ শ্লোকে ভগবান্ শাস্ত্রবিরোধী তপস্যার নিন্দা করিয়াছেন।

---

* এই শ্লোকের শঙ্করভাষ্যে কোনও কোনও গ্রন্থে এইরূপ পাঠ দেখা যায়, "শাস্ত্রং বেদাঃ"। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইবে না যে, শঙ্কর স্মৃতিকে প্রামাণ্য মনে করেন নাই। গীতা ১৭-১ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়কেই শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইতিহাস ও পুরাণ উভয়েই স্মৃতির অন্তর্গত।

বেদের সিদ্ধান্তসকল গীতায় কি ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা আলোচনা করিতেছি। বেদে বলা হইয়াছে যে, বিশ্বজগৎ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয়, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্"—এই সকলই ব্রহ্ম, কারণ, জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মে অবস্থিত এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয়। গীতায় ভগবান্ও এই কথা বলিয়াছেন। ৭।৬ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা,"—আমি সমগ্র জগতের উৎপত্তিস্থল এবং সমগ্র জগৎ আমাতেই বিলীন হয়। বেদে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ আছে, এবং বলা হইয়াছে যে, এই সকল দেবতাকে যজ্ঞের দ্বারা পূজা করিলে স্বর্গ লাভ করা যায়। গীতাতেও বহুস্থলে এই সকল দেবতার উল্লেখ আছে এবং বলা হইয়াছে, যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ লাভ করা যায়, যথা ৯।২০, ২১। বেদে ইহাও বলা হইয়াছে যে, অনাসক্ত ভাবে যজ্ঞ করিলে ব্রহ্মলাভ করা যায়, যথা,—

তমএব ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্)

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণগণ অনাসক্ত ভাবে যজ্ঞ দান এবং তপস্যা করিয়া তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করেন।" এই কথার উদ্দেশ্য এই যে, অনাসক্তভাবে যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইবে, শুদ্ধচিত্তে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে তাঁহাকে লাভ করা যাইবে।

গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অনাসক্ত ভাবে যজ্ঞ দান ও তপস্যা করা উচিত, করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়।

> যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ১৮।৫
> এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
> কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ১৮।৬
> যজ্ঞ দান ও তপস্যা মনীষিদিগের চিত্ত শুদ্ধ করে।

এই সকল কর্ম্ম আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া করা উচিত, ইহাই আমার নিশ্চিত মত।

বেদে পুনর্জ্জন্মের কথা আছে,—

> যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ
> স্থাণুমন্যেঽনুসংযান্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥ (কঠোপনিষদ্ ৫।৭)

গীতাও পুনর্জ্জন্মের কথা বলিয়াছেন,—

> জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। গীতা ২।২৭
> "জন্ম হইলে মৃত্যু নিশ্চিত, মৃত্যু হইলে জন্ম নিশ্চিত।"

বেদে উক্ত হইয়াছে যে ঈশ্বর চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন (পুরুষসূক্ত—ঋগ্বেদ ১০।৯০)। গীতায় ভগবান্‌ও বলিয়াছেন যে, তিনি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন,—চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং (গীতা ৪।১৩)।

বেদ বলিয়াছেন—

বেদাহমেকং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

"আমি এক মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, তিনি সূর্য্যের ন্যায় বর্ণযুক্ত এবং অন্ধকারের পরে অবস্থিত।"

গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন,—
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। গীতা ৮।৯

বেদে মৃত্যুর পর দুইটি পথের উল্লেখ আছে, দেবযান পথে গমন করিলে ব্রহ্ম লাভ হয়, সংসারে আর ফিরিতে হয় না। পিতৃযান পথে গমন করিলে প্রথমে স্বর্গলাভ হয়, পরে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, (বৃহদারণ্যক ৬।২।১৫, ১৬)। গীতাতেও এই দুই পথের উল্লেখ আছে (গীতা ৮।২৪, ২৫)।

বেদ বলিয়াছেন—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি (কঠোপনিষদ্ ৫।১৫)

ব্রহ্ম যেখানে অবস্থান করেন, সেখানে সূর্য্য আলোক প্রদান করেন না।"

গীতা বলিয়াছেন···

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যঃ (গীতা ১৫.৬)

ঈশ্বরের ধাম সূর্য্য দ্বারা আলোকিত নহে।

বেদ বলিয়াছেন,

অয়ং পুরুষঃ অন্তঃ হৃদয়ে সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ

—বৃহদারণ্যক ৫।৬।১

ঈশ্বর হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করেন, তিনি সকলের প্রভু, সকলের অধিপতি।

গীতা বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮৬১

ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করেন, এবং মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।

বেদ বলিয়াছেন—

ঊর্দ্ধমূলঃ অবাক্‌শাখঃ এষঃ অশ্বত্থ সনাতনঃ

(কঠোপনিষদ্ ৬।১)

"ব্রহ্মের মূল ঊর্দ্ধে এবং শাখা নিম্নে। ইনি সনাতন অশ্বত্থবৃক্ষ।"

গীতা সংসার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ঊর্দ্ধমূল মধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং। গীতা (১৫।১)

প্রায় একই কথা। (সংসার ব্রহ্মেরই অংশ, এজন্য বেদ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, গীতা সংসার সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছেন)।

বেদ বলিয়াছেন,—

যৎ ইচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি

তৎ তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওম্ ইতি এতৎ

(কঠোপনিষদ্ ২।১৫)

যাঁহাকে পাইবার জন্য সাধকগণ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করেন, আমি সংক্ষেপে তাঁহার কথা তোমাকে বলিব,—তিনি ওম্।

গীতা বলিয়াছেন—

যৎ ইচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি

তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে (৮।১১)

প্রায় অবিকল এককথা।

বেদ বলিয়াছেন, আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, দেহ হত হইলে আত্মা হত হয় না।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেৎ মন্যতে হতম্।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥"

কঠোপনিষদ্ ২।১৮,১৯

উপনিষদের এই দুইটি শ্লোকের সহিত গীতার নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোকের অত্যন্ত সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে :—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

—গীতা ২।২০

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ —গীতা ২।১৯

বেদ ব্রহ্মকে বলিয়াছেন, "অণোরণীয়ান্" (কঠ ২।২০) অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। গীতাও বলিয়াছেন, "অণোরণীয়াংসং" (গীতা ৮।৯)

গীতায় ঈশ্বরের অবতারের কথা আছে বলিয়া কেহ কেহ বলেন যে, গীতা বেদবিরোধী। যদি বেদে এরূপ কথা থাকিত যে, ঈশ্বরের অবতার হইতে পারে না, তাহা হইলে অবশ্য ইহা বলা যাইত যে, গীতা বেদবিরোধী। কিন্তু বেদে কোথাও বলা হয় নাই যে, ঈশ্বরের অবতার হইতে পারে না। বেদ বলিয়াছেন,

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃপতিরেক আসীৎ—ঋগ্বেদ ১০।১২১।১

অর্থাৎ সকল প্রাণীর প্রভু পরমেশ্বর হিরণ্ময় অণ্ডের গর্ভরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং এখানে ঈশ্বরের দেহধারণ করিবার কথা আছে। বস্তুতঃ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা ঈশ্বরের রজোগুণের অবতার। সেইরূপ বিষ্ণু ঈশ্বরের সত্ত্বগুণের অবতার, রুদ্র তমোগুণের। বিষ্ণু এবং রুদ্র উভয়ের কথাই বেদে আছে (ঋগ্বেদ ১।১৫৪ এবং ১।১১৪)। অতএব ঈশ্বরের তিনটি গুণাবতারের কথাই বেদে আছে। সুতরাং অবতারতত্ত্ব বেদে বীজ আকারে আছে, গীতায় তাহা পল্লবিত হইয়াছে।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে পাদটীকায় আমরা সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মত উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্মে যজ্ঞে পশুবধ নিষিদ্ধ হইয়াছে॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম্মকে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোথাও বলেন নাই যে, যজ্ঞে পশুবধ করা অন্যায়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ১৭।১১ শ্লোকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে সম্পাদিত যজ্ঞকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন এবং ১৭।১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যে যজ্ঞে শাস্ত্রবিধি পালন করা হয় না, তাহা তামসিক। বেদ যখন কোনও কোনও যজ্ঞে পশুবধ করিবার বিধান আছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, পশুবধ করিয়া ঐ সকল যজ্ঞ করাই শাস্ত্রবিহিত, অতএব শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা প্রশংসিত। মহাভারতে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন লইয়া যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সেই যজ্ঞে বিধিপূর্ব্বক অশ্বচ্ছেদন করিয়া আহুতি দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং

শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে যজ্ঞে পশুবধ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, ইহা ভাণ্ডারকরের কল্পনা মাত্র।

ভাণ্ডারকর ইহাও বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্মে যজ্ঞকে নিস্ফল বলা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, গীতা বলিয়াছেন যে, সকামভাবে যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ করা যায় এবং নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। বেদেও সেই কথাই আছে। ভাণ্ডারকরের অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া বোধ হয় যে, গীতা বলিয়াছেন যে, সকামভাবে যজ্ঞ করিলে ঈশ্বর লাভ করা যায় না। কিন্তু বেদেও ইহা কোথাও বলা হয় নাই যে, সকামভাবে যজ্ঞ করিলে ঈশ্বর লাভ করা যায়। সুতরাং এ বিষয়েও বেদ ও গীতার সহিত কোনও বিরোধ নাই

আমরা দেখাইয়াছি যে, গীতার কোনও অংশে বেদবিরোধী বাক্য নাই, গীতা কোথাও বলেন নাই যে, বেদ মিথ্যা। গীতার মতে, সকল বেদই ঈশ্বরলাভের কথাই বলিয়াছেন, বেদপাঠ এবং বেদের অর্থ-আলোচনারূপ যজ্ঞ দ্বারা ঈশ্বর লাভ করা যায়। বেদের প্রশংসাসূচক বহু বাক্য গীতায় সন্নিবদ্ধ আছে, বেদের নিন্দা কোথাও নাই, বেদ-বিহিত যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ করিব কেবল এই বুদ্ধির নিন্দা আছে। বেদের অনেক শ্লোক গীতায় অবিকল অথবা সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই সকল কথা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, শঙ্কর যে বলিয়াছেন, গীতা হইতেছে সকল বেদের সারসংগ্রহ, তাহা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে, এবং আধুনিক পাশ্চাত্য মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ যে বেদ ও গীতার মধ্যে বিরোধ কল্পনা করেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে অমূলক।

গীতা ও মনুসংহিতা

মনুসংহিতাতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং আচার সম্বন্ধে বহু বিস্তারিত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার মধ্যে এই সকল বিষয় অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এজন্য এরূপ কথা আজকাল শোনা যায় যে, গীতাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিলে যে মনুসংহিতা এবং অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থকেও প্রামাণিক বলিতে হইবে, এরূপ কোন প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ ইহাও বলেন যে,

গীতা ও মনুসংহিতার মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে। আমরা এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি ভাবে করিতে হইবে, ইহাই গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, ইহার বিস্তারিত উল্লেখ গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। স্মৃতিশাস্ত্র-গ্রন্থেই ইহার বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়। গীতা দার্শনিক ধর্ম্মগ্রন্থ। গীতায় এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, ভাল কাযও মন্দভাবে করা যায়, তাহাতে ভাল কায হইতে সম্পূর্ণভাবে সুফল পাওয়া যায় না, ভাল কায ভাল ভাবে করিতে হইবে। সেই ভাল ভাব কি, গীতায় তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহা এই যে,—কর্ম্মের ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না, কর্ম্মে আসক্তি থাকিবে না, আমি কর্ত্তা, এই বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, "প্রকৃতি আমাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেছে" এই বুদ্ধিতে কর্ম্ম করা, সকল কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করা,—এই সকল হইতেছে ভাল ভাবে কর্ম্ম করার লক্ষণ। কিন্তু এই ভাবে যে কোনও কায করিলেই হইবে না। ভাল কাযই করিতে হইবে।

ভাল কর্ম্ম কি, এ বিষয়ে গীতার উপদেশ এই যে, যে কর্ম্ম শাস্ত্র-বিহিত, তাহাই করা উচিত; তাহাই ভাল কায; যে কর্ম্ম শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, তাহা মন্দ কায, তাহা করা উচিত নহে।

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।

গীতা ১৬।২৪

"কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার জন্য শাস্ত্রই প্রমাণ।" শাস্ত্র শব্দের অর্থ শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ (উপনিষদ বেদের অন্তর্গত)। স্মৃতি অর্থাৎ বেদমূলক ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ,—পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক-সংহিতা প্রভৃতি। গীতা ১৬।২৪ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর শাস্ত্র শব্দের অর্থ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোক (১৭।১) এর ভাষ্যে 'শাস্ত্রবিধান' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রচোদনা' অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতির আজ্ঞা। রামানুজ ১৬।২৪ শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন, শাস্ত্র শব্দের অর্থ "ধর্ম্মশাস্ত্রপুরাণোপবৃংহিতাঃ বেদাঃ" অর্থাৎ বেদ,—যাহার অর্থ ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রামানুজের এই ব্যাখ্যা নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ—

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ।

"রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ সকলের সাহায্যে বেদের অর্থ দৃঢ়ভাবে বুঝিতে হইবে।" এরূপ বলিবার কারণ এই যে, বেদের অর্থ অতিশয় দুরূহ এবং নিগূঢ়। (ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৭১।৪-৫ শ্লোকেও এ কথা বলা হইয়াছে।)

ঋষিগণ সুগভীর সাধনার দ্বারা বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে সেই অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মনুসংহিতা শাস্ত্রের অন্তর্গত এবং মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। অতএব গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে শাস্ত্রকে প্রামাণিক বলিয়াছেন, মনুসংহিতা তাহার অন্তর্গত। মনুসংহিতা যে মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে ভারতবর্ষ এবং বিদেশের সকল পণ্ডিত একমত। মনুসংহিতার বহু শ্লোক মহাভারতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহাভারতে ইহাও স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যে, মনুসংহিতার উক্তি সকল প্রামাণিক ;—

পুরাণাঃ মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥

"পুরাণ সকল, মনুসংহিতা, বেদ-বেদাঙ্গ ও চিকিৎসাশাস্ত্র ঈশ্বরের আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব যুক্তির দ্বারা ইহাদিগকে আঘাত করা উচিত নহে।"

কুল্লুকভট্ট তৎপ্রণীত মনুসংহিতার টীকার অনুক্রমণিকায় এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। মনুসংহিতার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে স্বয়ং বেদ এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজম্।

অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, সকলই ঔষধের ন্যায় হিতকারী। বেদে চারি স্থানে এই উক্তি পাওয়া যায়, যথা কাঠকসংহিতা ১১।৫, মৈত্রায়ণীসংহিতা ১।১।৫, তৈত্তিরীয়সংহিতা ২।২।১০।২ এবং তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ২৩।১৬।৭ ; মনুর বিধান সকল যে বেদানুযায়ী, ইহা মনুসংহিতায় স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে ঃ—

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে—মনু ২।৭ ॥

"মনু যে ব্যক্তির জন্য যে কর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকলই বেদে উক্ত হইয়াছে।"

ভারতবর্ষের কোনও বৈদিক পণ্ডিত মনুসংহিতার এই উক্তির প্রতিবাদ করেন নাই। প্রত্যুত শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ তাঁহাদের নিজ নিজ প্রণীত

ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে মনুসংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্য উল্লেখ করিয়া স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, মনু পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সকল উক্তি অভ্রান্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। (ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য ২।১।১ এবং ৩।৪।৩৮ রামানুজ-ভাষ্য ২।১।২ এবং ৩।৪।৩৭)।

বাল্মীকির রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র মনুসংহিতা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহারা "মনুনা গীতৌ" অর্থাৎ মনুকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, এবং তাঁহাকে অবশ্যই মানিতে হইবে।

মনুসংহিতার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা দুইটি আপত্তি করেন। প্রথম—মনুসংহিতার ভাষা বৈদিক ভাষার পরবর্ত্তীকালে প্রচলিত ভাষা, এবং দ্বিতীয়—মনুসংহিতার বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথিতে কিছু অসামঞ্জস্য আছে। প্রথম আপত্তির উত্তরে ইহা বলা যায় যে, বেদ হইতে জানা যায়, মনুকর্ত্তৃক প্রচারিত কতকগুলি নিয়ম ছিল এবং বেদ সেগুলি সমর্থন করেন। এই নিয়মগুলি যে পণ্ডিতগণ সযত্নে রক্ষা করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। প্রথমে নিয়মগুলি মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল, পরে যখন গ্রন্থাকারে লিখিত হয়, তখন তৎকাল-প্রচলিত ভাষায় লিখিত হয়।* অতএব মনুসংহিতার ভাষা অর্ব্বাচীন বলিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মনু যে নিয়মগুলি প্রচার করিয়া ছিলেন এবং বেদ যাহা সমর্থন করিয়াছিলেন, সে নিয়মগুলি মনুসংহিতার মধ্যে পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, বাল্মীকি, ব্যাস, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি বৈদিক পণ্ডিতগণের মত এই যে, মনুপ্রণীত নিয়মগুলিই মনুসংহিতার মধ্যে বিদ্যমান আছে। দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে ইহা বলা যায় যে, লিপিকরের প্রমাদে অথবা গ্রন্থের অংশবিশেষ ছিন্ন বা নষ্ট হইলে বিভিন্ন হস্তলিখিত গ্রন্থের মধ্যে কিছু পার্থক্য হইতে পারে। কিন্তু সকল গ্রন্থের মধ্যে যে অংশ সাধারণ, তাহার তুলনায় যে অংশে প্রভেদ আছে, তাহা নগণ্য মাত্র। এই নগণ্য প্রভেদ হেতু যে অংশ সকল গ্রন্থেই দেখা যায়, সে অংশের প্রামাণিকতা নিরস্ত হয় না।

যাঁহারা বলেন যে, গীতা ও মনুসংহিতার মধ্যে বিরোধ আছে, তাঁহারা বলেন যে, মনু জন্ম অনুসারে বর্ণনির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু গীতার মতে গুণ ও কর্ম্ম

* মনুসংহিতা যে খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, মনুসংহিতার একটি শ্লোক যাস্কপ্রণীত নিরুক্তে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং নিরুক্ত খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

অনুসারে বর্ণনির্দ্দেশ করা উচিত। কিন্তু এই উক্তি যথার্থ নহে। জন্ম অনুসারে বর্ণনির্দ্দেশ করা যে মনুর অভিপ্রেত, তাহাতে অবশ্য কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, মনু ১০।৫ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, পিতা ও মাতা যদি সমান বর্ণের হয়, তাহা হইলে পুত্রেরও সেই বর্ণ হয়। একটু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, জন্ম অনুসারে বর্ণনির্দ্দেশও গীতার অভিপ্রায়। যে মহাভারতের মধ্যে গীতা অন্তর্ভুক্ত, তাহার কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ন্যায়, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণই ছিলেন। কারণ, ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হইয়াছিল। অশ্বত্থামার গুণ ও কর্ম্ম কিছুই ব্রাহ্মণের ন্যায় ছিল না, তথাপি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ (যদিও অধম ব্রাহ্মণ) বলা হইয়াছিল ; কারণ তাঁহার জন্ম ব্রাহ্মণ-বংশে। যুধিষ্ঠির ও ভীমের গুণের মধ্যে কত পার্থক্য ! তথাপি উভয়েই ক্ষত্রিয়। কারণ, ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম। বাস্তবিকপক্ষে গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা বর্ণনির্ণয় করা সম্ভব নয়। এক ব্যক্তির গুণ ব্রাহ্মণোচিত, কিন্তু কর্ম্ম ক্ষত্রিয়োচিত হইতে পারে। একই ব্যক্তির গুণ কিরূপ, সে বিষয়ে মতভেদ হইবে, বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত গুণনির্ণয় করা অতি দুরূহ। সুতরাং গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা বর্ণনির্ণয় করা সম্ভব নহে।

গীতাতেও গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বর্ণনির্ণয় করিতে বলা হয় নাই, জন্ম অনুসারেই বর্ণনির্দ্দেশ হইবে, ইহাই গীতার মত। প্রথমতঃ গীতা ১৬।২৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। আমরা দেখিয়াছি যে, মনুসংহিতা একটি প্রামাণিক শাস্ত্র-গ্রন্থ, উহা গীতার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এবং মনুসংহিতাতে জন্ম অনুসারে বর্ণনির্ণয় করা হইয়াছে। গীতা মনুসংহিতাকে প্রামাণিক বলিয়া যদি জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্দ্দেশ না করিয়া গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বর্ণনির্দ্দেশ করিতেন, তাহা হইলে গীতার মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতারূপ দোষ উৎপন্ন হইত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, অর্জ্জুন যদি যুদ্ধ না করে, তাহা হইলে অর্জ্জুনের পাপ হইবে। জন্ম অনুসারে বর্ণনির্দ্দেশ করিলেই এই কথা সঙ্গত হয়, অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার বর্ণ ক্ষত্রিয়, অতএব যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে তাঁহার পাপ হইবে। গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জুনের বর্ণনির্দ্দেশ করিলে এ কথা বলা যায় না। কারণ, অর্জ্জুনের শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত গুণ যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল। সুতরাং তিনি যদি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেন, তাঁহার গুণ ও কর্ম্ম উভয়ই ব্রাহ্মণোচিত হইত (ভিক্ষা ব্রাহ্মণের বৃত্তি), তিনি ক্ষত্রিয় হইতে

ব্রাহ্মণ-বর্ণে উন্নীত হইতেন, তাঁহার পাপ হইবে কেন? গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণের কর্ত্তব্য কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার পর যে বর্ণের যে কর্ম্ম বিহিত, তাহাকে "সহজ কর্ম্ম" বলিয়াছেন (১৮।৪৮)। সহজ কর্ম্ম অর্থাৎ জন্মের সহিত যে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ জন্মের দ্বারা কর্ম্ম (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) নির্দ্দেশ করিতে হইবে। জন্মের দ্বারা বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইলে এবং বর্ণের দ্বারা কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইলেই জন্মের দ্বারা কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একটা বড় কথা এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির এমন একটা জীবিকা নির্দ্দেশ করিতে হইবে, যাহা গ্রহণ করা তাহা কর্ত্তব্য, যাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিলে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে। জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্দ্দেশ করিলে এরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়। কর্ম্ম দ্বারা বর্ণনির্দ্দেশ করিলে ইহা বলা যায় না যে, কোন্ ব্যক্তির কোন্ জীবিকা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য, কোনও ব্যক্তির অপর বর্ণের জীবিকা গ্রহণ করা নিন্দনীয় হইলেও, তাহাতে তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তন হয় না।

আপত্তি হইতে পারে যে, গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (৪।১৩) ইহার কি অর্থ এরূপ নহে যে, গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বর্ণনির্দ্দেশ করিতে হইবে? না, এই বাক্যের অর্থ অন্যরূপ। সে অর্থ গীতাতেই ভগবান স্বয়ং বুঝাইয়া দিয়াছেন। "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" এই সমাসযুক্ত পদটি ১৮।৪১ শ্লোকে ভগবান এইরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন :—গুণৈঃ কর্ম্মাণি বিভক্তানি। সে গুণ কি? স্বভাব-প্রভাব গুণ অর্থাৎ জন্মের সময় যে সকল গুণ বিদ্যমান থাকে। জন্মের সময় কোন্ শিশুর কি গুণ আছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু গীতার ১৩।২১ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন,—

কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু।

কোনও জীব সৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, কোনও জীব অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, বিভিন্ন গুণের প্রতি আসক্তিই ইহার কারণ। বেদে ভগবান বলিয়াছেন—

রমণীয়চরণাঃ রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যন্তে
ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিম্ বা,
কপূয়চরণাঃ কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যন্তে
শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা॥

(ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।১০।৭)

"যাহাদের আচরণ উত্তম, তাহারা উত্তম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, ব্রাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয়যোনি, বা বৈশ্যযোনি। যাহাদের মন্দ আচরণ, তাহারা মন্দ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, যথা কুকুরযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি।" এই বেদ-বাক্যের সহিত গীতার ১৩৷২১ শ্লোক মিলাইয়া পড়িলেই বুঝা যাইবে যে, ১৩৷২১ শ্লোকে যাহাকে সদ্‌যোনি বলা হইয়াছে, তাহা উচ্চবর্ণের যোনি, পূর্ব্বজন্মে উত্তম কর্ম্ম করিলে উত্তম গুণের আবির্ভাব হয়, জন্মের সময় উত্তম গুণ প্রবল থাকে, সেই সকল "স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ" কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয়,—"কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি"। ইহাই সহজ কর্ম্ম। অতএব জন্ম অনুসারে বর্ণনির্দ্দেশ করা গীতার উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতা অনুসারে মনুসংহিতা প্রামাণিক গ্রন্থ। গীতার সহিত মনুসংহিতার কোনও বিরোধ নাই। বাস্তবিক পক্ষে বেদ, মনুসংহিতা, গীতা এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ সকল পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরস্পরাপেক্ষী গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থের উপরই হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু এই সকল গ্রন্থের কোনও অংশ অস্বীকার করিতে পারেন না। যিনি সকল গ্রন্থের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন না, তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই।

গীতা ও চণ্ডী

গীতা ও চণ্ডীতে অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয়ই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। উভয়ই অপর বৃহত্তর গ্রন্থের অন্তর্গত—গীতা মহাভারতের অন্তর্গত, চণ্ডী মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অন্তর্গত। উভয়েই শ্লোকসংখ্যা ৭০০। গীতায় মোহগ্রস্ত অর্জ্জুনকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে। চণ্ডীতে মোহগ্রস্ত সুরথ ও সমাধিকে জ্ঞান প্রদান করা হইয়াছে। আবার উভয়ের মধ্যে প্রভেদও আছে। গীতার শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ক্রিয়। তাঁহার প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুন ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রধারণ করেন নাই। কিন্তু চণ্ডীতে দুর্গা স্বহস্তে অসুর সংহার করিয়াছেন। অথচ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ এবং যোদ্ধা, তাঁহারই যুদ্ধ করিবার কথা। দুর্গা রমণী,—তাঁহার যুদ্ধ করা স্বাভাবিক নহে। এই

প্রভেদের কারণ এই যে কৃষ্ণই পরব্রহ্ম ; দুর্গা ব্রহ্মের শক্তি। ব্রহ্ম স্বয়ং নির্ব্বিকার—নিষ্ক্রিয় ;ব্রহ্মের শক্তি মায়া বা প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করেন। তাই কৃষ্ণ নিষ্ক্রিয় এবং দুর্গা অসুর-ধ্বংসকারিণী।

অর্জ্জুনের যুদ্ধ করা উচিত, কিন্তু তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। সুরথ ও সমাধির বৈরাগ্য হওয়াই উচিত, কিন্তু রাজ্য ও আত্মীয়স্বজনের চিন্তায় তাঁহারা চঞ্চল হইয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই অজ্ঞান। অজ্ঞানের ফলে মানবের চিত্তে রাগ ও দ্বেষের উদয় হয়। যাহা ভাল লাগে, তাহার জন্য রাগ বা আসক্তি হয়, যাহা ভাল লাগে না, তাহার প্রতি দ্বেষ হয়। রাজ্য এবং আত্মীয়স্বজন ভাল লাগে, এজন্য সুরথ ও সমাধির এই সকলের প্রতি আসক্তি হইয়াছে। আত্মীয়স্বজন বধ করিতে ভাল লাগে না, এ জন্য যুদ্ধের প্রতি অর্জ্জুনের দ্বেষ হইয়াছে। প্রকৃত বৈরাগ্য অর্জ্জুনের হয় নাই। প্রকৃত বৈরাগ্য হইলে অর্জ্জুনের চিত্তে আত্মীয়স্বজনের প্রতি আসক্তি থাকিত না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যখন তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া ঈশ্বর স্বয়ং নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন সে কর্ত্তব্য হইতে অর্জ্জুনের চিত্ত বিচলিত হইত না। গীতা এবং চণ্ডী উভয় গ্রন্থেই দেখা যায় যে যাঁহাদের চিত্তে জ্ঞানের আলোক প্রকাশিত হইবে, তাঁহারা সকলেই দুঃখিত, আত্মীয়স্বজন বধ করিতে হইবে বলিয়া অর্জ্জুন দুঃখিত; রাজ্য নষ্ট হইয়াছে বলিয়া সুরথ দুঃখিত, ধন অপহৃত হইয়াছে বলিয়া সমাধি দুঃখিত। দুঃখ অহঙ্কার খর্ব্ব করিয়া চিত্তকে কোমল এবং সরস করে। এইরূপ চিত্তে জ্ঞানের বীজ বপন করা হইলে সে বীজ হইতে সহজে অঙ্কুর উদ্গত হয় এবং উহা শীঘ্র বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া পত্র-পুষ্পে বিকশিত হয়। এই জন্যই যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন—যে গৃহে আনন্দ উৎসব হইতেছে, সে গৃহে যাইও না, যে গৃহে দুঃখ ও শোক, সে গৃহে যাইও।

গীতার ক্ষেত্র চণ্ডীর ক্ষেত্র অপেক্ষা ব্যাপকতর। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে কি কর্ত্তব্য, গীতায় তাহার নির্দ্দেশ পাওরা যাইবে, চণ্ডীতে কেবল সাধনার পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক কর্ম্ম কি ভাবে সম্পাদন করিলে কর্ম্ম বন্ধনজনক না হইয়া চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়, গীতায় সে কৌশল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ আমাদের শত্রু, আমরা তাহাদিগকে সংহার করিতে চেষ্টা করিব,—ইহাই গীতার উপদেশ। চণ্ডীতে শত্রুগণকে জগজ্জননী স্বয়ং সংহার করিতেছেন, আমরা করিতেছি না। অবশ্য গীতাতে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বরের প্রসাদে আমরা সকল বাধা অতিক্রম করিতে পারিব ("মচ্চিত্তঃ

সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি"—আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিলে আমার কৃপায় সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে),—কিন্তু আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে, শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, শত্রুবধ করিতে হইবে ("জহি শত্রুং মহাবাহো," —হে মহাবাহু, তুমি শত্রুকে বধ কর)। আমরা শত্রুদিগকে বধ করি এবং ঐশী শক্তি সংহার করেন,—তত্ত্বহিসাবে উভয়ের মধ্যে যে কোনও ভেদ নাই, তাহাও গীতাতে উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥"

ঈশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং মায়া-শক্তির দ্বারা সকল প্রাণীকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রমণ করান। এ জন্যই—

"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥"

তত্ত্বজ্ঞানী যখন দর্শন করে, শ্রবণ করে, স্পর্শ করে, ঘ্রাণ করে, ভোজন করে, গমন করে, নিদ্রা যায় অথবা নিশ্বাস ফেলে,—সর্ব্বদাই মনে করে, আমি কিছু করিতেছি না—ইন্দ্রিয়গণ এই সকল কার্য্য করিতেছে,—"আমি" অর্থাৎ আমার আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন,—আত্মা কিছু করে না। আমাদের মনে হয় যে, আমরা কর্ম্ম করিতেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরই আমাদিগকে কর্ম্ম করাইতেছেন। ইহা গীতার নিগূঢ় তত্ত্ব। গীতায় যাহা নিগূঢ় তত্ত্ব, চণ্ডীতে তাহাই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। তাই চণ্ডীতে দেখিতে পাই যে, ঈশ্বরের শক্তি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে অসুর সংহার করিতেছেন; ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা পৃথিবীর সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতেছে। স্তব পূজা প্রভৃতির দ্বারা এই শক্তিকে প্রসন্ন করিলে সকল বিঘ্ন দূর হয়, সকল কামনা পূর্ণ হয়।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥"

যে সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক ভাব জীবগণের মধ্যে দেখা যায়, সে সকলই ভগবান্ হইতেই আবির্ভূত হয়।

এই সূত্রের বিস্তার করিয়া চণ্ডীর উত্তমচরিত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, দুর্গাদেবীই সকল প্রাণীর মধ্যে চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা প্রভৃতি বিবিধ ভাবে অবস্থান করেন।

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥"

নরকের দ্বার এবং আত্মার বিনাশক তিনটি বস্তু,—কাম, ক্রোধ এবং লোভ; অতএব এই তিনটি ত্যাগ করিবে। সকল অনিষ্টের মূল কাম। সংসারে বিবিধ আপাতমনোহর বস্তুর প্রতি আমাদের আসক্তি হয়; ঐ সকল দ্রব্য পাইবার জন্য আমরা ব্যস্ত হই, কেহ তাহাতে বাধা দিলে ক্রোধ হয়; পরের দ্রব্যের জন্যও লোভ হয়। সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে কাম, ক্রোধ এবং লোভকে বিনষ্ট করিতে হয়। চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে মধুকৈটভবধ বর্ণিত হইয়াছে। মধুকৈটভ লোভের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। মধ্যমচরিত্রে মহিষাসুরবধ বর্ণিত হইয়াছে। মহিষাসুর ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি। উত্তমচরিত্রে শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ বর্ণিত হইয়াছে। শুম্ভ-নিশুম্ভ কামের মূর্ত্তি। কাম বিনষ্ট করা সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। কাম বিনাশ করিতে পারিলে সাধনপথের শেষ অন্তরায় দূরীভূত হয়।

সকল হিন্দুশাস্ত্রের মূল বেদে পাওয়া যায়। চণ্ডীর মূলও বেদে পাওয়া যায়। উহার নাম দেবীসূক্ত। অম্ভৃণ মহর্ষির দুহিতা বাক্ নামক ব্রহ্মবিদুষী নারী এই সূক্তের ঋষি। ইনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, ইনিই রুদ্র, বসু, আদিত্য, বিশ্বদেব প্রভৃতি দেবগণের রূপ ধারণ করিয়াছেন; যজ্ঞকারীকে তিনিই ধন প্রদান করিতেছেন; তিনিই জগতের ঈশ্বরী; তাঁহার শক্তিতেই প্রাণিগণ ভোজন, দর্শন প্রভৃতি সকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে; তিনিই শক্তি সঞ্চার করিয়া রুদ্রের ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া ত্রিপুরাসুরের বিনাশ করাইয়াছেন; তিনিই প্রলয়ান্তে জগৎসৃষ্টির ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন। এইভাবে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্না নারী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বিশ্বময় যে শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহা তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত।

গীতার মূলও যে বেদে নিহিত, তাহা বলাই বাহুল্য। গীতার স্থলে স্থলে উপনিষদের শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে এই জন্য গীতামাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥"

উপনিষদরূপ গাভী হইতে, শ্রীকৃষ্ণ গীতারূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছেন। গোবৎসের ন্যায় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়াই দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে। কিন্তু যাবতীয় জ্ঞানী ব্যক্তিগণ গীতার অমূল্য উপদেশরূপ দুগ্ধপানে তৃপ্ত হইয়া থাকেন। (মাসিক বসুমতী—আশ্বিন ১৩৪১)

পরলোক-সংবাদ

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে জীবের মৃত্যুর পর মোটামুটি দুই রকম গতি হইয়া থাকে। এক পুনর্জ্জন্ম, দুই মোক্ষ। সংসারের অধিকাংশ জীবের হৃদয়ে অহরহ সহস্র প্রকার বাসনার উদয় হয়। কতকগুলি বাসনা জীবিতকালেই পূরণ হয়, কতকগুলি হয় না তাহা ছাড়া জীব নানারূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে—কতক ভাল, কতক মন্দ; কতকগুলি কর্ম্মে পরের উপকার হয়, কতকগুলি কর্ম্মে পরের অনিষ্ট হয়। এই সকল বাসনা এবং কর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য জীবকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আবার সংসারে এরূপ লোক আছেন,—তাঁহাদের সংখ্যা অবশ্য অল্প,—যাঁহাদের সাংসারিক সুখভোগের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে সংসারে আসিলে কতকগুলি দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে,—যেমন জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে সংসারের জীব সুখ অপেক্ষা দুঃখই বেশী ভোগ করে,—তাহার কারণ জীব ভাল অপেক্ষা মন্দ কার্য্যই বেশী করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা অসৎকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন। যে সকল গ্রন্থে ভগবানের কথা আছে তাঁহারা সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করেন, সর্ব্বদা ভগবানের রূপ ও গুণ চিন্তা করেন, এবং মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিয়া রাখেন, যেমন করিয়াই হউক ভগবানকে লাভ করিতেই হইবে। এই সকল ব্যক্তিকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ইঁহারা মৃত্যুর পর ভগবানের নিত্যধামে গমন করেন,—সেখানে গিয়া ইঁহারা ভগবানকে লাভ করিয়া চিরকাল অনন্তসুখ পাইয়া থাকেন। হিন্দুর পরলোক সম্বন্ধে ইহাই স্থূল কথা ইহা ছাড়া সূক্ষ্ম কথা অনেক আছে। দুইটি জন্মের মধ্যে জীব কি অবস্থায় থাকে, স্বর্গ ও নরক কি, মৃত্যুর পর কোন্ পথে যাইলে

জীবকে সংসারে আর ফিরিতে হয় না, কোন পথে যাইলে আবার ফিরিতে হয়, প্রলয় কাহাকে বলে, সে সময় জীব কিরূপ অবস্থায় থাকে ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় হিন্দুর পরলোক সম্বন্ধে স্থূল সূক্ষ্ম উভয় রকম কথাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

দেহ হইতে স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে পরলোক সম্ভব হয় না। এজন্য গীতার প্রারম্ভেই ভগবান পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে দেহ এবং আত্মা দুইটি বিভিন্ন বস্তু, জন্ম এবং মৃত্যুর সময় দেহেরই আবির্ভাব এবং তিরোভাব হয়, আত্মা জন্মের পূর্ব্বেও থাকে, মৃত্যুর পরও থাকে।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়ং অতঃপরম্ ॥২।১২

"আমি, তুমি বা এই সকল নৃপতিগণ যে (জন্মের পূর্ব্বে) ছিলেন না, এরূপ নহে। পরে (মৃত্যুর পরে) আমরা সকলে যে থাকিব না এরূপও নহে।"

আমি এবং আমার দেহ যে এক বস্তু হইতে পারে না একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা ভগবান সেকথা সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥২।১৩

"এই দেহেই দেহীর যেরূপ কৌমার, যৌবন ও জরা হয়, সেইরূপ দেহীর দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়। বিজ্ঞজন তাহাতে অভিভূত হন না।"

একই মানুষের শৈশবের ছবি দেখুন, এবং তাহারই বার্দ্ধক্যের ছবি দেখুন। দেহ দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু উভয়ের আত্মা এক। শৈশবে যে ব্যক্তি নিজেকে আমি বলিত, বার্দ্ধক্যে সেই ব্যক্তিই ত নিজেকে আমি বলিতেছে। অতএব দেহ ছাড়া এমন একটা জিনিষ আছে শৈশবে এবং বার্দ্ধক্যে যে জিনিষ একই থাকে। শিশু এবং বৃদ্ধ অবস্থায় বিভিন্ন দেহের মধ্যে যে এক বস্তু বিদ্যমান থাকে, মৃত্যুর পর দেহ বিনষ্ট হইলেও সেই বস্তু অপর দেহের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, ইহা কল্পনা করা কঠিন নহে। দেহ এবং পরিচ্ছদের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, আত্মা এবং দেহের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ। অমুক লোকটির কথা ভাবিলেই আমাদের মনে একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোক, অথবা হ্যাটকোট-ধারী লোকের ছবি আবির্ভূত হয়। কিন্তু ধুতি পাঞ্জাবী অথবা হ্যাটকোট সেই লোকটির কোন অংশ নহে। সেইরূপ একটি লোকের বিষয় ভাবিলে আমরা যদিও একটি শীর্ণ শরীর বা স্থূলকায়ের বিষয় চিন্তা করি, তথাপি সেই শীর্ণ

অথবা স্থুল শরীর সেই লোকটির স্বরূপ নহে, বাহিরের আবরণ মাত্র। একটি আবরণ ত্যাগ করিয়া অপর একটি আবরণ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২।২২

"মানুষ যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করে।"

সাধারণতঃ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পুনর্জন্ম হয় না। মধ্যে কিছু কাল ব্যবধান থাকে সেই সময় কর্ম্ম অনুসারে জীব স্বর্গ বা নরকে বাস করে। যাহারা শাস্ত্রবিহিত পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছে তাহারা স্বর্গে বাস করে, যাহারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপ করিয়াছে তাহারা নরকে বাস করে। এই স্বর্গ বা নরকে বাস করিয়া কতকগুলি কর্ম্মের ক্ষয় হয়। স্বর্গ ও নরক ভোগের পর যে কর্ম্মগুলি অবশিষ্ট থাকে, সেই কর্ম্ম অনুসারে জীব উত্তম বা অধম যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। স্বর্গবাস যদিও সুখকর, তথাপি ইহা পরিমিতকাল স্থায়ী বলিয়া এবং ইহার পরে পুনরায় সংসারে আসিয়া অনিবার্য্য দুঃখভোগ করিতে হয় বলিয়া ইহা শ্রেষ্ঠ গতি নহে।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্য মাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকং
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥৯।২০

যাহারা বেদ পাঠ করিয়া বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ প্রার্থনা করে, তাহারা ইন্দ্রলোকে গিয়া উৎকৃষ্ট দেবভোগ প্রাপ্ত হয়।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥৯।২১

বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর যখন তাহাদের পুণ্য ফুরাইয়া আসে তখন তাহারা মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। এই প্রকারে বেদোক্ত সকল্প কর্ম্ম দ্বারা বারবার সংসারে যাতায়াত করিতে হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পৃথিবী, স্বর্গ এমন কি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকলই বিনাশশীল। মোক্ষ লাভ করিলে জীব এই সকল বিনাশশীল স্থান ছাড়াইয়া এমন স্থানে উপস্থিত হয় যাহার কখনও বিনাশ হয় না; সৃষ্টি এবং প্রলয় যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রুতি এই স্থানকে "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং" (বিষ্ণুর সেই শ্রেষ্ঠ স্থান) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গীতায় ভগবান ইহাকে তাঁহার "পরম ধাম" বলিয়াছেন।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্ত স্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।৮।২১

উৎপত্তি ও বিনাশশীল জীবকুলের অতীত যে অব্যক্ত ভাব, তাহাকে অক্ষর বলা হয়। ইহাকেই ঋষিগণ শ্রেষ্ঠ গতি বলেন। এই ভাব প্রাপ্ত হইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। ইহা আমার পরম ধাম।

এই স্থানের একটু বিবরণ আমরা নিম্নের শ্লোকে পাইয়া থাকি ;

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।১৫।৬

"সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নি সেই স্থান আলোকিত করে না। সেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। তাহাই আমার পরম ধাম।"

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর এরূপ প্রকৃতি যে তাহাদের উপর আলোক না পড়িলে, তাহাদিগকে দেখা যায় না। সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নির আলোক তাহাদের উপর প্রতিফলিত হইলে তাহারা প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিষ্ণুর "পরম ধাম" জড় বস্তুর দ্বারা রচিত নহে। সেখানে সকলই চিন্ময়। নিজস্ব আলোকে সকলই প্রকাশিত। বৈষ্ণবেরা এই স্থানকে মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বলিয়া থাকেন।

মুক্তপুরুষেরা বিষ্ণুর পরম ধাম বা বৈকুণ্ঠে গিয়া শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবানকে পাইবার কথা গীতায় বারম্বার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার লীলার কথা আলোচনা করিলে, দিবা-নিশি তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক ডাকিলে, সকল কর্ম্ম তাঁহার উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করিলে, তাঁহাকে পূজা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।৪।৯

আমার অলৌকিক জন্ম এবং কর্ম্ম যে যথার্থরূপে জানে, দেহত্যাগ করিবার পর তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না, সে আমাকে প্রাপ্ত হয়।

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ।৭।২৩

যাহারা ইন্দ্রাদি দেবতার পুজা করে, তাহারা ইন্দ্রাদি দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। যাহারা আমার পূজা করে, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ।৮।৭

এই হেতু সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করিবে এবং যুদ্ধ করিও। আমাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিলে আমাকে পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ।৯।২৮

(এইরূপে সকল কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিলে) কর্ম্মের শুভ এবং অশুভ ফলরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। এবং সন্ন্যাস যোগ দ্বারা আমার সহিত সংযুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ।৯।৩৪

আমাতে মন নিবিষ্ট রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর; আমাকে প্রণাম কর। এই ভাবে আত্মাকে আমার সহিত যুক্ত করিয়া মন্নিষ্ঠ হইয়া থাকিলে আমাকে পাইবে।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ।১১।৫৪

যে ব্যক্তি অপর সকল বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আমাকেই ভক্তি করে সে আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারে, আমাকে জানিতে পারে এবং আমার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।*

মোক্ষলাভ করিলে জীবের কিরূপ অবস্থা হয়? সে কি ভগবানের সহিত এক হইয়া যায়, না, কিছু প্রভেদ থাকে? এই বিষয়ে অদ্বৈতবাদীর সহিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি অপরাপর সম্প্রদায়ের ঘোর মতভেদ দৃষ্ট হয়। শঙ্কর প্রমুখ অদ্বৈতবাদী বলেন, মোক্ষলাভ করিলে জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। রামানুজ প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী তাহা মানেন না। গীতার এ বিষয়ে মীমাংসা কি তাহা বলা দুরূহ। তবে বোধ হয় অপর

* উদ্ধৃত শ্লোকগুলি ব্যতীত ১১ অধ্যায় ৫৫ শ্লোক, ১২ অধ্যায় ৪ শ্লোক, ১৮ অধ্যায় ৫৫ ও ৬৫ শ্লোকেও ভগবানকে পাইবার কথা আছে। বাহুল্য ভয়ে সেগুলি উদ্ধৃত হইল না।

সকল প্রশ্নের গীতা যেরূপ উদার অসাম্প্রদায়িক মীমাংসা করিয়াছেন, এই প্রশ্নেরও সেইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।৪।১১

"আমাকে যাহারা যে-ভাবে উপাসনা করে, আমি তাঁহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি। হে অর্জ্জুন, মনুষ্যগণ আরাধনার যে পথই গ্রহণ করুক, তাহারা আমার ভজনমার্গই অনুসরণ করে।"

এই শ্লোক হইতে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে যাহারা অদ্বৈতবুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া নির্গুণ অব্যক্ত ব্রহ্মের ভজনা করে, তাহারা মোক্ষলাভ করিয়া নিজেদের সর্ব্বপ্রকার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিসর্জ্জন করিয়া অব্যক্ত ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। যাহারা সগুণ ঈশ্বরকে প্রভু বা স্বামী রূপে ভজনা করে, তাহারা সেইরূপেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, তাহাদের স্বতন্ত্র অহংজ্ঞান থাকে। পঞ্চম অধ্যায়ের ২৩ ও ২৪ শ্লোকে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাইবার কথা আছে বলিয়া বোধ হয়।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি।৫।২৪

যে যোগী অন্তর মধ্যে সুখ এবং আরাম প্রাপ্ত হয়, অন্তর মধ্যেই জ্যোতি দর্শন করে, সে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়।

যে সকল স্থানে ভগবানকে পাইবার কথা আছে, "মাম্ এতি" "প্রাপ্নবন্তি মামেব" "মাং এষ্যসি" এইরূপ প্রয়োগ আছে, সেখানে যে ভগবানের সহিত এক হইয়া যায় ইহা মনে হয় না। কয়েক স্থানে "মদ্ভাবমাগতাঃ" এইরূপ উল্লেখ আছে।* মুক্ত জীব "আমার ভাব" অর্থাৎ ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হয়। শ্রীধর স্বামী ইহার অর্থ করিয়াছেন "মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তাঃ" অর্থাৎ ভগবানের সহিত যুক্ত হয়। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মুক্তজীবের স্বরূপ বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, মুক্ত জীব ভগবানের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যসংকল্পত্ব, অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি সকল গুণ প্রাপ্ত

* ৪।৮; ৮।৫; ১৩।১৯

† ১১।৫৫; ১২।৮; ১৮।৫৫।

হন, (অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হন, যাহা পাইতে ইচ্ছা করেন তাহাই পান, তাঁহাদিগকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না।) কিন্তু মুক্ত জীবের সহিত ভগবানের কেবল এইটুকু প্রভেদ থাকে যে, তাঁহারা জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না। বোধ হয় মুক্ত জীবের সহিত ভগবানের এইরূপ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া গীতায় "মদ্ভাবমাগতাঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে। গীতার কয়েক স্থানে মোক্ষ লাভ করিয়া ভগবানের মধ্যে বাস করা বা তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করার কথা আছে। কিন্তু সে সকল স্থানে যে অদ্বৈত মতানুযায়ী একীভূত হওয়াকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ইহা বলা যায় না। জ্ঞান স্বরূপ ভগবান এবং তাঁহার চিন্ময় ধাম উভয়কে একরূপে ভাবিয়া এই সকল কথা বলা হইয়াছে বোধ হয়।

মৃত্যুর পর জীব যে পথ দিয়া ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়, এবং পরে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, তাহাকে দেবযান বলা হয়। অগ্নি, জ্যোতি, দিবসের দেবতা, শুক্লপক্ষের দেবতা, উত্তরায়ণের দেবতা, এই সকল দেবতা দেবযান পথে জীবকে লইয়া যান (গীতা ৮।২৪)। এই পথে গেলে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। স্বর্গ যাইবার পথের দেবতাদের নাম ধূম দেবতা, রাত্রির দেবতা, কৃষ্ণপক্ষের দেবতা, দক্ষিণায়নের দেবতা। ইহারা জীবকে স্বর্গলোক বা চন্দ্রলোকে লইয়া যান (গীতা ৮।২৫)। চন্দ্রলোকে পুণ্যের ফলে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। উপনিষদেও এই দুই পথের উল্লেখ আছে।

ভগবানের পরম ধাম ব্যতীত জগতের যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি এবং ধ্বংস হয়। ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইলে জীব সমূহ অব্যক্তে (ভগবানের প্রকৃতিতে) বিলীন হইয়া যায়, সৃষ্টির সময় পুনরায় তাহাদের উৎপত্তি হয়।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ।৮।১৮

ব্রহ্মার যখন দিবস হয় তখন সকল জীব অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হয়, আবার ব্রহ্মার যখন রাত্রি হয় তখন তাহারা অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায়।

গীতায় এ সকল কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ অন্য শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়।

পুণ্য কর্ম্ম বিভিন্ন রকমের আছে, তাহার ফলে পুণ্যবানদের গতিও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের উপাসনা করিলে স্বর্গলোকে গমন হয়। পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে পিতৃলোকে গমন হয়।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাং ॥৯।২৫

যাঁহারা দেবতাদের উপাসনা করেন তাঁহারা দেবতাদের নিকট যান, পিতৃগণের উপাসনা করিলে পিতৃগণের নিকট গমন হয়, মহাপুরুষদের উপাসনা করিলে তাঁহাদের নিকট গতি হয়, যাঁহারা আমাকে (শ্রীভগবানকে) উপাসনা করেন তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।

যাঁহারা যোগমার্গে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হন তাঁহাদের গতি বর্ণনা করিবার সময় ভগবান বলিয়াছেন,—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৬।৪১

পুণ্যবানদের লোক (স্বর্গাদিলোক) গমন করিয়া সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সদাচার সম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

যতক্ষণ না ভগবানকে লাভ করা যায় ততক্ষণ সংসারে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। স্বর্লোক, মহলোক, জন, তপঃ ও সত্যলোক ইহারা কেহই চিরস্থায়ী নহে।

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনো জনাঃ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥৮।১৬

ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবন বিনাশশীল। অতএব সেই সব লোকে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে কেবল যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয় তাহাদিগকে কখনও ফিরিয়া আসিতে হয় না।

গীতায় ভগবান পুণ্যবানের বিভিন্ন সদ্গতির যেমন উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ পাপীদের অধোগতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। ষোড়শ অধ্যায়ে দৈব এবং আসুরিক স্বভাবের বর্ণনা করিয়া, আসুরিক স্বভাব সম্পন্ন জীবদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

অনেকচিত্ত বিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ।১৬।১৬

অনেক প্রকার বস্তু পাইবার আশায় তাহাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া উঠে, তাহাদের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়, ইন্দ্রিয় সুখভোগে তাহাদের অত্যন্ত আসক্তি থাকে। এবম্বিধ পুরুষগণ অপবিত্র নরকে পতিত হয়।

নরক বাসের পর তাহারা যখন পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে তখন তাহারা ব্যাঘ্রাদিরূপে অথবা তাদৃশ ক্রূর স্বভাব-সম্পন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ।১৬।১৯

পরের অনিষ্টকারী ক্রূর স্বভাব সম্পন্ন এই সকল নরাধমকে আমি আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।

কেন জীব নরকে যায় এ সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ।১৬।২১

তিনটি প্রবৃত্তি জীবের অত্যন্ত অনিষ্টকর, এ জন্য ইহারা নরকের দ্বার স্বরূপ—ইহাদের নাম কাম, ক্রোধ এবং লোভ। ইহাদিগকে ত্যাগ করা উচিত।

গীতায় শ্রীভগবান বারবার বলিয়াছেন যে জীব ভগবানকে প্রাপ্ত না হইলে সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইবে, তাঁহাকে পাইলে আর ফিরিতে হইবে না। ইহাই মোক্ষ। এই মোক্ষ সম্বন্ধে গীতায় নিম্নলিখিত উক্তিগুলি পাওয়া যায়।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।

জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং ।২।৫১

যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে তাঁহারা কর্ম্ম ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন এবং পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্ত হইয়া সকল দুঃখ কষ্টের অতীত স্থানে গমন করেন।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ং ।১৮।৫৬

কর্ম্ম ত্যাগ না করিলেও যদি জীব ভগবানেই আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভগবানের প্রসাদে চিরকালস্থায়ী স্থান লাভ করে।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।

তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং ।১৮।৬২

হে অর্জ্জুন তুমি সকল প্রকারে ঈশ্বরের শরণ লও। তাঁহার প্রসাদে তুমি শ্রেষ্ঠ শান্তি এবং অবিনাশী স্থান লাভ করিবে।

হিন্দুধর্ম কি ?

ভাদ্রের ভারতবর্ষে "ভারতের ধর্ম সমস্যা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম-মতের সীমা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বহু তথ্য সম্বলিত একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে লোকগণনার (census) সময় কাহাকে হিন্দু বলা হইবে, কাহাকে হিন্দু বলা হইবে না, ইহা নির্দ্ধারণ করা অনেক সময় দুরূহ হয়। কারণ হিন্দুর লক্ষণ কি এ বিষয়ে সন্তোষজনক নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

হিন্দু এই শব্দ দুই বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে, হিন্দু জাতি এবং হিন্দুধর্ম। যতীন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। আমরাও তাহাই করিব। হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ কি—এ বিষয়ে যতীন্দ্রবাবু অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল মত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে কোনও নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই বলিয়া বোধ হয় যে ইঁহারা মূলের অন্বেষণ না করিয়া সম্মুখে যাহা দেখা যায় তাহাই পরীক্ষা এবং আলোচনা করিয়াছেন। আধুনিক প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মূল অন্বেষণ করিলে ধর্ম্মসমস্যার সু-মীমাংসা হইতে পারে।

আমরা যাহাকে আজকাল হিন্দুধর্ম্ম বলি প্রাচীনকালে তাহাকে সনাতন ধর্ম অথবা কেবলমাত্র ধর্ম শব্দে অভিহিত করা হইত। এই সনাতনধর্ম্মের কতকগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। এক এককজন আচার্য্য এক একটি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যথা, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য। পরবর্ত্তী যুগে হিন্দুধর্ম্মে যে সকল সাধু মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। যথা, শ্রীচৈতন্যদেব নিজকে মধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। বিভিন্ন আচার্য্যের প্রচারিত মতের মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু প্রভেদ আছে। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে সকল আচার্য্যেরই মত এক। যে সকল বিষয়ে সকল আচার্য্যের মত এক—সেগুলিকে সনাতনধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এই সাধারণ লক্ষণগুলি

এইভাবে নির্দ্দেশ করা যায় :—বেদ বা শ্রুতি কোনও ব্যক্তি বিশেষের রচনা নহে। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত, এজন্য অভ্রান্ত। কিন্তু বেদের প্রকৃত ধর্ম অবগত হওয়া দুরূহ। কারণ ইহার ভাষা কঠিন এবং ভাব অনেকস্থলে গভীর। বেদের মর্ম যাহাতে সহজে জানা যায় এজন্য বেদজ্ঞ ঋষিগণ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র (যথা মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা) এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে কোনও কোনও স্থলে আপাততঃ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল বিরোধ সামঞ্জস্য করিবার জন্য ঋষিগণ মীমাংসা শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। এই সকল ধর্মগ্রন্থের প্রকৃত অর্থ মীমাংসাশাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রণালীতে অবগত হইলে বলিতে পারা যায় প্রত্যেক ব্যক্তির কখন কি কর্ত্তব্য। ইহাই ধর্ম বা হিন্দুধর্ম। সকল আচার্য্যের এই মত। প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে কি বিষয়ে আচার্য্যদের মধ্যে মতভেদ? মতভেদ এই সকল বিষয়ে :- ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের স্বরূপ কি? ঈশ্বর, জীব ও জগতের মধ্যে কি সম্বন্ধ? ঈশ্বর লাভ করিবার উপায় কি? ঈশ্বরলাভ করিলে জীবের কিরূপ অবস্থা হয়? শঙ্করাচার্য্য বলেন যে ব্রহ্ম নির্গুণ; প্রকৃতপক্ষে জীব ও ব্রহ্মে কোনও প্রভেদ নাই; অজ্ঞানহেতু জীব নিজকে সুখী দুঃখী বলিয়া মনে করে; জ্ঞান হইলে জীব নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারে। রামানুজ বলেন যে ব্রহ্ম অনন্ত কল্যাণগুণের আধার; জীব ব্রহ্মের অংশ; সুতরাং জীবও ব্রহ্ম এক নহে। এই সকল বিষয়ে মধ্বাচার্য্য বল্লভাচার্য্য প্রভৃতির মতেও কিছু কিছু প্রভেদ আছে। এই প্রকার মতভেদের কারণ এই যে বিভিন্ন আচার্য্যগণ বেদের কোনও কোনও বাক্যের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বেদ যে অভ্রান্ত এবং পুরাণ, ইতিহাস ও ধর্মশাস্ত্রে যে বেদের উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে এ বিষয়ে সকল আচার্য্যই এক মত।

ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন আচার্য্যের মধ্যে কিছু মতভেদ থাকিলেও মতের ঐক্য অনেক আছে। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; অনন্ত কাল ধরিয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় চলিয়া আসিতেছে; ঈশ্বরই জগতের উপাদান কারণ, পুণ্যবান ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়, পাপী নরকে যায় স্বর্গ ও নরকের নির্দ্দিষ্ট ভোগের অবসান হইলে তাহারা পৃথিবীতে আসিয়া আবার জন্মগ্রহণ করে; প্রত্যেক জীব নিজ কর্মফল ভোগ করে এবং ঈশ্বরলাভ করিলে মোক্ষ হয়—এই সকল কথা সকল আচার্য্যই স্বীকার করেন। কারণ এ সকল কথা বেদাদি শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে মতভেদের কোনও

অবসর নাই। সুতরাং এই সকল তত্ত্বকে হিন্দুধর্মের সর্বসাধারণ মৌলিক তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যে ধর্মে এই সকল কথা মানা হয়না, তাহাকে হিন্দুধর্ম বলা যায়না।

যতীন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে বিচার করিয়াছেন—বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজকে হিন্দু বলা উচিত কিনা। এ বিষয়ে তিনি হিন্দুসভা ও হিন্দু-মিশনের মত উল্লেখ করিয়াছেন; যে সকল ধর্মের উৎপত্তি ভারতবর্ষে সে সকল ধর্মকেই হিন্দুধর্ম বলা উচিত। কিন্তু এই ব্যবস্থাটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বিশ্বাস না থাকিলে তাহাদিগকে এক ধর্মের মধ্যে অন্তর্গত করা যায় না। ধর্মের কোথায় উৎপত্তি হইয়াছে তাহা একটি আকস্মিক ঘটনা (accident)। ধর্মের মতগুলির উপরেই ধর্মের স্বরূপ নির্ভর করে। ভারতবর্ষে যদি বিপরীত মতযুক্ত ধর্মপ্রচার হয় তাহা হইলে তাহাকে এক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হয়না। খৃষ্টানধর্ম বাইবেলর উপর প্রতিষ্ঠিত; মুসলমানধর্ম কোরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাই-বেলের বা কোরাণের কোনও কোনও অংশের ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদ হয় এবং তাহা হইতে খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সকল খৃষ্টান বাইবেল মানেন, সকল মুসলমান কোরাণ মানেন। সেই প্রকার সকল হিন্দুই বেদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত এং মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র মানেন। ইহাই হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণ। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম বেদ পুরাণ প্রভৃতি কিছুই মানেন না। শিখধর্ম প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত। নানক বেদ পুরাণ রামকৃষ্ণ শিব সকলকে মানিতেন ইহা তাঁহার গ্রন্থপাঠ করিয়া বোধ হয়। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে শিখদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ প্রচার করিতেছেন যে শিখ ধর্মে বেদ পুরাণ মানা হয় নাই। ব্রাহ্মগণ বেদ পুরাণ কিছুই মানেন না; আর্য্যসমাজীগণ বেদ মানেন কিন্তু পুরাণ মানেন না; এজন্য ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজীকে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বলা যায় না। বলা বাহুল্য শৈব শক্তি বৈষ্ণব ইঁহারা সকলেই হিন্দু, কারণ ইহারা সকলেই বেদ পুরাণ প্রভৃতি মানিয়া থাকেন।

———

অবতারবাদ

জীবের দেহ ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। অবতারের দেহও ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। জীবের মধ্যে ঈশ্বর আছেন, অবতারের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জীব কর্ম্ম করে, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে অবতারও কর্ম্ম করেন। তাহা হইলে জীব অবতারের মধ্যে প্রভেদ কি? প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অনুসারে জীবের দেহ গঠিত হয়, কিন্তু অবতারের দেহ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অনুসারে গঠিত হয় না; কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে গঠিত হয়। জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, ঈশ্বরকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। জীবের শক্তি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে নির্দ্ধারিত হয়; এই জন্য জীবের শক্তি সীমাবদ্ধ। অবতারের শক্তি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না; কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়; সেই জন্য অবতারের শক্তির কোন সীমা নাই। তিনি অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু পারেন বলিয়া সর্ব্বদাই তিনি তিনি অলৌকিক শক্তির প্রকাশ করেন তাহা নহে। যখন ইচ্ছা হয়, তখন অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করেন। আবার যখন ইচ্ছা হয় তখন সাধারণ মানবের ন্যায় অল্প শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ঈশ্বর যে মধ্যে মধ্যে অবতার গ্রহণ করেন, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে, ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি সাধুগণ, যাঁহারা ভক্তি এবং তপস্যার প্রভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন,—তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, ঈশ্বর অবতার গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাসী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, ব্যাস বা বাল্মীকি নামক কোন ব্যক্তি ছিলেন না। আমাদিগের দেশের অনেক আধুনিক পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতদিগের সুরে সুর মিলাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এ কথা ত অস্বীকার করিতে পারেন না যে, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং ভক্তগণ ভগবানের অবতারের কথা নিসংশয় ভাবে প্রচার করিয়াছেন। সংশয়বাদীরা বলিয়া থাকেন, অবতার বাদ বেদবিরোধী, কারণ বেদে অবতারের কথা নাই। কিন্তু ইহা ঠিক কথা নহে। প্রথমতঃ বেদে অবতারের কথা না থাকিলেই অবতারবাদ

বেদ-বিরোধী হইবে ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। বেদে যদি এমন কথা থাকিত যে, ঈশ্বর অবতার গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহা হইলে অবতারবাদ বেদ-বিরোধী হইত। কিন্তু বেদে সেরূপ কোন কথা নাই। সুতরাং অবতারবাদ বেদ-বিরোধী, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ ইহা যথার্থ নহে যে, বেদে কোথাও অবতারের উল্লেখ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেবকে ঈশ্বরের গুণাবতার বলা হইয়া থাকে। ইহা বলিবার তাৎপর্য্য—ঈশ্বর স্বরূপতঃ নিরাকার এবং গুণাতীত হইলেও সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ অবলম্বন করিয়া তিনি যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেবের উল্লেখ বেদে আছে সুতরাং ইহা বলা যায় যে, বেদে ঈশ্বরের অবতারের উল্লেখ আছে। "কেন" উপনিষদে দেখা যায়, ব্রহ্ম একটি যক্ষের রূপ ধারণ করিয়া দেবগণের নিকট দেখা দিয়াছিলেন এবং দেবগণের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। পরে তিনি হৈমবতী উমার রূপ ধারণ করিয়া দেবগণকে বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মের শক্তিতেই দেবগণ অসুরগণকে পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং বেদ এবং উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় ঈশ্বর মনুষ্য বা রমণী মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন এবং জীবের ন্যায় কথা বলিতে এবং কার্য্য করিতে পারেন। অতএব অবতারবাদ বেদবিরোধী, এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি বেদের প্রগাঢ় পণ্ডিতগণ অবতারবাদ সমর্থন করিয়াছেন। অবতারবাদ বেদবিরোধী হইলে তাঁহারা কখনই ইহা সমর্থন করিতেন না।

ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ করিবার কারণ কি? এ বিষয়ে গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

অর্থাৎ সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতিকারিগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য্য গীতার ভাষ্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, মানবের ভোগ-প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই প্রবল। ইহার প্রভাবে মানবগণ ধর্ম্ম পথ ছাড়িয়া অধর্ম্মের পথে অগ্রসর হয়। সমাজের অধোগতি হয়, ঈশ্বর অবতার গ্রহণ করিয়া অধর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন; পুনরায় মানবগণ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রভাবে অধর্ম্মের পথে অগ্রসর হয়, ঈশ্বর আবার অবতার গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন, এই ভাবে উত্থান

ও পতনের মধ্য দিয়া মানবজাতির ইতিহাস গঠিত হয়। আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন, মানবের ইতিহাসে ক্রমাগত উন্নতি হইতেছে। ইহা যথার্থ নহে। পদার্থবিজ্ঞানে ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় কিন্তু সাধারণতঃ মানবজাতি ক্রমশঃ অধিক ধার্ম্মিক এবং নীতিপরায়ণ হইতেছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। আধুনিক জগতে দুর্নীতিপরায়ণ সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন (৪।১৪) কর্ম্ম সকল আমাকে লিপ্ত করে না, কর্ম্মফলে আমার আসক্তি নাই। ঈশ্বরের কর্ম্ম করিবার প্রণালী এবং জীবের কর্ম্ম করিবার প্রণালীর মধ্যে ইহাই প্রভেদ। জীব সাধারণতঃ কর্ম্ম করে,—কর্ম্ম করিতে ভাল লাগে বলিয়া (অর্থাৎ কর্ম্মে আসক্তি থাকে বলিয়া) অথবা কর্ম্মের ফলভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে বলিয়া। এ জন্যই জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বর অবতার হইয়া যে সকল কর্ম্ম করেন, সে সকল কর্ম্মে তাঁহার কোন আসক্তি থাকে না, কর্মফলের জন্য তাহার কোন আকাঙ্ক্ষাও থাকে না, এ জন্য তাঁহাকে কর্মফলভোগ করিতে হয় না। কর্ম্মে আসক্তি এবং কর্ম্মফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা হেতু জীবকে প্রত্যেক কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়।

ঈশ্বরের অবতার অসংখ্য। তন্মধ্যে মৎস্য-কূর্ম্ম, প্রভৃতি কয়েকটি অবতার সমধিক প্রসিদ্ধ। পৃথিবী যখন জলে প্লাবিত হইয়াছিল, তখন ঈশ্বর মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদ রক্ষা করিয়াছিলেন। বেদ জ্ঞানের আকর। বেদ সমাজে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মজ্ঞান রক্ষা করে; এ জন্য ভগবান বেদ রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম অবতারে ভগবানের পৃষ্ঠে মন্দার পর্ব্বত রক্ষা করিয়া দেব এবং অসুরগণ সমুদ্রমন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন। সংসার সমুদ্র বিশেষ; অসৎকর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিকে অসুর বলা হয়। সংসারে প্রতিনিয়ত দেবতায় এবং অসুরে দ্বন্দ্ব হইতেছে, ইহাই সমুদ্রমন্থন। যদি এই সমুদ্রমন্থন ঈশ্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহা হইলে ইহা হইতে অমৃতের উৎপত্তি হইতে পারে, নচেৎ সংসারযাত্রা ব্যর্থ হয়। হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে রসাতলে লইয়া গিয়াছিল। ভগবান বরাহ অবতার গ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই যে, ভোগপ্রবৃত্তির বশে পৃথিবীর অধঃপাত হয়, ঈশ্বর উদ্ধার করেন। নৃসিংহ অবতারে ভগবান ঈশ্বর বিদ্বেষী অসুরকে (ভোগপ্রবৃত্তিকে) বিনাশ করিয়াছিলেন। বামন অবতারে দাতার

অহঙ্কারপ্রবৃত্তি সংযত করিয়াছিলেন। পরশুরাম অবতারে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ক্ষত্রিয় শক্তি সংহার করিয়াছিলেন। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান বিবিধ অবতারে অধর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

খৃষ্ট ধর্ম্মে ঈশ্বরের অবতারবাদ বিশ্বাস করা হয়, কারণ খৃষ্টানগণ যিশুকে ঈশ্বরের অবতার মনে করেন। ভারতবর্ষে কয়েকজন আধুনিক সংস্কারক অবতারবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ইহা যে বেদ-বিরোধী, এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ইহা বেদবিরোধী নহে। তাঁহারা আরও আপত্তি করেন, ঈশ্বর যখন অনন্ত, তখন তিনি একটি অবতারের দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। কিন্তু অবতার গ্রহণ করিলে ঈশ্বর অবতারের দেহের মধ্যে আবদ্ধ হয় না। পূর্ব্বের ন্যায়ই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া এবং তাহা ছাড়াইয়াও অবস্থান করেন। যেমন অন্য জীবের দেহের মধ্যে থাকেন সেইরূপ অবতারের দেহের মধ্যেও থাকেন। হিন্দুর ধর্ম্ম জগতের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ সাধুগণের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে আমরা আধুনিক ধর্ম্মসংস্কারকগণের অবতার-বিরোধী মত গ্রহণ করিতে পারিনা। ঈশ্বর অবতার গ্রহণ করিতে পারেনা, ইহা স্বীকার করিলে বলিতে হয়, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন।

ভাগবত ধর্ম্ম

বিখ্যাত ঐতিহাসিক রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর তাঁহার রচিত Vaishnavism Saivism and Minor Religious Systems এই গ্রন্থে ইহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে বৈদিক যাগ যজ্ঞ নিস্ফল বিশেষতঃ যজ্ঞে পশুবধ নিন্দনীয় এই ধারণা অনুসারে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের সংস্কার করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে একটি নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার নাম ভাগবত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে প্রথমে বাসুদেবের পূজা প্রচলিত করা হয়, পরে বাসুদেবের কতকগুলি নূতন নাম দেওয়া হয় যথা কৃষ্ণ, গোবিন্দ, তন্মধ্যে কৃষ্ণ এই নামটি খৃষ্টের নাম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ভাণ্ডারকরের

মত সকল ইংরাজি শিক্ষিত পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার প্রণীত Outline of Acient Indian History and Civilization নামক গ্রন্থে ভাণ্ডারকরের পূর্ব্বোক্ত মত অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা তিনি ঐ গ্রন্থের ২২৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ২২৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় ভাগবত ধর্ম্মেরও মত এইরূপ যে যজ্ঞে পশু বধ করা উচিত নহে, এবং যজ্ঞ ও তপস্যা করিয়া কোন ফল নাই। আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিব যে ভাণ্ডারকরের পূর্ব্বোক্ত মতগুলি ভ্রমপূর্ণ এবং রমেশবাবু যথেষ্ট বিচার না করিয়াই সেই মতগুলি গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন যে এই ভাগবত ধর্ম্মের মতগুলি প্রথমে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে সঙ্কলন করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে গীতাতে এরূপ মত দেখিতে পাওয়া যাইত যে যজ্ঞ করা নিস্ফল এবং যজ্ঞে পশুবধ করা অন্যায়। কিন্তু গীতাতে এই প্রকারের মত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। শুধু তাহাই নহে গীতাতে এরূপ উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে যজ্ঞ করা উত্তম কার্য্য, যজ্ঞ পরিত্যাগ করা উচিত নহে,—সকাম ভাবে যজ্ঞ করিলে স্বর্গে যাওয়া যায়, নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞান লাভের উপযোগিতা অর্জ্জন করা যায়। বস্তুতঃ বেদ এবং উপনিষদে যজ্ঞ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, গীতাতেও যজ্ঞ সম্বন্ধে ঠিক তাহাই বলা হইয়াছে। ভাণ্ডারকর যে কল্পনা করিয়াছেন যে যজ্ঞ সম্বন্ধে বেদের যাহা মত, ভাগবত ধর্ম্মের মত তাহার বিপরীত, তাঁহার এই কল্পনা সত্য নহে। গীতা তৃতীয় অধ্যায় ১০ হইতে ১৩ শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ; "প্রজাপতি পুরাকালে যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমরা ইহার দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করিবে। এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করিবে। তোমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবগণের সংবর্দ্ধনা কর, দেবগণ তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন; পরস্পর সংবর্দ্ধনা করিয়া তোমরা পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হইবে। যজ্ঞ দ্বারা পূজিত হইলে দেবগণ তোমাদিগকে ইষ্ট বস্তু প্রদান করিবেন। দেবগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বস্তু দেবগণকে নিবেদন না করিয়া যে ভোগ করে সে চোর। যে ব্যক্তি যজ্ঞের শেষ ভোজন করে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি নিজের জন্যই পাক করে সে পাপই ভোজন করে।" গীতা নবম অধ্যায় ২০ ও ২১ শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ: "যাহারা বেদ অনুসারে যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ প্রার্থনা

করে তাহারা স্বর্গে গিয়া সুখ ভোগ করে। পুণ্য ফুরাইয়া গেলে আবার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে।" বেদ এবং উপনিষদেও যজ্ঞের ফল সম্বন্ধে এই কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং গীতা বা ভাগবত ধর্মের মতে যজ্ঞ নিস্ফল এই উক্তি যথার্থ নহে। ১৮ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন "যজ্ঞ দান ও তপস্যা কথনও ত্যাগ করা উচিত নহে। এই সকল কর্ম করা উচিত। এই সকল কর্ম করিলে চিত্ত পবিত্র হয়।" গীতা ১৭।১১ শ্লোকে বলা হইয়াছে যথাবিধি যজ্ঞ না করিলে সাত্ত্বিক যজ্ঞ হয় না। ১৭।১৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে বিধিহীন ও মন্ত্রহীন যজ্ঞ তামস যজ্ঞ। অতএব বেদ বিধি অনুসারে যজ্ঞ সম্পাদন করা উচিত ইহাই গীতার উদ্দেশ্য। সুতরাং বেদে যে স্থলে পশু বধ করিবার কথা আছে সে স্থলে পশু বধ করিয়া যজ্ঞ করাই গীতার অভিপ্রায় অন্যরূপ অভিপ্রায় হইলে তাহার উল্লেখ থাকিত।

মহাভারতের শান্তিপর্বে বসু উপরিচর নামক রাজার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে ভাণ্ডারকর কল্পনা করিয়াছেন যে এখানে বেদবিরোধী ভাগবত ধর্ম প্রচার করা হইয়াছে কারণ বসু উপরিচর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন কিন্তু অশ্ব বধ করেন নাই, এবং তাঁহার ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া নারায়ণ তাঁহার নিকট দেখা দিয়াছিলেন। বসু উপরিচর যজ্ঞে পশুবধ করেন নাই, ইহা সত্য। কিন্তু তিনি ইহা বলেন নাই যে যজ্ঞে পশুবধ করা অন্যায়। কারণ এ বিষয়ে যখন দেবগণের সহিত কয়েকটি ঋষির মতভেদ হইয়াছিল,—দেবগণ বলিয়া ছিলেন যে যজ্ঞে পশুবধ করা উচিত এবং ঋষিরা বলিয়া ছিলেন যে উচিত নহে, এবং এ বিষয়ে বসু উপরিচরের মত যখন জিজ্ঞাসা করা হইল তখন তিনি দেবগণকেই সমর্থন করিয়াছিলেন। সুতরাং বসু উপরিচর যে পশু বধের বিরোধী মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। ভাণ্ডারকর ইহাও বলিয়াছেন যে এই কাহিনী হইতে জানা যায় যে যজ্ঞ এবং তপস্যা নিস্ফল (inefficacious,) কারণ যাঁহারা যজ্ঞ ও তপস্যা করিয়াছিলেন তাঁহারা ইশ্বরকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু বসু উপরিচর ভক্তির বলে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ভাণ্ডারকরের এই সিদ্ধান্তও ভুল। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারা যায় একথা বেদে কোথাও বলা হয় নাই। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয় ইহাই বেদে উক্ত হইয়াছে। বসু উপরিচরের কাহিনীতে যদি ইহা প্রতিপন্ন করা হইত যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ করা যায় না তাহা হইলে বলা যাইত যে এই কাহিনী বেদবিরোধী। কিন্তু এই কাহিনীতে সে কথা

কোথাও বলা হয় নাই। সুতরাং এই কাহিনী হইতে কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না যে যিনি এই কাহিনী রচনা করিয়াছেন তাঁহার মতে যজ্ঞ নিস্ফল।

বসু উপরিচরের কাহিনী যে ভাগবতধর্ম প্রতিপাদন করিতেছে তাহা কখনই বেদবিরোধী হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের উক্তি সকল পর্য্যালোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। ভাগবতধর্ম বর্ণনার প্রারম্ভে বলা হইয়াছে, "ভগবন্, বেদ বেদাঙ্গ ও পুরাণ সমুদায়ে তোমার গুণ বর্ণিত আছে।" (শান্তিপর্ব ৩৪৫ অধ্যায়)। সুতরাং বেদে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে ভাগবতধর্মে তাঁহাকেই নারায়ণ বলা হইয়াছে, অন্য কাহাকেও নহে। পুনশ্চ এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে "বেদাধ্যায়ননিরত ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন।" পরবর্ত্তী অধ্যায়ে নারদ বলিতেছেন "আমি যত্ন পূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠান করিয়াছি। এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা শুদ্ধসত্ব হইয়াছি।" এই অধ্যায়ে ইহাও বলা হইয়াছে যে ভাগবত ধর্মের আদিগ্রন্থ মরীচি আদি সপ্ত ঋষি প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং এই ধর্মশাস্ত্র "বেদচতুষ্টয় সম্মত।" পুনশ্চ বলা হইয়াছে যে এই শাস্ত্র 'ঋক যজুঃ সাম ও অথর্ব বেদের অবিরোধী।" এই অধ্যায়ের অন্তভাগে বলা হইয়াছে যে এই শাস্ত্র "বেদবেদান্ত-মূলক।" পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে ভাগবত ধর্মে প্রতিপাদিত পরমপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য বসু উপরিচরের সদস্যেরা শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে দেখিলেন যে ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাগণ "ব্রহ্ম মন্ত্র জপ" করিতেছেন এবং "ব্রহ্মের প্রতি চিত্ত সমাধান" করিয়া আছেন। এই সকল বাক্য হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইতেছে যে ভাগবতধর্মের পরম পুরুষ উপনিষদ—প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নহে, এবং ভাগবতধর্ম, বেদমূলক। অতএব এ বিষয়ে ভাণ্ডারকরের বিপরীত সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভ্রান্ত বলিতে হইবে।

ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন যে ভাগবতধর্মে প্রথমে ঈশ্বরের নাম ছিল বাসুদেব, পরে তাঁহাকে কৃষ্ণ এই নাম দেওয়া হয়; কৃষ্ণ এই নাম খৃষ্টের অপভ্রংশ; এই জন্য গুজরাট ও বঙ্গ দেশে কৃষ্ণকে কুষ্ট এবং কৃষ্ট বলা হয়। কিন্তু ভাণ্ডারকর নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে গীতা খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর রচনা। গীতাতে "কৃষ্ণ" এই নাম পাওয়া যায়। পাতঞ্জলির মহাভাষ্যও খৃষ্টের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। তাহাতেও কৃষ্ণ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে কিরূপে ।নাম হইতে কৃষ্ণ নামের উৎপত্তি হইতে পারে? বাঙ্গলা দেশে কৃষ্ট এই

নাম ব্যবহার হইয়াছে অনেক পরে। তাহার অনেক পূর্বে মহাভারত ও পুরাণে কৃষ্ণ এই নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা বলা যায় না যে খৃষ্ট এই শব্দ প্রথমে কৃষ্ট এবং পরে কৃষ্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণ এই শব্দই কৃষ্ট এই ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব খৃষ্ট শব্দ হইতে কৃষ্ট অথবা কৃষ্ণ শব্দের উৎপত্তি হয় নাই। এ বিষয়ে ভাণ্ডারকরের মত একান্তই অসমীচীন হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভাণ্ডারকর আর একটা মত প্রচার করিয়াছেন। তাহা এই যে বেদের একজন ঋষির নাম কৃষ্ণ। ভাগবতধর্ম প্রচারের পর বাসুদেবকে বেদের কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে যিশু খৃষ্টের নাম হইতে কিরূপে কৃষ্ণ নামের উৎপত্তি হয়। বেদ ত খৃষ্টের বহু পুর্ব্বের গ্রন্থ। সুতরাং ভাণ্ডারকরের মতগুলি পরস্পরবিরোধী।

ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন যে অবতারবাদ বেদবিরোধী। ইহা যথার্থ নহে। কোনোপনিষদে দেখা যায় যে পর-ব্রহ্মই জ্যোতিঃপুঞ্জরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং "বহুশোভমানা হৈমবতী উমা" রূপ ধারণ করিয়া কথা বলিতেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মের রূপ সুবর্ণময় কেশ, সুবর্ণময় শ্মশ্রু এবং নখ পর্য্যন্ত সর্বাঙ্গ সুবর্ণময় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ("হিরণ্যকেশঃ হিরণ্য শ্মশ্রুঃ আপ্রনখাৎ সুবর্ণঃ")। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মকে সূর্য্যের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট পুরুষ বলা হইয়াছে ("আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ")। ঋগ্বেদ সংহিতায় ১।১৪৫ বিষ্ণুর বামন অবতারে ত্রিপাদক্ষেপের উল্লেখ আছে ("যস্য উরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষু অধিক্ষীয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ") ব্রহ্ম যদি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিতে পারেন তাহা হইলে অবতার হইতে কোনও বাধা নাই। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান সুতরাং অবতার হইবার শক্তি তাঁহার অবশ্যই আছে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে বেদের বহু অংশ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই সকল বিলুপ্ত অংশের মধ্যে অবতারের কোনও উল্লেখ ছিল কি না তাহা বলা যায় না। সে যাহাই হউক, বেদ এবং উপনিষদে ব্রহ্মকে যেভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার স্বাভাবিক পরিণামরূপে গীতার অবতারত্বকে গ্রহণ করিতে কোনও বাধা নাই। বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষে ফুল হয়,—ফুল এবং বীজে কোনও বিরোধ নাই। যিনি যথেষ্ট সূক্ষ্মদর্শী তিনি বীজের মধ্যেই পুষ্পের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। সেইরূপ অব্যক্ত ব্রহ্মের ধারণা হইতে ব্যক্ত ব্রহ্মের ধারণা এবং তাহা হইতে অবতারের ধারণা আবির্ভূত হইয়াছে। যিনি

ক্ষুদ্রদর্শী তিনি উভয়কে বিভিন্ন বলিয়া কল্পনা করেন। কিন্তু সমগ্র দর্শনের ক্ষমতা যাঁহার আছে তিনি ইহাদের মধ্যে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ একত্বের উপলব্ধি করিতে পারেন। বেদের ধর্ম এবং গীতার ধর্ম উভয়ের মধ্যে কিছু মাত্র বিরোধ নাই। বস্তুতঃ উভয় ধর্ম একই। বেদ ও উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ যেভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, গীতাতেও সেইরূপ নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে উপনিষদের শ্লোক অবিকল অথবা যৎসামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া গীতাতে গ্রথিত করা হইয়াছে। বেদোক্ত ইন্দ্রাদি দেবতার প্রসঙ্গ গীতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দেবতাকে উপাসনা করিবার জন্য বেদে যে সকল যজ্ঞ করিতে বলা হইয়াছে, গীতাতে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। ব্রহ্মকে লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ করিবার নিন্দা গীতাতে অবশ্য আছে। কিন্তু সে নিন্দা করিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয় না, উদ্দেশ্য এই যে স্বর্গবাসের পর পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া দুঃখভোগ করিতে হয়, সুতরাং স্বর্গলাভ জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতে পারে না। বেদ এবং উপনিষদে যে বর্ণবিভাগের উল্লেখ আছে গীতাতেও সেই বর্ণবিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ এবং উপনিষদে কর্ম অনুসারে পুনর্জন্মের উল্লেখ আছে, গীতাতেও আছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ বেদ অনুযায়ী ধর্মই প্রচার করিয়াছেন, বেদ-বিরোধী ধর্ম প্রচার করেন নাই। শঙ্করাচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি বৈদিক পণ্ডিতগণও বলিয়াছেন যে গীতার ধর্ম এবং বেদের ধর্ম এক। তাহা সত্ত্বেও ভাণ্ডারকর কল্পনার বলে দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় একটা নূতন ধর্ম ("independent sect") প্রচার করিয়াছিলেন। ভাণ্ডারকরের এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভ্রান্ত।

রাজা বসু উপরিচর যজ্ঞ করিবার সময় পশুবধ করেন নাই এই ঘটনা হইতে সিদ্ধান্ত করা উচিত হয় না যে পশুবধের বিরোধিতা করিয়া ভাগবত ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। কারণ (১) রাজা বসু উপরিচর নিজেই বলিয়াছেন, যে যজ্ঞে পশুবধ করা উচিত (২) যদি পশুবধ নিবারণ করাই ভাগবত ধর্মের উদ্দেশ্য হইতে তাহা হইলে গীতাতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ থাকিত (যেমন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে যজ্ঞে পশুবধ নিন্দনীয়)। "ভাগবতধর্মের" প্রধান গ্রন্থ গীতাতে তাহার কোনও উল্লেখ না করিয়া অপেক্ষাকৃত অখ্যাত রাজা বসু উপরিচরের কাহিনীতে তাহা আবদ্ধ রাখা সঙ্গত নহে। (৩) কুরুক্ষেত্র

পর যুধিষ্ঠির যে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে যথাশাস্ত্র অশ্ব ছেদন করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ আছে।

ভাণ্ডারকর তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে বেদ এবং উপনিষদসমূহ বহু সামঞ্জস্য হীন মতের সমষ্টি ইহা সুবিদিত। শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ বেদ এবং বেদের অন্তর্গত উপনিষদকে হিন্দু ধর্মের ভিত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদ যাহা বলিয়াছেন তাহা অবশ্য সত্য, এই কথা তাঁহারা বারম্বার নিঃসংশয়ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। বেদ এবং উপনিষদের মত সমূহ যদি পরস্পর সামঞ্জস্যহীন হয় তাহা হইলে কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বেদকে সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যের কি এতটুকু বুদ্ধি ছিল না যে, যে গ্রন্থে বহু সামঞ্জস্যহীন বিরোধ বিদ্যমান এরূপ গ্রন্থকে তাঁহারা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন? বস্তুতঃ বেদের কতকগুলি অংশ পাঠ করিলে সেগুলি আপাত দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয় ইহা বহু প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশের বৈদিক পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আরও গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে এই সকল আপাতবিরোধী মতগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায়। কি উপায়ে এই সকল আপাততঃ বিরোধী অংশগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় মহর্ষি জৈমিনি তাহার পূর্ব মীমাংসা সূত্রে তাহা দেখাইয়াছেন। সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া উপনিষদের বাক্যসমূহ বিচার করা হইয়াছে, এবং ঈশ্বর জীব ও জগৎ সম্বন্ধে একটী সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মমত স্থাপন করা হইয়াছে। এই সকল মীমাংসা গ্রন্থের প্রণালী অনুসরণ করিয়া সায়ণাচার্য্য সমগ্র বেদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং শঙ্করাচার্য্য প্রধান প্রধান উপনিষদগুলির বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই আচার্য্যদ্বয় অবশ্য মনে করিয়াছেন যে বেদের (এবং উপনিষদের) বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সকল আপাত বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহাঁদের যুক্তিগুলি কোথায় ভুল হইয়াছে কোনও আলোচনা না করিয়া ভাণ্ডারকরের এরূপ সরাসরি ভাবে রায় দেওয়া উচিত হয় নাই যে বেদ ও উপনিষদগুলি পরস্পরবিরোধী বাক্যে পরিপূর্ণ।

ভাণ্ডারকর কল্পনা করেন যে বৈদিক যজ্ঞ করিলে কোনও ফল পাওয়া যায় কিনা প্রথমে এইরূপ সন্দেহের উৎপত্তি হয় এবং এইরূপ আলোচনা হইতে উপনিষদের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে অবশ্যই

বলা যাইত যে বেদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মত বিদ্যমান। কিন্তু উপনিষদে কোথাও এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ প্রকাশ করা হয় নাই যে যজ্ঞ করিলে স্বর্গ লাভ করা যায়। প্রত্যুতঃ বহু স্থলে ইহা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গলাভ করা যায়। আমরা নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :

এষ তে অগ্নির্ণচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যম্ অবৃণীথা দ্বিতীয়ো বরেণ (কঠোপনিষৎ)

"হে নচিকেত, যে অগ্নির বিষয় তোমাকে উপদেশ দিলাম ইহার দ্বারা যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ করা যায়। তুমি দ্বিতীয় বরে ইহা জানিতে চাহিলে।"

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং

*   *

নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা
ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি।

মুণ্ডকোপনিষৎ

"যাহারা যজ্ঞ এবং কূপ নির্ম্মাণ আদি কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে তাহারা পুণ্যফলে স্বর্গভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে অথবা হীনতর স্থানে প্রবেশ করে।"

তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা শ্রদ্ধাং জুহ্বতি
তস্যাঃ আহুতেঃ সোমো রাজা সং ভবতি

ছান্দোগ্য উপনিষৎ

"যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞে আহুতি প্রদান করে তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গে দিব্যদেহ প্রাপ্ত হয়।"

বস্তুতঃ ব্রহ্মকে জানা যে প্রয়োজন তাহার কারণ ইহা নহে যে যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গলাভ হয় না; তাহার কারণ ইহা যে স্বর্গ অনন্তকাল স্থায়ী নহে, পুণ্য ফুরাইলে আবার পৃথিবীতে আসিয়া দুঃখভোগ করিতে হইবে; কিন্তু ব্রহ্মকে জানিলে আর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, মৃত্যুর পর মোক্ষলাভ হয়।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মজিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদম্ আয়ান্ নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ—

মুণ্ডকোপনিষৎ

"ব্রাহ্মণ যজ্ঞাদি কর্ম হইতে যে স্বর্গলাভ করিতে পারে তাহা বিচার করিয়া দেখিবে যে কর্মের ফল অনন্ত হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সে গুরুর নিকট গমন করিবে।"

এই বাক্য সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে বৈদিক যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গলাভ করা যায় অতএব তাহা নিস্ফল নহে ইহাই উপনিষদের মত। ভাণ্ডারকর যে এবিষয়ে বিপরীত মত প্রচার করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের ধারাবাহিক জীবনী নাই এজন্য তাঁহার বাল্যলীলার বর্ণনা নাই। ভাণ্ডারকরের মতে পুরাণ বর্ণিত এই বাল্যলীলা একটি স্বতন্ত্র প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সভাতে শিশুপাল যখন শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিতেছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার উল্লেখ করিয়াছেন,—বলিয়াছেন ইনি বাল্যে গোচারণ করিতেন, গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, পূতনা ও অঘাসুর প্রভৃতি বধ করিয়াছিলেন। ভাণ্ডারকরের মতে এ সকল প্রক্ষিপ্ত। তিনি ইহাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার এইরূপ কারণ দিয়াছেন ঃ—"শিশুপাল এই সকল বাল্যলীলার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ভীষ্ম এই সকল প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু ভীষ্ম সে সকল লীলা উল্লেখ করেন নাই; অতএব শিশুপালেব এই বাক্য প্রক্ষিপ্ত।" কথাটি ঠিক হয় নাই। ভীষ্ম বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন লোকে মৎসন্নিধানে পুনঃ পুনঃ যে সকল কীর্ত্তন করিয়াছে।" * ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ভীষ্ম বলিতেছেন যে কৃষ্ণ বাল্যকালে অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। সে সকল কার্য্য সকলের সুবিদিত বলিয়াই ভীষ্ম সে সকলের বিস্তারিত উল্লেখ করেন নাই। শিশুপাল সে সকল উল্লেখ করিয়াছেন কারণ তিনি দেখাইতে চাহেন যে সে সকল কর্ম প্রশংসার্হ নহে। অতএব ভীষ্ম ও শিশুপালের কথোপকথন হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে শিশুপালের উক্তি প্রক্ষিপ্ত। যদি বাস্তবিকই প্রক্ষিপ্ত হইত তাহা হইলে ভীষ্মের উক্তিতেও ইহার উল্লেখ প্রক্ষিপ্ত করা হইত, এবং মহাভারতের এমন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাইত যাহাতে এস্থলে কৃষ্ণের বাল্যলীলার কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু সেরূপ পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ভাণ্ডারকর উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত

---

* সভাপর্ব ৩৭ অধ্যায়।

করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে এই অংশ ভাণ্ডারকরের মতের বিরোধী বলিয়াই তিনি ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া তাঁহার পক্ষ পরিস্কার করিয়া লইয়াছেন। ভাণ্ডারকরের মত এই যে কৃষ্ণকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার পরে রামকে অবতার বলিয়া প্রচার করা হয়। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে রামকে অবতার বলা হইয়াছে। ইহা ভাণ্ডারকরের মতের বিরোধী। অতএব ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন বাল্মীকির রামায়ণে যে সকল স্থানে রামকে অবতার বলা হইয়াছে সে সকলগুলি প্রক্ষিপ্ত। কেন তিনি প্রক্ষিপ্ত মনে করেন তাহার কারণ তিনি দেন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে ভাণ্ডারকর সুবিধা হইলেই প্রক্ষিপ্তবাদের সাহায্য লইয়াছেন। তাহার জন্য যথেষ্ট কারণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই।

ভাণ্ডারকর এই গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য হিন্দুর পূজাপদ্ধতির এবং জাতিভেদের নিন্দা করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব শক্তিপূজায় মন্ত্রের ব্যবহার নিন্দা করিয়াছিলেন ইহা সত্য, কিন্তু বিষ্ণুপূজা বা শিবপূজার কোনও অংশ নিন্দনীয় বলেন নাই। নিন্দনীয় বলা দূরের কথা তিনি পরম সমাদর করিয়াছিলেন এবং মন্দিরে মন্দিরে গিয়া আগ্রহের সহিত পূজা দেখিতেন এবং আনন্দে নৃত্য করিতেন। এক্ষেত্রে ইহা বলা ভুল যে চৈতন্যদেব হিন্দুর পূজাপদ্ধতি নিন্দা করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব যে জাতি বিভাগের নিন্দা করেন নাই তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রকাশিত "শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ" শীর্ষক আমার প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। *

মহাপুরুষ ও শাস্ত্র বাক্য

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠো শ্রুতয়োবিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

"যুক্তির উপর নির্ভর করা যায় না। বেদ সকল বিভিন্ন। যাঁহার মত বিভিন্ন নহে, তিনি ঋষি নহেন। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহার মধ্যে নিগূঢ়। মহাজন

---

* এই প্রসঙ্গটি ধর্ম্মপ্রসঙ্গ নামক মৎপ্রণীত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

যে পথে গিয়াছেন তাহাই প্রকৃত পথ।" এই কথা ব্যাসদেব বলিয়াছেন। এখানে মহাজন শব্দের অর্থ সাধুপুরুষ। শ্রীচৈতন্যদেবও শব্দটার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১৭ পরিচ্ছেদ) আমরা ক্ষুদ্রজন, কারণ ক্ষুদ্র দেহের অনুভূতির উপর আমাদের সুখ ও দুঃখ নির্ভর করে। মহাজনগণ অপর সকল ব্যক্তির সুখ ও দুঃখ নিজের বলিয়া অনুভব করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বিষয় গীতাতে বলিয়াছেন সর্ব্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা তাঁহাদের মন তাঁহাদের দেহ ছাড়িয়া সকল মানবের দেহ পরিব্যাপ্ত করে,—কেবল মানবের কেন, সর্ব্বভূতের দেহ পরিব্যাপ্ত করে, কারণ সর্ব্বভূতের মধ্যে এক পরমাত্মা বিরাজিত। এজন্যই তাঁহাদের নাম মহাজন। তাঁহারা যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন আমাদের সেই পথ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। নচেৎ আমরা সংসার অরণ্যে পথ হারাইয়া ফেলিব। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সংসারসমুদ্রে তাঁহাদের মহৎ জীবন পথভ্রান্ত নাবিকের পথ প্রদর্শন করে।

আমরা পূর্ব্বে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। জীবনে সত্যপথ নির্ণয় করিবার জন্য মানুষ স্বভাবতঃ নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। কিন্তু মানবের বুদ্ধি অনেক সময় ভুল পথ নির্দ্দেশ করিবে। কারণ মানবের বুদ্ধি সাধারণতঃ আসক্তি ও বিদ্বেষের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। আসক্তি এবং বিদ্বেষ হইতে মুক্ত না হইলে বুদ্ধি সত্য নির্ণয় করিতে পারে না। তাই ব্যাসদেব বলিয়াছেন, "তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠঃ"। যুক্তির দ্বারা এক ব্যক্তি যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করে, অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান অন্য ব্যক্তি প্রবলতর যুক্তির দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত উন্মূলিত করিয়া দেয়। এইজন্য বুদ্ধির দ্বারা চরম সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যায় না। ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১ "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" সূত্রে এ সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। বুদ্ধির দ্বারা যখন সত্যপথ নির্ণয় করা যায় না, তখন ঈশ্বরের অনুপ্রেরণার উপরে অবশ্যই নির্ভর করিতে হইবে। বেদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেরণা পাওয়া যায়। কিন্তু বেদের সাহায্যে সত্যপথ নির্ণয় করিবার পক্ষে বাধা এই যে শ্রুতয়োবিভিন্নাঃ,—বেদ সকল বিভিন্ন। কিন্তু বেদ সকল যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তাহা হইলে কিরূপে সত্য হইবে? কারণ ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের সকল আচার্য্য এবং সাধু পুরুষগণ বলিয়াছেন যে সমগ্র বেদ সত্য এবং বেদই সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি। সত্য হইতে হইলে বেদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। নিশ্চয়ই শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য্যগণ এরূপ নির্ব্বোধ ছিলেন

না যে, যে গ্রন্থ পরস্পর বিরোধী বাক্যে পরিপূর্ণ তাহাকে তাঁহারা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে শ্রুতয়োবিভিন্না এই কথার এরূপ অর্থ নহে যে বেদ সকল পরস্পরবিরোধী। বিভিন্ন ও বিরোধী এক কথা নহে। দুইটী বস্তু বিভিন্ন হইলে, যে বিরোধী হইবে এইরূপ অর্থ নাই। বেদের বিভিন্ন অংশ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ করিবার বিভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করে। পথগুলি বিভিন্ন হইলেও সকল পথগুলিই সত্য। কারণ বেদ সর্ব্বাংশে সত্য।

এরূপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে বেদের সকল পথগুলি যদি সত্য হয় তাহা হইলে একটি কোন পথ অনুসরণ করিলেই চলিবে। অনেকগুলি পথ আছে বলিয়া আমাদের বিভ্রান্ত হইবার কারণ নাই। বিভিন্ন পথ থাকায় যদি বিভ্রমের কারণ হয় তাহা হইলে সেই বাধা সমাধানের জন্য পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে কেন বলা হইল "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" অর্থাৎ মহাজনগণ যে পথে গিয়াছেন তাহাই পথ। সকল মহাজনগণ ত এক পথে যান নাই। কেহ জ্ঞানের পথে অনুসরণ করিয়াছেন, কেহ ভক্তির পথ,—কেহ বিষ্ণু পূজা করিয়াছেন, কেহ বা কালী পূজা করিয়াছেন।

এই সমস্যার সমাধান এই যে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত উভয়ই প্রয়োজন। আমরা বেদ এবং স্মৃতি গ্রন্থ হইতে উপদেশ পাইতে পারি, কিন্তু দৃষ্টান্তের জন্য এরূপ কোন ব্যক্তির প্রয়োজন যিনি সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন অথবা উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। আমাদের ভ্রম এবং সন্দেহ দুর করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। বস্তুতঃ এরূপ ব্যক্তির সাহায্য না পাইলে সিদ্ধিলাভ করা অতিশয় দুরূহ। কারণ ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং অর্থাৎ ধর্ম্মের তত্ত্ব অতিশয় নিগূঢ়।

ব্যাসদেবের যে শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অনুরূপ একটী বাক্য বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। পরীক্ষ্যলোকান্ কর্ম্মজিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদম্ আয়ান্ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং (মুণ্ডক উপনিষদ ১-২-১২)। "যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা যে স্বর্গাদিলোক পাওয়া যায় নাহা অনিত্য ইহা বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণের স্বর্গলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা উচিত। তাঁহার এইরূপ জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন যে কোনরূপ কর্ম্মের দ্বারা চিরস্থায়ী মোক্ষলাভ করা সম্ভব নহে।

এ জন্য তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য যজ্ঞীয় কাষ্ঠরূপ উপহার হস্তে লইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট উপস্থিত হইবেন।" যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনি অবশ্যই সাধু ব্যক্তি হইবেন। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে হৃদয়ের প্রসার বৃদ্ধি হয়। ব্যক্তিগত সুখদুঃখে হৃদয় চঞ্চল হয় না। ব্রহ্ম সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন, এজন্য ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয় উদার ও বিশ্বব্যাপী হয়। তাই ব্যাসদেব তাঁহাকে মহাজন বলিয়াছেন। বেদ বলিয়াছেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সাহায্য ব্যতীত ব্রহ্মলাভ করা যায় না। বেদবাক্য অনুসরণ করিয়া ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে মহাজনের সাহায্য ব্যতীত সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শ্রুতি ও স্মৃতি নির্দ্দিষ্ট পথ কিরূপে অনুসরণ করিতে হইবে, সাধু পুরুষগণ তাহাই দেখাইয়া দেন। এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে যে শ্রুতি ও স্মৃতি যে পথ নির্দ্দেশ করেন নাই, সাধু পুরুষগণ সে পথও দেখাইতে পারেন কি না? ইহার উত্তর এই যে, হিন্দু সাধু পুরুষ শ্রুতি ও স্মৃতির নির্দ্দিষ্ট পথ ব্যতীত অন্য পথ দেখাইতে পারেন না। কারণ শ্রুতি এবং স্মৃতি হিন্দু ধর্ম্মের ভিত্তি। হিন্দু অবশ্যই তাঁহার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিবেন। যে পথ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নহে, মুসলমান বা খৃষ্টান তাহা অনুসরণ করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দু পারেন না। কারণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ অত্যন্ত পাপজনক।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে হিন্দু সাধুপুরুষগণ সকলেরই বেদ এবং স্মৃতিতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই সকল গ্রন্থে ঈশ্বর লাভ করিবার জন্য বিভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহা বলা বাহুল্য যে ঐ সকল পথ অনুসরণ করা অতিশয় দুরূহ। কারণ ঈশ্বরলাভ মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম গতি তাহা সহজে সাধিত হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তির শাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকে, অথবা অল্প মাত্র বিশ্বাস থাকে, তাহা তাহার পক্ষে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করা সম্ভব নহে। তাঁহার মনে এই প্রকার সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। "সত্য সত্যই ঈশ্বর আছেন কি না কে জানে? যদি বা ঈশ্বর থাকেন তথাপি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রে যে সকল পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সে সকল পথ যে সত্য তাহাই বা কে বলিতে পারে। জগতের ভোগের দ্রব্যগুলি হইতে যে অনেক সুখ পাওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল ধ্রুব সুখ পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুব ঈশ্বর লাভের জন্য

কষ্ট স্বীকার করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।'" শাস্ত্রে যাঁহার পরিপূর্ণ বিশ্বাস নাই তাঁহার মনে এই সকল চিন্তার উদয় হইয়া সাধনার পথ হইতে নিবৃত্ত করিবে। উপনিষদ বলিয়াছেন ঈশ্বর লাভ করিবার পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম (কঠোপনিষদ ১।৩।১৪)। কেবল মাত্র যে ব্যক্তির ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে এবং শাস্ত্র ঈশ্বর লাভ করিবার প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে, এ বিষয়ে যাঁহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, তাঁহার পক্ষেই সমস্ত পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর লাভের জন্য চেষ্টা করা সম্ভব। এই জন্যই দেখা যায় যে হিন্দু সাধকগণ সকলেরই শাস্ত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।'

সাধুদের শাস্ত্র-বিশ্বাস কতদুর দৃঢ় ছিল তাহা দেখাইবার জন্য আমি নিম্নে চারিটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি,—শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস। ইহাঁরা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইহাঁরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্কর এবং রামানুজ উভয়েই ব্রহ্মসূত্রের বিস্তারিত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্তগুলি নির্ভুল বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। বেদ এবং স্মৃতি যে প্রামাণিক ইহা ব্রহ্মসূত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে; নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল। বাস্তবিক পক্ষে দৃষ্টান্ত দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কারণ সমগ্র ব্রহ্মসূত্রগুলি প্রধানতঃ বেদ ও স্মৃতি বাক্যে প্রামাণিকতার উপর নির্ভর করে। "অপিসংরাধনে শ্রত্যনুমানাভ্যাং" (৩।২।২৪) "অপিচ স্মর্য্যতে" (১।৩।২৩, ২।৩।৪৫,—৩।৪।৩০, ৩।৪।৩৭) "অশুদ্ধম্ ইতি চেৎ ন শব্দাৎ,, (৩।১।২৫,) "গৌণঃ চেৎ ন আত্মশব্দাৎ" (১।১।৬) দর্শয়তিচ অথ অপি স্মর্যতে" (৩।২।১৭)।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে শ্রুতি ও স্মৃতি অভ্রান্ত।

বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১ শঙ্কর ভাষ্য) "বেদের প্রমাণ্য অন্যবস্তুর উপর নির্ভর করে না।"

অনুগতাশ্চ সর্বত্র অভিমানিণ্যঃ চেতনা দেবতাঃ মন্ত্রার্থবাদ-ইতিহাস-পুরাণাদিভ্যঃ অবগম্যতে (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৫ শঙ্করভাষ্য)

"সকল বস্তুর মধ্যে চেতন দেবতা বিদ্যমান আছেন ইহা বেদ, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত হইতে জানা যায়।"

শঙ্কর কেবল ইহা বলেন নাই যে শ্রুতি অভ্রান্ত, তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে অলৌকিক বিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ।

নচ অতীন্দ্রিয়ান্ অর্থান্ শ্রুতিম্ অন্তরেণ কশ্চিৎ উপলভতে ইতি শক্যং সম্ভাবায়িতুং (২।১।১ ব্রহ্মসূত্র শঙ্কর ভাষ্য)

"যে সকল বস্তু ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে সে সকল বস্তু বেদবাক্য হইতেই জানা যায়, অন্য উপায়ে জানা সম্ভব নহে।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যের ভূমিকায় শঙ্কর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অবহেলা করে সে মৃত্যুর পরে হীনযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে :— "শাস্ত্রবিহিত প্রতিষিদ্ধাতিক্রমেণ প্রবর্ত্তমানঃ অধর্মসংজ্ঞকানি কর্মাণি উপচিনোতি ততঃ স্থাবরান্তা অধোগতিঃ।" অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ লঙ্ঘন করিলে অধর্ম হয়, তাহার ফলে উদ্ভিদযোনি পর্য্যন্ত অধোগতি হয়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ১।২২ ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন "প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ নিয়মেন অনুষ্ঠেয়াণি শ্রৌতানি স্মার্ত্তাণি কর্মাণি" অর্থাৎ যতক্ষণ ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া অনুভব না হয় ততক্ষণ শ্রুতি এবং স্মৃতিবিহিত কর্ম নিয়ম পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা উচিত।

বিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্রের ১১০ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর ঈশ্বরের উক্তি বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, "শ্রুতি স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ।" অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা। যে শ্রুতি স্মৃতি উল্লঙ্ঘন করে সে আমার আজ্ঞালঙ্ঘন করে, অতএব আমার বিরোধী। সে আমাকে ভক্তি করিলেও প্রকৃত বৈষ্ণব নহে।

রামানুজের শাস্ত্রনিষ্ঠাও অত্যন্ত প্রবল। ব্রহ্মসূত্র ২।১।২ সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন যে মনু যোগপ্রভাবে বিশ্বের সকল বস্তু সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মসূত্র ৩।১।২৫ সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন যে, যজ্ঞে পশুবধ করা সেই পশুর পক্ষে কল্যাণকর কারণ বেদ বলিয়াছেন যে, ঐ পশু স্বর্গে গমন করে।

শাস্ত্র বাক্যে শ্রীচৈতন্যদেবের বিশ্বাস কিরূপ ছিল তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে নিম্নে দুই একটী বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে তিনি বলিয়াছেন, "জীবে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ"

মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে তিনি বলিয়াছেন যে যাহার শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে সেই উত্তম ভক্ত।

রামকৃষ্ণ পরমহংস যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে সময় ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে অনেকের শাস্ত্র বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছিল। ইঁহারা মনে করিতেন যে

ইংরাজি শিক্ষা না পাইলে মনের উদারতা হয় না। কিন্তু রামকৃষ্ণ ইংরাজি শিক্ষা পান নাই। ঈশ্বরলাভের জন্য পুরাণে যে সকল সাধনা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তিনি সেই সকল সাধনার দ্বারাই ঈশ্বর লাভ করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁহার প্রণীত রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, যখন তাঁহার কোনও অলৌকিক অনুভূতি হইত, যতক্ষণ শাস্ত্রের সহিত না মিলাইতে পারিতেন ততক্ষণ তাঁহার সংশয় যাইত না যে ইহা প্রকৃত কিনা। (সাধকভাব ১৩৪ পৃষ্ঠা)

পুনশ্চ তিনি লিখিয়াছেন, "যদিও তিনি প্রায় নিরক্ষর ছিলেন তথাপি তিনি আজীবন শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।" (২৭৭ পৃষ্ঠা)

রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "সনাতন ধর্ম্ম ঋষিরা যা বলেছেন—তাই চিরকাল থাকবে" (রামকৃষ্ণ কথামৃত ৫ম ভাগ ১৩৭ পৃঃ)।

যে চারিজন সাধু হিন্দু ধর্ম্ম-আকাশে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের ন্যায় দীপ্তি পাইয়াছিলেন, আমরা উপরে তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছি। আমরা যদি অপর সকল সাধুর জীবন অথবা গ্রন্থ আলোচনা করি, তাহা হইলেও এই তত্ত্বের সমর্থন দেখিতে পাই যে, শাস্ত্রবাক্য ঈশ্বরের আদেশ অতএব অবহেলা করা উচিত নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এই কয়জনের নাম উল্লেখ করিতে পারি,—মাধবাচার্য্য; বল্লভাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য; তুলসীদাস, তৈলঙ্গস্বামী, গম্ভীরনাথ, কাঠিয়া বাবা, বামাক্ষেপা, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী। ইঁহারা সকলেই শাস্ত্র বাক্যকে প্রামাণিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শাস্ত্রকে সমর্থন করিবার জন্য সাধুদের বাক্য উদ্ধৃত করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতাতে বলিয়াছেন—

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্মকর্ত্তুম্ ইহার্হসি॥

"অতএব কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে, ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তুমি শাস্ত্রকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিবে! শাস্ত্রের বিধান অবগত হইয়া কর্ম্ম করা তোমার উচিত।" বলা বাহুল্য এখানে শাস্ত্র শব্দের সুবিদিত অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতি (পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং ধর্ম্মশাস্ত্র)।

যে সকল সাধু শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই, এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে

যে, তিনি সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহার চরিত্র যে অতিশয় মহৎ ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মহৎ চরিত্রের প্রতি যতদূর শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায়, বুদ্ধদেব সম্বন্ধে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র তাহা করিয়াছে। কারণ হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রেই তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। অন্যধর্ম্মের ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করার মত উদারতা হিন্দু ধর্ম্মেই আছে। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রেই ইহাও বলা হইয়াছে যে বুদ্ধদেবের প্রচারিত মত সকল অভ্রান্ত নহে। ইহা কি আশ্চর্য্য নহে যে বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন সত্ত্বেও তিনি স্পষ্ট ভাবে বলিলেন না যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করেন কি না? ইহাও কি আশ্চর্য্য নহে যে যদিও তিনি যজ্ঞে পশুবধ নিন্দা করিয়াছিলেন তথাপি তিনি মাংস ভোজনের নিন্দা করেন নাই? আধুনিক সাধুদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি যদিও বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি মনুসংহিতার ন্যায় স্মৃতি গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু বেদেই বলা হইয়াছে যে মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন সকলই কল্যাণকর, "যৎকিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্" (তৈত্তিরীয়সংহিতা)। বেদকে মানা যাইতে পারে কিন্তু মনুসংহিতাকে মানা যাইবে না স্বামীজীর এই মত পরস্পরবিরোধী। স্বামীজি রামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন এবং প্রচার করিয়াছিলেন যে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত অবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামকৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রামকৃষ্ণদেব বেদ এবং স্মৃতি উভয়ের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিবেকানন্দ অপেক্ষা রামকৃষ্ণের মতের মূল্য অধিক বলিয়া গ্রহণ করিলে দোষ হইবে না। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রথম বয়সে শাস্ত্র মানিতেন না কিন্তু পরে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং তিনি শাস্ত্র-নির্দিষ্ট পথে সাধনা করিয়া ঈশ্বর লাভ করিয়াছেন। অতএব সকল সাধুদের মত পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে অধিকাংশ প্রধান প্রধান সাধুর মতে শাস্ত্র প্রামাণিক।

অমৃতত্ব ও আধ্যাত্মিক সাধনা

মৃত্যুকে ভয় করিবার কারণ এই যে, মৃত্যু হইলে এই সুন্দর বিচিত্র জগৎ আর দেখিতে পাইব না, আত্মীয় স্বজনের কণ্ঠস্বর আর শুনিতে পাইব না,—ফলতঃ, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক দ্বারা পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ-শব্দ স্পর্শ অনুভব করিতে পারিব না ;—ইহাই মৃত্যুভয়ের কারণ। যদি পৃথিবীর শব্দ-স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধ অনুভব না করিবার জন্য কোনও দুঃখ বা কষ্ট না হয়, যদি বাহ্য জগৎ হইতে আনন্দ লাভের কোনও আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুকে ভয় করিবার কোনও কারণ থাকে না। এ জন্য বাহ্য জগৎ হইতে আনন্দ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করাকে উপনিষদে অমৃতত্ব লাভের সাধনা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পরাঞ্চি খনিব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ (কঠোপনিষদ)

"সৃষ্টিকর্ত্তা ইন্দ্রিয় সকল বহির্মুখী করিয়াছেন, এজন্য (মানব) বাহিরে দেখিতে পায়, ভিতরে দেখিতে পায় না। কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভের ইচ্ছা করিয়া দৃষ্টি অন্তর্মুখী করিয়া সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে দেখিতে পান।"

কেবল হিন্দুধর্ম্মে নহে, সকল ধর্ম্মেই বৈরাগ্যকে ধর্ম্মপথের প্রধান সহায় বলা হইয়াছে। প্রকৃত জ্ঞানী সহজেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। কারণ, যিনি জ্ঞানী, তিনি বুঝিতে পারেন যে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসময় বহির্জ্জগতের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকিলে পরিণামে দুঃখ পাইতে হইবে ; কারণ, বাহ্য জগতের প্রত্যেক বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ একদিন হইবেই। বড়জোর ইহজন্ম ধরিয়া বাহ্য বস্তু উপভোগ করিতে পারা যাইবে, কিন্তু মৃত্যুর সময় সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে। বাহ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি থাকিলেই মৃত্যুর কবলে পড়িতে হইবে। মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিবার উপায়,—"অমৃতত্ব" লাভের উপায়,—বাহ্য বস্তুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ। এজন্য দৃষ্টি ভিতরের দিকে ফিরাইতে হইবে, "আবৃত্তচক্ষু" হইতে হইবে, এবং হৃদয় মধ্যে বিরাজিত পরমাত্মাকে দর্শন করিতে হইবে।

তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিলে আর বাহ্য বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকিবে না ; কারণ, বাহ্য বস্তু উপভোগ করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, পরমাত্মাকে দর্শন করিলে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ আনন্দ পাওয়া যায়,—"রসো বৈ সঃ"—তিনি আনন্দ স্বরূপ,—"সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি", তিনিই আনন্দের চরম সীমা, "এতস্য এবহি আনন্দস্য অন্যে জীবা মাত্রামুপভুঞ্জন্তি" অন্য জীব এই আনন্দের সামান্য অংশ মাত্র উপভোগ করে।

যাঁহারা জ্ঞানী নহেন তাঁহারা বাহ্য বিষয় ভোগের ক্ষুদ্র আনন্দের জন্যই লুব্ধ হইয়া উঠেন,

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাঃ
তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্যপাশং
অর্থ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে (কঠোপনিষদ)

"বালকগণ (অজ্ঞান ব্যক্তিগণ) বাহ্য বিষয়ের অনুসরণ করিয়া থাকে। তাহারা বহু কাল ধরিয়া মৃত্যুর বন্ধন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অমৃতত্ব (মৃত্যু-মুক্ত অবস্থা) জানিতে পারিয়া অনিত্য বিষয়ে নিত্য বস্তু অনুসন্ধান করেন না।"

নচিকেতার নিকট বহু বাহ্য বিষয়-ভোগ উপস্থিত হইয়াছিল। নচিকেতা সে সকল ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মোক্ষলাভে তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন,—

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারং।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা
ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। (কঠোপনিষদ)

"হে নচিকেতা, তুমি বহু কাম, প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞের ফল, নির্ভয় এবং সকলের স্তুত উত্তম গতি, এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু বিচার পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছে।"

সকল সাধকেরই সাধনামার্গে এই ভাবে কামনাসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি সেই সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ করেন। যিনি কামনায় আসক্ত হইয়া পড়েন তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ (কঠোপনিষৎ)

"শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ই মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি বিবেচনা পূর্ব্বক উভয়ের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করেন এবং প্রেয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রেয় গ্রহণ করেন। অবিবেকী ব্যক্তি বিষয়লোভে আকৃষ্ট হইয়া প্রেয় গ্রহণ করে।"

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে উপনিষদ বলিয়াছেন যে অমৃতত্ব লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহ্য বিষয় হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখী করিতে হইবে। কিন্তু যাহাদের অন্তরে বিষয়ভোগের প্রবল বাসনা, তাহারা সহসা বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইবে না। এজন্য শাস্ত্রমতে গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। গার্হস্থ্য আশ্রমে অবৈধ বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিয়া নিয়ম পালন পূর্ব্বক বিষয় ভোগের ব্যবস্থা আছে। এই ভাবে বিষয় ভোগের ফলে ইন্দ্রিয়গণ সংযত হয় এবং ভোগবাসনা কমিয়া আসে। তখন প্রথমে বানপ্রস্থ, পরে সন্ন্যাস। বানপ্রস্থ আশ্রমে আংশিকভাবে বিষয় পরিত্যাগ, এবং সন্ন্যাস আশ্রমে সম্পূর্ণভাবে। বাসস্থান নাই, আহার সংগ্রহের চেষ্টা নাই, এক দিক ধরিয়া সোজা চলিয়াছেন। আত্মীয়-স্বজন বা দেহ কিছুমাত্রে আত্মবুদ্ধি নাই। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেহের যখন পতন হয়, তখন আত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া যায়। মনুসংহিতাতে সন্ন্যাস অবস্থার সুন্দর বর্ণনা আছে এবং ভাগবতে ইহার বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণের পক্ষে এইরূপ নিয়ম বিহিত হইলেও যাঁহাদের ভোগ-বাসনা স্বভাবতঃই অতিশয় ক্ষীণ, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন, "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ", যেদিন বৈরাগ্য হইবে সেইদিনই প্রব্রজ্যা করিবে। এইভাবে শঙ্করাচার্য্য গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবেশ না করিয়াই সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব সুখের সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

বিষয়ভোগ ছাড়িয়া ব্রহ্মলাভের পথ বা উপায় কঠোপনিষদ বর্ণনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে একটি উপমা প্রয়োগ করা হইয়াছে। রথারূঢ় ব্যক্তি যেরূপ গন্তব্য স্থলে গমন করে, সাধক সেই ভাবে বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। সাধকের সহিত রথারূঢ় ব্যক্তির তুলনা হইয়াছে, শরীরের সহিত

রথের তুলনা হইয়াছে, বুদ্ধির সহিত সারথির তুলনা হইয়াছে, মনের সহিত অশ্বরজ্জুর তুলনা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়ের সহিত অশ্বের এবং বিষয়ের সহিত সঞ্চরণ-ভূমির তুলনা হইয়াছে।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ (কঠোপনিষদ্)

অশ্বের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় পথ ছাড়িয়া মাঠে গিয়া তৃণ ভোজন করা। সারথি তাহাকে বল্গা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া রথারূঢ় ব্যক্তির গন্তব্য স্থলে উপনীত হয়। সেইরূপ বুদ্ধি মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া সাধনার পথ ধরিয়া মোক্ষপদে উপনীত হয়।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥

যে ব্যক্তি বিজ্ঞানকে (বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিকে) সারথি এবং মনকে প্রগ্রহরূপে ব্যবহার করিতে পারেন, তিনি সংসারগতি পার হইতে বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন।

যতক্ষণ বাহ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ থাকে ততক্ষণ মৃত্যুভয় অতিক্রম করা যায় না। যতক্ষণ ব্রহ্মদর্শন না হয় ততক্ষণ বাহ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বিনষ্ট হয় না। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে ব্রহ্মদর্শন না হইলে অমৃতত্ব লাভ করা যায় না।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽনায় (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্)

কেবলমাত্র তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায় মোক্ষলাভের কোনও উপায় নাই।

বলা বাহুল্য ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে একাগ্রতা বিশেষ প্রয়োজন। যখন সকল বিষয়েই সিদ্ধিলাভের জন্য একাগ্রতা আবশ্যক তখন সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার—ঈশ্বরলাভের সাধনায় একাগ্রতা যে একান্ত আবশ্যক হইবে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। শ্রুতিও এবিষয়ে বলিয়াছেন,

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ (মুণ্ডকোপনিষদ্)

যেরূপ ধনুর সাহায্যে শরে বেগ সঞ্চারিত করিয়া লক্ষ্যবেধ করিতে হয়, সেইরূপ প্রণবের সাহায্যে আত্মাতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া আত্মাকে ব্রহ্মসমীপে উপনীত করিয়া ব্রহ্মের সহিত যুক্ত করিতে হইবে। যেরূপ লক্ষ্যবেধ করিতে হইলে লক্ষ্যে তন্ময় হইতে হয়, সেইরূপ ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে ব্রহ্মে তন্ময় হইতে হইবে।

শ্রুতি পুনশ্চ বলিয়াছেন

তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ (মুণ্ডকোপনিষদ্)

"সেই ঈশ্বরকেই নিজ আত্মা বলিয়া জান, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর।"

ঈশ্বরকে পাইতে হইলে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কথা আলুনা লাগে। চৈতন্যদেব দিবারাত্র কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গ করিতেন না। বিষয়প্রসঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত দেখা করিতে চাহেন নাই,—যে রাজা বিষয় ভোগ করে তাহার সহিত কিরূপে দেখা করিবেন ?

যদি কোনও বাহ্য বস্তু আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে, এবং সেই আকর্ষণের মধ্যে যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ অনুভব না করি তাহা হইলে সেই বস্তু ঈশ্বরলাভের পথের অন্তরায় বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য এই ভাবে বিচার করিলে আধুনিক সভ্যতার বহু গৌরবের বস্তুকে ঈশ্বরলাভের পথের অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেক আধুনিক উৎকৃষ্ট কাব্য ও উপন্যাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল কাব্য ও উপন্যাসে যদি ঈশ্বরপ্রসঙ্গ না থাকে, ইহাদিগকে পাঠ করিলে যদি চিত্ত ভগবদভিমুখী না হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে ঈশ্বরলাভের পথের অন্তরায় বলিতে হইবে। কারণ ইহারা সাধকের চিত্ত ভগবৎ প্রসঙ্গ হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। কেবলমাত্র প্রেমের চিত্রপূর্ণ সাহিত্যকে এইরূপ দোষ দিলে চলিবে না,—উপনিষদ-কৃত শ্রেয় এবং প্রেয় বিভাগে ইহারা ত প্রেয়ের মধ্যে পড়িবেই,—বিয়োগান্ত কাব্যের দুঃখবহুল চিত্রগুলিও সাধকের পক্ষে চিত্তবিক্ষেপকারী বুঝিতে হইবে; কারণ, পর দুঃখে সহানুভূতি করিবার আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে,—সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আমাদের ভাল লাগে। ইহার মধ্যে যদি কোনও ভগবৎ প্রসঙ্গ না থাকে, তাহা হইলে সাধকের উচিত এগুলি বর্জ্জন করা।

প্রশ্ন হইতে পারে—তাহা হইলে কি সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চর্চ্চা দেশ হইতে তুলিয়া দিতে হইবে? এগুলি কি অনিষ্টকর? ইহার উত্তর এই যে, যে সাধক ঈশ্বর লাভ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রসঙ্গহীন সাহিত্য ও বিজ্ঞান বর্জ্জন করিতে হইবে। এ বিষয়ে ত সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ, শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন "অন্যাবাচো বিমুঞ্চথ" ঈশ্বর ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গ ত্যাগ কর। কিন্তু সমাজের সকল ব্যক্তিই ঈশ্বরলাভকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করে না। যাহারা করে না, তাহাদের পক্ষে আলস্য অথবা সুখান্বেষণে সময় অতিবাহিত না করিয়া সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চর্চ্চা করা উচিত। কিন্তু সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে সর্ব্বদা ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখা উচিত। না করিলে সাহিত্য সমাজ-দেহে দুর্নীতিপূর্ণ গরল সঞ্চারিত করিতে পারে, এবং বিজ্ঞান মারাত্মক অস্ত্রোপকরণে নিজশক্তি নিযুক্ত করিতে পারে। আধুনিক জগতে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

যেরূপ সাহিত্য ঈশ্বরলাভের পথের অন্তরায় নহে তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে যেরূপ পাওয়া যাইবে, আর কোথাও সেরূপ পাওয়া যাইবে না। রামায়ণ ও মহাভারত সাহিত্য হিসাবে খুব উচ্চশ্রেণীর অথচ ঈশ্বরলাভের সহায়ক। ভগবান নরদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার লীলাপ্রসঙ্গ, তাঁহার মানবজীবন-সুলভ সুখদুঃখের কথা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া চিত্তকে ভগবদভিমুখেই অগ্রসর করিয়া দেয়। পুরাণগুলিও ভগবৎ-প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতকার একটু গল্প বলিতেছেন। যেমন চিত্ত সেই দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, অমনি চিত্তমধ্যে ঈশ্বরলাভের জন্য যত্নের প্রয়োজনীয়তা, অপর সকল চেষ্টার ব্যর্থতা গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতেছেন। আবার একটু গল্প শোনাইতেছেন, পুনরায় ঈশ্বরপ্রসঙ্গ। আদ্যোপান্ত এইভাবে চলিয়াছে। সমস্ত পুরাণটিকে একটি আধ্যাত্মিক চর্চ্চার ব্যায়াম-প্রণালী (a course of spiritual culture) বলা যাইতে পারে। এইভাবে দেখিলে পুরাণগুলির মধ্যে অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ দোষাবহ নহে,—ইহার সার্থকতা আছে। আধ্যাত্মিক সাধনার দিক হইতে গল্প শোনার একটা দোষ এই যে, ইহা চিত্তকে বাহ্য বিষয়ে আকৃষ্ট করে। অবশ্য যাঁহারা আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন দেখেন না, তাঁহারা ইহাকে দোষ বলেন না, এবং যে কাব্য যত অধিক পরিমাণে চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারে, তাহাকে তত উৎকৃষ্ট বলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধকের পক্ষে বাহ্য বিষয়ে চিত্তবিক্ষেপ দোষ বলিয়া ধরিতে

হইবে। পুরাণে অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ এই দোষ শিথিল করিয়া দেয়, এবং ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রাকৃত শক্তি অপেক্ষা অধিক, তাঁহার ইচ্ছা হইলে অপ্রাকৃত ঘটনাও ঘটিতে পারে, এই ভাব হৃদয়মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দেয়। পুরাণ ব্যতীত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ বিদ্যমান। কুমারসম্ভব হরগৌরীর প্রেমের কথায় পরিপূর্ণ: রঘুবংশে শ্রীরামচন্দ্রচরিত্রই রমণীয় উজ্জ্বলতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। উত্তর-রামচরিতের নায়ক শ্রীরামচন্দ্র। অবশ্য কতকগুলি কাব্যে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ অতি সামান্য, যেমন মেঘদূত। কাব্য হিসাবে ইহারা যতই উৎকৃষ্ট হউক, আধ্যাত্মিক সাধনার পক্ষে ইহাদিগকে অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক সাধনার অনুকূল সাহিত্য কেবল যে প্রাচীন যুগেই রচিত হইত তাহা নহে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে তুলসীদাস অমর কবি বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যে অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা কাব্যরসে যেমন পরিপূর্ণ, তেমনই আধ্যাত্মিক সাধনার অনুকূল প্রসঙ্গে সমৃদ্ধিশালী। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, রামপ্রসাদের সঙ্গীত ঈশ্বর প্রসঙ্গের সহিত কাব্যরসের সামঞ্জস্য করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই সমাজে বিশিষ্ট আদর লাভ করিতে পারিয়াছিল। আজকাল আমরা ধর্ম্মহীন শিক্ষালাভ করিয়া ধর্ম্মভাববর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছি, এজন্য ধর্ম্মভাবহীন চিত্তাকর্ষক কাব্যের অতিরিক্ত আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতিকূলতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, সাহিত্য ও বিজ্ঞান ভিন্ন বহু দ্রব্য আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে। এই ফুলটির রূপ ও গন্ধ আমার চিত্ত আকৃষ্ট করিতেছে, ইহা দেখিয়া যদি আমার মনে ইহার স্রষ্টা ভগবানের কথা স্মরণ না হয়, তাহা হইলে ইহা আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতিকূল। এ জন্য হিন্দু মনে করে ফুল দিয়া ভগবানের পূজা করিলেই ফুলের সার্থকতা। সমুদ্র দেখিয়া আমার চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু সে ভাবপ্রবাহ যদি আমাকে ভগবানের দিকে অগ্রসর করিয়া না দেয়, তাহা হইলে সমুদ্র দর্শন আমার আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতিকূল হইবে। এ জন্য হিন্দু সমুদ্রতীরে ভগবানের মন্দির স্থাপন করিয়াছে এবং এইভাবে সমুদ্র দর্শনে চিত্তের আকুলতার সহিত ঈশ্বর-চিন্তা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে। পুত্র-কন্যাকে আদর করিবার সময় চিত্ত স্নেহরসে অভিষিক্ত হইয়া যায়, কিন্তু ঐ স্নেহরসের

মধ্যে যদি ঈশ্বর চিন্তা না থাকে; তাহা হইলে ঈশ্বরলাভের পথে উহা অন্তরায় হইবে। তাই হিন্দু ভগবানের বা ভগবতীর কোনও প্রিয় নাম দিয়া পুত্রকন্যার নামকরণ করে এবং যশোদার পুত্রবাৎসল্য এবং মেনকার কন্যার প্রতি অনুরাগ নিজ পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়।

রামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ।

ভারতে যখন ইংরাজি শিক্ষা প্রচারিত হইল, তখন ইংরাজি-শিক্ষিত কতকগুলি ভারতবাসী হিন্দুধর্ম্মে আস্থা হারাইয়া খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাহার পর যখন একটু আত্মসম্মান জাগ্রত হইল, তখন স্বধর্ম্মে আস্থাহীন হিন্দু বলিলেন,—আমরা খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিব না, হিন্দুধর্ম্ম সংস্কার করিয়া লইব, উপনিষদের ব্রহ্মকে উপাসনা করিব, ঈশ্বরের অবতার হয় এ কথা মানিব না প্রতিমাপূজা মানিব না জাতিভেদ মানিব না, কারণ এ সকল কুসংস্কার। যাঁহারা এই মত গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা দুই পাতা ইংরাজি পড়িয়া গীতা ভাগবতকে ভুল বলিয়া স্থির করিলেন, কারণ গীতা ভাগবতে ঈশ্বরের অবতারের কথা আছে—শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্যকে প্রকারান্তরে মূঢ় বলিয়া মানিয়া লইলেন কারণ ইঁহারা প্রতিমাপূজা করিয়াছেন। এইভাবে তাঁহারা বিজাতীয় মনোভাবের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অঙ্গকে অস্বীকার করিলেন, এই সময়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব হইল। তিনি সাধারণ নিরক্ষর পূজারিরূপে জীবন সূত্রপাত করিলেন। রামপ্রসাদ সেনের সাধনাকে তিনি নিজ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আচার পালন করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অনুসারে প্রমাণ করিলেন যে, তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনা সত্য। তাহার পর তিনি বৈষ্ণব মতে সাধনা করিলেন এবং প্রমাণ করিলেন যে, পুরাণের কথা মিথ্যা নহে। তাহার পর অদ্বৈত মতে সাধনা করিয়া যোগসমাধি লাভ করিলেন এবং দেখাইলেন যে, অদ্বৈতমার্গ এবং যোগমার্গ সত্য।

রামকৃষ্ণের জীবন ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটি মতের প্রতিবাদ করিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে পুরাণ ও তন্ত্র মিথ্যা, ঈশ্বরের অবতার হইতে পারে না, প্রতিমাপূজা

অনিষ্টকর। রামকৃষ্ণের জীবনে ইহা প্রমাণিত হইল যে, পুরাণ ও তন্ত্র সত্য, ঈশ্বরের অবতার হইতে পারে, প্রতিমাপূজা ঈশ্বরলাভের সহায়ক। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মাধর্ম্মাবলম্বী। সুতরাং রামকৃষ্ণের সাধনা তাঁহার মনোমত হয় নাই। তিনি কত বিষয়ে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কত অখ্যাত বা অল্পখ্যাত সাধুকে বিখ্যাত করিয়াছেন,—কিন্তু রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনও কবিতা বা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, চৈতন্যদেব সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু লেখেন নাই। রামকৃষ্ণের বৈরাগ্যসাধন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ—এ সকল কথাও রবীন্দ্রনাথের মতের বিপরীত। যাহা হউক, যখন রামকৃষ্ণ-জয়ন্তীর আয়োজন হইল এবং জয়ন্তীর কর্ত্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, রামকৃষ্ণের নামে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মত প্রচার করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সে সুযোগ উপেক্ষা করিলেন না।

জয়ন্তীর ধর্ম্ম সংঘে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিলেন যে, ধর্ম্মের নিম্নভূমিতে এক ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মকে আক্রমণ করে এবং ইহা অন্যায়। "In the low land of traditions religions challenge and refute each other's dogmas." কিন্তু এই দোষ কি রবীন্দ্রনাথের রচনায় সমধিক লক্ষিত হয় নাই? যে শক্তিপূজার দ্বারা রামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই শক্তিপূজা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেন নাই,—"এককালে পুরুষ দেবতা ছিলেন, তাঁহার বিশেষ কোন উপদ্রব ছিল না, খামকা মেয়ে দেবতা এসে জোর করে বায়না ধরলেন—আমার পূজা চাই"? চণ্ডী বা দুর্গা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তি—যে শক্তি ন্যায় অন্যায় জানে না, সুবিধার খাতিরে সত্য মিথ্যা ভেদ করে না, যেন তেন প্রকারে ছোটকে বড় করে দেয়, তার জন্য যোগ্য হবার দরকার নেই—কেবল করজোড়ে তার স্বরে বলতে হবে—মা—মা—মা।" শক্তিপূজায় পশুবলি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বলপূর্ব্বক দুর্ব্বলকে বলি" দেওয়া। কালীমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"উলঙ্গ নিদারুণতা।" (১৩২৬ সালের আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাসের "প্রবাসী"তে রবীন্দ্রনাথের "বাতায়নিকের পত্র" প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহাতে রবীন্দ্রনাথ এই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।)

রবীন্দ্রনাথের হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষ শক্তি পূজার নিন্দায় সীমাবদ্ধ হয় নাই। বৈষ্ণব পুষ্প ও নৈবেদ্য দ্বারা বিষ্ণু পূজা করে, রবীন্দ্রনাথ তাহার নিন্দা করিয়াছেন, ধনী ভক্ত অলঙ্কার দ্বারা দেববিগ্রহ সাজায়, রবীন্দ্রনাথ তাহা

দূষণীয় মনে করেন। মন্দির নির্ম্মাণ করা তিনি অর্থের অপব্যয় বলিয়াছেন। হিন্দু মালাজপ করে, তিনি তাহাকে "পারলৌকিক কোম্পানির কাগজ" সংগ্রহের চেষ্টা বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। হিন্দুর দেবদেবী পূজাপদ্ধতি ও শাস্ত্রগ্রন্থের নিন্দা করিয়া, অবমান করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করেন। সুতরাং রামকৃষ্ণের জয়ন্তীতে তিনি যে পরম উদার ভাবে বলিয়াছেন,—"এক ধর্ম্মের লোক অন্য ধর্ম্মকে কেন নিন্দা করে, ইহা বড় অন্যায়," তাঁহার এ অভিনয় বড়ই কৌতুকপ্রদ। চোর চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছিল, সকলে চোর চোর বলিয়া ছুটিতেছে, চোরও তাহাদের সহিত চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিয়া যোগদান করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার দেখিয়া সেই গল্প মনে পড়ে।

এরূপ আশা করা অনুচিত হইবে না যে, অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ যাহাই করুন, অন্ততঃ রামকৃষ্ণ-জয়ন্তীতে—যেখানে কেহ কোনও ধর্ম্মের নিন্দা করিবে না বলিয়া সমবেত হইয়াছে, অন্ততঃ সেখানে—রবীন্দ্রনাথ পরধর্ম্মবিদ্বেষ সংযত করিয়া রাখিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ তাহা করিতে পারেন নাই,—স্বভাবের পরিবর্ত্তন করা বড় দুরূহ। তাই এখানেও রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"When religions travel far from their sacred sources they degenerate into utter emptiness crammed in the external habits and mechanical practices." অর্থাৎ যখন ধর্ম্ম উৎপত্তিস্থল হইতে দূরে আসে, তখন তাহা অসার হইয়া যায় এবং যুক্তিহীন আচার এবং বাহ্য অনুষ্ঠানে অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

অন্য ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্মের উৎপত্তি অধিক প্রাচীন—হিন্দু ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্যও কিছু বেশী; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই পুষ্পবৃষ্টি হিন্দু ধর্ম্মকে অবশ্যই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংস কালী মন্দিরের পুজারি হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলি কি সযত্নে পালন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন নাই? হিন্দুধর্ম্মের কোন্ কোন্ আচার-অনুষ্ঠানগুলি রামকৃষ্ণ অনর্থক ও বাহ্য আচার বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন? একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। মানসিক পবিত্রতা সাধন করিবার জন্য হিন্দু গঙ্গাজল ছিটাইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের মতে ইহা নিশ্চয়ই অর্থহীন বাহ্য অনুষ্ঠান। কিন্তু এ বিষয়ে রামকৃষ্ণের কি মত ছিল, তাহা স্বামী সারদানন্দ তাঁহার প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে এই ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"ঠাকুর গঙ্গাবারিকে বলিতেন ব্রহ্মবারি। বলিতেন গঙ্গাতীরে বাস করিলে দেবতুল্য অন্তঃকরণ হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি স্বতঃ স্ফুরিত হয়। বিষয় চিন্তায় যাহার হৃদয় কলুষিত হইয়াছে, তাহাকে বলিতেন—গঙ্গাজল খাইয়া আয়। বিষয়াসক্ত বদ্ধ মানব কোন স্থানে বসিয়া বিষয়-চিন্তা করিয়া তাহা কলুষিত করিলে তথায় গঙ্গাবারি ছিটাইয়া দিতেন।"

বস্তুতঃ পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ থাকিলে সেই ধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলি অর্থহীন অথবা অনর্থকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহাই পরধর্ম্ম-বিদ্বেষের পরিচায়ক। এই পরধর্ম্মবিদ্বেষকেই রবীন্দ্রনাথ হীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া নিন্দা করেন নাই কি? স্বধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করিলেই যে অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব জাগ্রত হইবে, এরূপ কোন কথা নাই, দৃষ্টান্ত—রামকৃষ্ণ স্বয়ং। সকল প্রকার আচার অনুষ্ঠানের বালাই বর্জ্জন করিলেই পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না,—দৃষ্টান্ত অগণিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক এবং রবীন্দ্রনাথ। যদিও হিন্দুধর্ম্ম স্মরণাতীত কালে উৎপন্ন হইয়াছে (আমাদের মতে হিন্দুধর্ম্ম অনাদি, কারণ ইহা সনাতন ধর্ম্ম), যদিও ইহা বহু সংখ্যক আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা বিজড়িত, তথাপি ইহা অন্তঃসারশূন্য হয় নাই, তাহার প্রমাণ শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি। ইহাঁরা সকলেই এই সকল আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়াছেন। বস্তুতঃ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই ধর্ম্মের প্রাণ বিদ্যমান থাকে, আচার-অনুষ্ঠান বর্জ্জন করিলেই ধর্ম্ম প্রাণহীন এবং অসার হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি পাঠ করিলে মনে হইবে যে, তাঁহার মতে ধর্ম্ম প্রাচীন হইলেই আবর্জ্জনাপূর্ণ হয়, ধর্ম্মের যখন উৎপত্তি হয়, তখন ইহা কল্যাণকররূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মের উৎপত্তিকালীন অবস্থাকেও তিনি নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন যে, primitive races of men believe that these ceremonials have a magic influence upon their deities. অর্থাৎ আদিম জাতি সকল মনে করে যে, তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি তাহাদের দেবতার উপর ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করিবে। হিন্দু ধর্ম্মের উৎপত্তি বেদে। বৈদিক যজ্ঞ দ্বারা দেবতা-দিগকে প্রসন্ন করা যায়, ইহা বেদের উক্তি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ইহা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সে জন্য কি এই ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে হেয় ভাবে প্রতিপন্ন করা উচিত হইয়াছে? তিনি কি ইহা জানেন না যে, ইহা কেবল প্রাচীন বন্য

জাতীয় লোকেরই বিশ্বাস নহে—শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্যেরও ইহা বিশ্বাস কারণ তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে, বেদবাক্য সত্য। তিনি নিশ্চয়ই জানেন না যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসেরও এই মত। কারণ রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য শাস্ত্র বেদোপনিষদ্" (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধক ভাব ১৮ পৃষ্ঠা)। বেদে এবং উপনিষদে এ কথা বহু স্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বৈদিক যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে প্রীত করা যায়। ধর্ম্মের আদিম যুগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কিরূপ হেয় ধারণা দেখা গেল। এই যুগ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের ধারণা অন্যরূপ। কারণ রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"সনাতন ধর্ম্ম ঋষিরা যা বলেছেন তাই থেকে যাবে"। কথামৃত ৫।১৩৭ পৃঃ।

রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্ম্মের উৎপত্তি অকল্যাণে, ধর্ম্মের পরিণতিও অকল্যাণে। সুতরাং বলা বাহুল্য, ধর্ম্ম হইতে পৃথিবীর অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে। একথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন,—"Every religion ends in a vast prisonhouse". অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম্মই বিশাল কারাগারে পরিণত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন প্রত্যেক ধর্ম্মই সত্য,—তোমার নিজের ধর্ম্ম প্রতিপালন কর—(ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইলে তাহার আচার অনুষ্ঠান অবশ্যই পালন করিতে হইবে), তোমার নিজের ধর্ম্ম পালন করিলেই তুমি ঈশ্বরলাভ করিতে পারিবে। রামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই এই কথা বলেন নাই যে, হিন্দু ধর্ম্মের যে সকল সাধন-পদ্ধতি এক্ষণে প্রচলিত আছে, সে সকল মন্দ। তিনি তাঁহার সমকালবর্ত্তী জীবিত ধর্ম্মসাধকদের উপদেশ অনুসারে আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণের আজীবন সাধনার ঠিক বিপরীত মত প্রচার করিয়া রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ-জয়ন্তীতে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন—ইহা তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ বলিয়াছেন,—"Religions whose mission is liberration of the soul have in some form or other been instrumental in shackling freedom of mind". অর্থাৎ যদিও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য আত্মার মুক্তির সাধন, তথাপি, ধর্ম্মই মনকে বন্ধন করিবার জন্য শিকল প্রস্তুত করিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভুলিয়া যাইতেছেন কেন যে, মন ও আত্মা ত' এক বস্তু নহে! মনকে বন্ধন করিলে কেন মুক্তি অসম্ভব? আমাদের মনে নানারূপ কামনা বাসনার উৎপত্তি হয়, আমাদের আত্মা তাহাতে জড়িত হইয়া পড়ে, আত্মার মুক্তিলাভের জন্য মনকে বন্ধন করিয়া স্থির করা প্রয়োজন। ইহা

কেবল হিন্দু ধর্ম্মের নহে, সকল ধর্ম্মেরই ইহা একটি মূল কথা। দুর্ভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথ সকল ধর্ম্মের একটি মূল তথ্য বুঝিতে না পারিয়া সকল ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রচার করিয়াছেন।

যদিও রবীন্দ্রনাথ সকল ধর্ম্মের উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার পুরাতন শত্রু হিন্দুধর্ম্মের কথাই তাঁহার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি বেশী মারিয়াছে। কারণ হিন্দু ধর্ম্মেই জন্ম দ্বারা অধিকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহা তাঁহার চক্ষে বড়ই অশোভন। জন্মকে তিনি একটা অহৈতুক ঘটনা বলিয়াছেন (accident of birth)। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য ধর্ম্মের লোকেরও জন্ম দ্বারা অনেক কিছুই নির্দ্দিষ্ট হয়। কেহ জন্মের জন্যই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া চিরজীবন সুখে কাটায়, কেহ জন্মের জন্যই চিরজীবন দুঃখ ও দারিদ্র্যে কাটায়। জন্মকে যদি অহেতুক ঘটনা বলা হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়—মানবের সুখ দুঃখের মধ্যে কেবল জন্মের জন্য যে এত পার্থক্য হয়, তাহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই, কেবল accident of birth-এর উপর নির্ভর করে। অতএব, হয় ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান নহেন, নয় তিনি খামখেয়ালী। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম অনুসারে ঈশ্বর জন্ম নির্দ্দেশ করেন, হিন্দু ধর্ম্মের এই মত গ্রহণ করিলে, এই সমস্যার মীমাংসা হয়, অন্য উপায়ে হয় না। ইহজন্মেও কর্ম্ম অনুসারে যেমন ইহ জন্মের কতকগুলি অধিকার নির্দ্দিষ্ট হয়, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম অনুসারে অন্য কতকগুলি অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের জন্ম অনুসারে অধিকার নির্দ্দেশ। বলা বাহুল্য, হিন্দুর জন্ম দ্বারা অধিকার নির্দ্দেশ গীতা-ভাগবত বেদান্ত প্রভৃতি হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, এবং রামকৃষ্ণ এই শাস্ত্রগুলি শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ জয়ন্তীতে বলিলেন যে, জন্ম অনুসারে অধিকার নির্দ্দেশ বড় মন্দ।

আত্ম-সংযম

টলষ্টয় বলিয়াছেন,—

There has not been and cannot be a good life without self-control. Apart from self-control no good life is imaginable. The attainment of goodness must begin with that

Essays and Letters, p. 76 ("The First Step".

"আত্ম-সংযম ব্যতীত কেহ কখনও ভাল লোক হয় নাই, কেহ ভাল লোক হইতে পারে না। আত্ম-সংযম ব্যতীত ভাল জীবন কল্পনা করা যায় না। ভাল হইতে হইলে প্রথমে ইহা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।"

উপবাস দেওয়া এই আত্ম-সংযমের খুব সহায়ক বলিয়া টলষ্টয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

Just as the first condition of a good life is self control, so the first condition of a life of self-control is fasting (p. 78, Ibid) "সাধুজীবনের পক্ষে আত্মসংযমের জন্য উপবাস সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয়।" হিন্দুধর্মে এত ব্রত উপবাসের ব্যবস্থা কেন, তাহার উত্তর টলষ্টয়ের উক্তিতে পাওয়া যাইবে। এই কারণেই হিন্দু বিধবার পক্ষে উপবাস দেওয়া এত প্রয়োজনীয় বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উপবাস ব্যতীত আত্মসংযম অসম্ভব! আত্মসংযম সকলের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু হিন্দু বিধবার পক্ষে আত্মসংযমের অভাব মৃত্যু তুল্য। এজন্য বিজ্ঞ চিকিৎসক যেরূপ তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করেন, সেইরূপ শাস্ত্রকার বিধবার পক্ষে নিয়মিতভাবে উপবাস দিবার বিধান দিয়াছেন।

উপবাসের প্রয়োজনীয়তা কেবল হিন্দুধর্ম্মই স্বীকার করিয়াছেন, এমন নহে। রোজার সময় মুসলমানগণ দিনের পর দিন দীর্ঘকাল উপবাস দিয়া থাকেন, ইহা সকলেই জানেন। খৃষ্টানধর্ম্মেও উপবাস দিবার ব্যবস্থা আছে। রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রোটেষ্টাণ্ট অপেক্ষা বেশী প্রবল। রোমান

ক্যাথলিকদেরও ধর্ম্মভাব এখনকার অপেক্ষা মধ্যযুগে (Mediaeval age) বেশী ছিল—এজন্য উপবাসেরও ব্যবস্থা প্রোটেষ্টাণ্ট অপেক্ষা রোমান ক্যাথলিদের মধ্যে বেশী, এবং রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যেও মধ্যযুগে ইহার আদর বেশী ছিল।

টলষ্টয় যে আত্মসংযমকে সাধু জীবনের মূল ভিত্তি বলিয়াছেন, হিন্দু-শাস্ত্রকারগণও তাহাকে সাধনার পথে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। কঠোপনিষদে আছে,—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥

শ্রেয় (যাহা কল্যাণকর) এবং প্রেয় (যাহা রুচিকর) ইহারা বিভিন্ন বস্তু। ইহারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য (মোক্ষ এবং ভোগ) লইয়া পুরুষের মন আকর্ষণ করে। যিনি শ্রেয় গ্রহন করেন তাঁহার মঙ্গল হয়। আর যিনি প্রেয় গ্রহণ করেন তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌসম্পরীত্যবিবিনক্তিধীরঃ।
শ্রেয়য়োহিধীরোঽভি প্রেয়সোবৃণীতে
প্রেয়ো মন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে॥

"শ্রেয় এবং প্রেয় মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরীক্ষা পূর্ব্বক উভয়ের প্রভেদ নির্দ্ধারণ করেন। এবং প্রের ত্যাগ করিরা শ্রেয় গ্রহণ করেন। যিনি অল্প-বুদ্ধি তিনি অপ্রাপ্ত দ্রব্য পাইবার জন্য এবং প্রাপ্ত দ্রব্য রক্ষণের জন্য প্রেয় গ্রহণ করেন।"

সাধকজীবনের সমস্ত ইতিহাস এই শ্রেয় এবং প্রেয়ের দ্বন্দের মধ্যে নিহিত আছে। জীবনের প্রায় প্রতি মুহূর্ত্তে দুইটি পথ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকে—যে পথে যাইতে ভাল লাগে এবং যে পথে যাওয়া কর্ত্তব্য। যিনি যে পরিমাণে ভাল লাগার পথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যের পথ গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাঁহার জীবন সেই পরিমাণে সফল হয়। শিশু জীবন হইতে এই দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়—তাহার লেখা পড়া করিতে ভাল লাগে না, দিনরাত্রি খেলা করিতে ভাল লাগে ঔষধ খাইতে ভাল লাগে না, পিতামাতার কথামত কার্য্য করিতে ভাল লাগে না। এই সময় হইতে তাহাকে শিখাইতে হইবে, ভাল লাগার পথ এক, কর্ত্তব্যের পথ আর। ইংরাজী, ইতিহাস বা ভূগোল শিক্ষা অপেক্ষা এই শিক্ষা

সহস্রগুণে অধিক মূল্যবান। বয়স যেমন বাড়িতে থাকে, এই শ্রেয় এবং প্রেয়ের দ্বন্দ্ব নূতন নূতন আকারে দেখা দেয়—ভাল বেশভূষা করিতে ভাল লাগে, উত্তেজক উপন্যাস পড়িতে ভাল লাগে, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিতে ভাল লাগে, ভোজনের বিলাস ভাল লাগে, ত্যাগের পথ ভাল লাগে না, ধর্মকথা ভাল লাগে না, সাধুসঙ্গ ভাল লাগে না। শ্রেয় এবং প্রেয়ের যে প্রশ্ন শিশুকালে ছেলেখেলার আকারে দেখা দেয়, বয়োবৃদ্ধির সহিত সে প্রশ্নের আকৃতি ক্রমশঃ গুরুতর হইতে থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা যে আত্মসংযমের কথা বলিয়াছি, তাহা এই শ্রেয় এবং প্রেয়ের প্রশ্ন ব্যতীত আর কিছু নহে। প্রেয় গ্রহণ করিতে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আমাদিগকে শ্রেয় গ্রহণ করিতে হইবে। এক কথায় আত্মসংযমের প্রয়োজন।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র ঃ—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। 'অথ' মানে অনন্তর। কিসের অনন্তর? শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক, ইহামুত্র ফল-ভোগ-বিরাগ, শমদমাদিসাধনসম্পদ্, মুমুক্ষুত্ব,—ইহাদের অনন্তর। ব্রহ্ম নিত্য বস্তু, আর সবই অনিত্য এই জ্ঞান হওয়া চাই। ইহকালে বা পরকালে ভোগের আকাঙ্খা ত্যাগ করা চাই। শমদম প্রভৃতি সাধন-সমূহের প্রয়োজন। এবং মোক্ষের ইচ্ছা হওয়ার প্রয়োজন। এইগুলি হইলে তবে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকার হয়। যাঁহার অধিকার হয় নাই তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান চেষ্টা বিপদ্জনক; কারণ, ঐ চেষ্টা বৃথা পাণ্ডিত্যে পরিণত হয়। কিছু শাস্ত্র আলোচনা করিয়া তিনি মনে করেন আমি খুব পণ্ডিত হইয়াছি। ব্রহ্মজ্ঞান ত লাভ হয় না, অধিকন্তু তিনি ভাবেন যে, সাধু জীবন যাপনের জন্য যে সকল নিয়মাবলি আছে সেগুলি তাঁহার মত পণ্ডিতের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে। অধিকারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট এইসব গুণাবলির মধ্যে আত্মসংযমের কথা যথেষ্ট আছে। আত্মসংযম শমদমাদি সাধনের অন্তর্গত। শমদমাদি সাধনের অর্থ এই যে, বিষয় ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়ের যে লালসা, তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়া রাখিতে হইবে, সুখদুঃখ শীত উষ্ণ প্রভৃতি বিপরীতধর্ম নির্বিকার ভাবে সহ্য করিতে হইবে, ভগবচ্চিন্তা অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকাল স্থিরভাবে অবস্থান করিতে হইবে; এবং গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে। অতএব আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা উক্ত সাধন-প্রণালীতে সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

মনুসংহিতাতে আত্মসংযমের কথা কি আছে অতঃপর তাহার আলোচনা করা যাইবে। এই আলোচনা একটু বিস্তৃত ভাবে করা হইবে। তাহার কারণ দুইটি। প্রথম কারণ এই যে, মনুসংহিতাতে এই আত্মসংযম প্রসঙ্গ অতি প্রাঞ্জল ও বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আজকাল পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে স্মৃতিশাস্ত্রের উপর একটা অনাস্থা হইয়াছে। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, স্মৃতিশাস্ত্র মানিয়াই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দুই একজন মনীষী এই অন্যায় কথা প্রথম প্রচার করেন; তাঁহাদের ভক্তগণ ইহা যৎপরোনাস্তি পল্লবিত করেন। তাহার ফলে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি নির্ব্বিচারে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সমাজে সংযমের অভাব, স্বেচ্ছাচার, বিলাস, ভোগাসক্তি এ সকলের মধ্যে তাঁহারা বিশেষ অনিষ্টকর কিছু দেখিতে পান না। তাঁহারা আক্ষেপ করেন, হিন্দুসমাজ বড় বেশী শাস্ত্র মানিয়া চলে বলিয়া। যে শাস্ত্র আত্মসংযম, ভোগ বাসনা ত্যাগ, সরল জীবনযাপন, ঈশ্বরপরায়ণতা, প্রভৃতির কথায় পরিপূর্ণ, যে শাস্ত্র সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

তস্মাৎশাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ

"কোন কার্য্য করা উচিত এবং কোন কার্য্য করা উচিত নয়, শাস্ত্র দ্বারাই তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।"

মানুষ কি ভাবে আত্মসংযম হারাইয়া থাকে, এ বিষয়ে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অধিকাংশ স্থলে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হয় বলিয়াই মানব আত্মসংযম হারায়। মানব ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়। অনেক সময় ইন্দ্রিয়গণ শত্রুর ন্যায় অনিষ্ট করে। এই কারণে হিন্দু শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়কে রিপু বলা হইয়াছে। আত্মসংযম করিতে হইলে সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজবশে রাখিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। তাই মহাত্মা মনু তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রায় প্রারম্ভেই ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা বলিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং॥ মনু ২।৮৮

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—ইহারা বিষয়। এই পাঁচটি বিষয় লইয়া বাহ্য জগৎ গঠিত হইয়াছে। বিষয়ের স্বভাব হইতেছে এই যে, তাহারা ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে—স্পর্শ ত্বক্ ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। সেইরূপ রূপ, রস এবং গন্ধ আমাদের চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে যথাক্রমে

আকর্ষণ করে। যিনি বিদ্বান, তিনি ইন্দ্রিয়ের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত করিতে চেষ্টা করিবেন। সংযত করিবার অর্থ—বিবেচনা পূর্ব্বক গুণ-দোষ বিচার করা; এবং যেখানে কোন দোষ নাই, কিংবা গুণ আছে, সেখানে ইন্দ্রিয়কে বিষয়াভিমুখে যাইতে দেওয়া; যেখানে দোষ আছে, সেখানে ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে বিরত করিয়া রাখা। কারণ, ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা ইন্দ্রিয়ের নাই। ইন্দ্রিয় বুঝিতে পারে কোন বিষয়টি 'প্রেয়'—কোনটি তাহার ভাল লাগে,—কোনটি 'শ্রেয়' তাহা সে বিচার করিতে পারে না। কোনটি শ্রেয় তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা আছে "বুদ্ধির"। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা বুদ্ধিপূর্বক স্থির করেন, কোন্ বিষয়টি শ্রেয় এবং কোন্‌টি শ্রেয় নহে; এবং সারথি তাহার অশ্বকে সংযত রাখিতে যে ভাবে যত্ন করে, বিদ্বান ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিতে সেইরূপ যত্ন করেন। অশ্বের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।ইন্দ্রিয়গণ অশ্বের ন্যায় বলশালী। প্রাণিতত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন যে, অশ্বের বুদ্ধি খুব কম; সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণেরও বিবেচনা করিবার ক্ষমতা নাই। সারথি যদি একটু অসাবধান হয়, অশ্ব যদি একবার তাহার বশের বাহিরে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে পথ-বিপথ-জ্ঞানশূন্য হইয়া অশ্ব প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলিও সেইরূপ একবার বশাতীত হইলে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয়। এজন্য সারথি যেরূপ সর্বদা অবহিত হইয়া অশ্বকে সংযত করিয়া রাখে, জ্ঞানী ব্যক্তিরও সর্বদা সাবধান হইয়া সেইরূপ ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া রাখা উচিত। ইন্দ্রিয় যে কেবলমাত্র দুষ্ট বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া বিপদ ঘটায় তাহা নহে, ন্যায্য বিষয়েও ইন্দ্রিয় যদি অত্যধিক আকৃষ্ট হয় তাহা হইলেও সর্বনাশ হইতে পারে,—যেমন ঠিক পথেও অশ্ব যদি অত্যধিক এবং অসংযত বেগে ধাবিত হয়, তাহাতেও সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে। এই সব কারণে অশ্বের সহিত ইন্দ্রিয়ের উপমা দেওয়া অতি সুন্দর হইয়াছে। বস্তুতঃ এ উপমা মনু মহারাজের কল্পিত উপমা নহে। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার উপনিষদ হইতে উপমাটি আহৃত হইয়াছে। সেখানে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ উপমার মধ্যে এই উপমাটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এজন্য সেই স্থান হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহুঃ বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ (কঠোপনিষদ্)

শরীরের সহিত রথের তুলনা হইয়াছে। আত্মা রথীর ন্যায়, সে বসিয়া থাকে, ভোগ করে নিজে কিছু করে না! বুদ্ধি হইতেছে সারথি। কোন্ পথে যাইতে হইবে, বুদ্ধি তাহা বিবেচনা করিয়া স্থির করে। বুদ্ধি যাহা স্থির করে মন তাহা চায়, এবং ইন্দ্রিয়গুলি সেইদিকে চালিত হয়। এজন্য মনকে বল্গার সহিত এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়গুলি রথের চতুষ্পার্শবর্ত্তী ভূমির ন্যায়।

স্থির হইল যে ইন্দ্রিয়-সংযম করা প্রয়োজন। এক্ষণে ইন্দ্রিয়গুলি কি বস্তু, তাহার পরিচয় লওয়া যাউক।

> শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
> পায়ূপস্থং হস্তপদং বাক্ চৈব দশমী স্মৃতা॥ মনু ২।৯০

শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষুঃ জিহ্বা নাসিকা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় বা বুদ্ধীন্দ্রিয়। মলদ্বার, জননেন্দ্রিয়, হস্ত, পদ ও বাক্য এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়।

> একাদশং মনোজ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকং।
> যস্মিঞ্জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গুণৌ॥ মনু ২।৯২

মনটি একাদশ ইন্দ্রিয়। ইহা কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ই। মনকে জয় করিতে পারিলে অন্য দশটী ইন্দ্রিয়ই জয় করা যায়। মনে যখন আমাদের বিষয়-বিশেষের প্রতি আকাঙ্খা হয়, তখন সেই বিষয় উপভোগক্ষম ইন্দ্রিয় সেই বিষয় অভিমুখে অগ্রসর হয়। মনে কি আকাঙ্ক্ষা হইবে না হইবে তাহা যদি আমাদের ইচ্ছাধীন হয়, যদি আমাদের মনে কোন অন্যায় বাসনার আবির্ভাব না হয়, তাহা হইলে কোন ইন্দ্রিয়ের অন্যায্য প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যুগপৎ দশটী ইন্দ্রিয়কে পরিরক্ষণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার। আমি হয় ত খুব দৃঢ় হইয়া আছি যে, কোন কুখাদ্য খাইব না বা কুস্থানে যাইব না; কিন্তু একটা রাগের কথা বাহির হইয়া গেল। কিন্তু আমি যদি কোন অন্যায় চিন্তা মনে আসিতে না দিই, তাহা হইলে দশটি ইন্দ্রিয়ই বাধ্য হইয়া সংযত থাকে। এজন্য বাহ্য আচরণ অপেক্ষা মনের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে বেশী সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। যাঁহারা বলেন যে স্মৃতি শাস্ত্র কেবল বাহ্য আচারের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তি যে যর্থার্থ নহে তাহা এই শ্লোক হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

ইন্দ্রিয় সংযম জীবনের উদ্দেশ্য নহে। ইহা উপায় মাত্র। কিন্তু ইহা কেবল

আধ্যাত্মিক জীবন লাভে সহায়তা করে এমন নহে, ইহা সর্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভের সহায়ক।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ং।
সংনিযম্যতু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিয়চ্ছতি॥ ২৯৩

"ইন্দ্রিয়ে আসক্তি থাকিলে নিশ্চয়ই দোষ হইবে। সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিলে (সকল চেষ্টাতেই) সিদ্ধিলাভ করা যায়।"

সংসারে যে সকল দ্রব্যাদি লোকে পাইতে চেষ্টা করে, হিন্দুশাস্ত্রে সেগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। পরের উপকার করা, যাগযজ্ঞ করা, সাধারণতঃ পুণ্যকার্য্য মাত্র—ধর্মের অন্তর্গত। বিষয়, সম্পত্তি, খ্যাতি-প্রতিপত্তি এই সব অর্থের অন্তর্গত। উত্তম আহার্য্য, পানীয়, বেশ-ভূষা, গৃহ-শয্যা প্রভৃতি কামের অন্তর্গত। এবং ঈশ্বর লাভ—যাহাতে সকল দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয় এবং অনন্তকাল অসীম সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়—যাহা পরম পুরুষার্থ—তাহাই মোক্ষ। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ লাভ করিবার উপায় বিভিন্ন গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নির্দিষ্ট পথে চলিলে তদ্বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইবে। কিন্তু যাঁহার যাহাই উদ্দেশ্য হউক, সকল পথেই ইন্দ্রিয় সংযম অত্যন্ত সহায়ক।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মনে কোন বাসনার উদয় হইলে সে বাসনা ভাল না হইলেও তাহা মিটাইয়া লওয়াই ভাল ; নচেৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অন্তরায় উপস্থিত হয়।

কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। বাসনা অন্যায় হইলে কিছুতেই তাহা চরিতার্থ করা উচিত নয়। কারণ, একবার চরিতার্থ করিলে ঐ বাসনার নিবৃত্তি হয় না —প্রত্যুত উহা অধিকতর বলবতী হয়। মনু মহারাজ ইহা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবর্দ্ধতে॥ ২।৯৪

কাম্য বিষয় ভোগের দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না। দুষ্ট বাসনা চরিতার্থ করিয়া তাহা প্রশমিত করিবার ইচ্ছা, এবং ঘৃত ঢালিয়া আগুন নিবাইবার চেষ্টা একইরূপ। মহাকবি শেক্সপিয়রের ভাষায় "Appetite grows by what it feeds on" অর্থাৎ "খাদ্য পাইয়া ক্ষুধা আরও বাড়িয়া উঠে।"

দুইটি উপমার মধ্যে মনুর উপমাটি অধিকতর সমুজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়।

অতিশয় ভোগও ভাল নয়, অতিশয় ত্যাগও ভাল নয়। গীতা উভয়ের নিন্দা করিয়াছেন।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্ত মনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥

অত্যধিক ভোজন এবং অত্যল্প ভোজন, অত্যধিক নিদ্রা এবং অত্যল্প নিদ্রা কিছুই ভাল নয়। কিন্তু কোনটা বেশী খারাপ তাহা এখানে বলা হয় নাই। মনু এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

যশ্চৈতান্‌প্রাপ্নুয়াৎ সর্বান্ যশ্চৈতান্ কেবলাংস্ত্যজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্ব কামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে॥ ২।৯৫

সকল বিষয় ভোগ অপেক্ষা সকল বিষয় ত্যাগ করা ভাল।

যিনি অতিশয় ত্যাগী তাঁহার ভুল ভালর দিকেই—erring on the right side। গীতার শেষ অধ্যায়ে—কর্মসন্ন্যাসযোগ প্রসঙ্গে ইহা উক্ত হইয়াছে যে, একান্ত ত্যাগের পথেও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে—

শব্দাদীন্বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ॥
ধ্যানযোগপরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ। ১৮, ৫১-৫২

"শব্দ প্রভৃতি বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া, রাগদ্বেষ, পরিহার করিয়া, নির্জনস্থানে বাস করিয়া, স্বল্প আহার করিয়া, বাক্য শরীর এবং মন সংযত করিয়া, সর্বদা ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া, বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া"—এ পথেও সাধক "ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে"—ব্রহ্ম লাভ করেন। তবে গীতার উদ্দেশ্য এইরূপ যে, কর্ম ত্যাগ পূর্বক সিদ্ধিলাভ করা অপেক্ষা কর্ম সম্পাদন পূর্বক সিদ্ধিলাভ করিবার পথ অপেক্ষাকৃত সহজ।

অত্যধিক ত্যাগের পথ যে সর্বোৎকৃষ্ট পথ নহে, তাহা মনুও বলিয়াছেন। মনে দুষ্ট বাসনার উদয় হইলে তাহা চরিতার্থ করা উচিত নয়। কিন্তু চরিতার্থ না করিলেই ঐ দুষ্ট বাসনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না—অপদেবতার ন্যায় দুষ্ট বাসনা প্রায়ই উঁকিঝুঁকি মারিয়া যায়। দুষ্ট বাসনা হইতে একান্ত নিষ্কৃতি পাইতে হইলে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়—তাহা জ্ঞান। তাই মনু বলিয়াছেন,—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ। ২।৯৬

বিষয়ে আসক্ত ইন্দ্রিয়গুলির সেবা না করিলেই যে তাহাদিগকে সংযত করা যায় তাহা নহে। তাহাদিগকে সংযত করিবার উপায় জ্ঞান।

সে জ্ঞান কিরূপ—কুল্লূকভট্ট তাহা টীকাতে প্রাঞ্জল করিয়া দিয়াছেন।

বিষয়াণাং ক্ষয়িত্বাদিদোষজ্ঞানেন শরীরস্য
চ অস্থিস্থূলাদিদোষ চিন্তনেন।

"যখনই কোন বিষয় ভোগ করিতে প্রবল বাসনা হয়, তখনই চিন্তা করিতে হইবে যে, ভোগের বিষয় চিরস্থায়ী নহে, তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; দেহ অস্থি-মাংসের সমষ্টি মাত্র—এজন্য ভোগে আসক্তি থাকা উচিত নহে, এবং দেহের অতিরিক্ত আদর করিতে নাই।" এইরূপ বার বার চিন্তা করিলে ঐরূপ দৃঢ় প্রত্যয় হয়। তখন ইন্দ্রিয়াসক্তি আপনা হইতে কমিয়া যায়।

এইরূপে যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন, মনু তাঁহার এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন।

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা সবিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২।৯৮

যে মানব (কোন বিষয়) শ্রবণ করিয়া, স্পর্শ করিয়া, দর্শন করিয়া, ভোজন করিয়া বা ঘ্রাণ করিয়া হর্ষ বা বিষাদ প্রাপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়। যিনি জিতেন্দ্রিয় নহেন, তিনি ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয় ভোগ করিলে হর্ষ প্রাপ্ত হন, প্রতিকূল বিষয় ভোগ করিলে বিষাদ প্রাপ্ত হন। যিনি জিতেন্দ্রিয় তিনি অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয় ভোগ করিলে কোনরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য অনুভব করেন না।

জিতেন্দ্রিয় হইতে হইলে সকল ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে। একাদশটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দশটি ইন্দ্রিয় জয় করিয়া যদি কেহ একটিমাত্র ইন্দ্রিয় জয় করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলা যাইবে না। ঐ একটিমাত্র অবশীভূত ইন্দ্রিয় তাহার সাধনার পথে বিষম অন্তরায় হইবে,—এমন কি তাঁহার সমগ্র সাধনা ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে।

ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্বেষাং যদ্যেকংক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্যক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাদাদিবোদকন্॥২।৯৯

"সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি একটিমাত্র ইন্দ্রিয় বিষয়ভোগপ্রবণ হয়, তাহা হইলে সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার প্রজ্ঞা (ধৈর্য্য বা জ্ঞান) নষ্ট হয়। চর্মপাত্রে

জল রাখিলে, যদি সেই পাত্রে একটিমাত্র নিঃসারণ পথ থাকে, তাহা হইলে ঐ পথে সমস্ত জল নিঃসারিত হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ।”

বশেকৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্ ॥২।১০০

“ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত করিয়া এবং মন সংযমন পূর্ব্বক সকল বিষয়ে সাধনা করিতে হয়। ইন্দ্রিয় বশীভূত করিবার সময় যাহাতে শরীরের অধিক ক্লেশ না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।”

বহু দিবসের অভ্যাসের ফলে যাহার আহার-বিহারাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়প্রবণতা বা বিলাসিতা কিছু পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, তিনি যদি হঠাৎ সমগ্র বিলাস পরিত্যাগ করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহার শরীরে হয়ত তাহা সহ্য হইবে না। এজন্য তাঁহাকে শরীরকে ক্রমশঃ সহাইয়া ত্যাগের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। নচেৎ শরীরে সহ্য না হইলে সাধনার পথে প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইবে।

বিদ্যার গৌরব।

(আধুনিক ও প্রাচীন)

বিদ্যালাভ জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ইহা উপায় মাত্র। যিনি অর্থ সঞ্চয় করিতে চাহেন, তিনি অর্থনীতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া জানিতে পারেন, কি উপায়ে প্রভূত অর্থাগম হইতে পারে। যিনি পুণ্য সঞ্চয় করিতে চাহেন, তিনি বেদের কর্ম্মকাণ্ড হইতে জানিতে পারেন, কি ভাবে যজ্ঞাদি করিলে পুণ্য সঞ্চয় হইবে। এই ভাবে সকল বিদ্যাই কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের সহায়ক বলিয়াই প্রয়োজনীয়।

উপায়ের গৌরব উদ্দেশ্যের গৌরব অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। এজন্য কোন বিদ্যার গৌরব, সেই বিদ্যা যাহার সাধন, তাহার গৌরব অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। যেমন অর্থনীতিবিদ্যার গৌরব অর্থগৌরব অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। সকল বিদ্যার গৌরব সমান নহে। যে বিদ্যার উদ্দেশ্যে

ঈশ্বরলাভ, তাহা স্বভাবতঃই, যে বিদ্যার উদ্দেশ্যে অর্থলাভ, তদপেক্ষা অধিক গৌরবের বিষয়। এই ভাবে উদ্দেশ্যের প্রভেদ অনুসারে বিদ্যার গৌরবের তারতম্য হইবে।

কথাগুলি সহজ। কিন্তু এ সকল কথা অনেক সময় সকলের মনে থাকে না। আজকাল বিদ্যার গৌরবের কথা প্রায়ই শোনা যায়,—যেন বিদ্যা মাত্রই আদরণীয়, যেন বিদ্যালাভই জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে—সকল বিদ্যার সমান আদর হওয়া উচিত নহে,—কোন বিদ্যার আদর বেশী হইবে, কোন বিদ্যার আদর কম হইবে। আবার অবস্থা বিশেষে কোন বিদ্যার আদর না করিয়া অনাদর করা উচিত। বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, কোন বিদ্যা লাভ করিয়া কিরূপ ফল হওয়া সম্ভব, এবং কিরূপ ফল হইতেছে। বিদ্যা চর্চ্চা করিলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানমাত্রই যে বাঞ্ছনীয় নহে, একটা দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। যে ব্যক্তির আত্মসংযম নাই, তাহার পক্ষে সুরা প্রস্তুত করিবার প্রণালীর জ্ঞান বাঞ্ছনীয় নহে। আবার একটি জ্ঞান এক ব্যক্তির পক্ষে অশুভজনক হইলেও, অপর ব্যক্তির পক্ষে শুভজনক হইতে পারে। যিনি চিকিৎসক,—অল্প মাত্রায় সুরা প্রয়োগ করিয়া ব্যাধি নিবারণ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে সুরা প্রস্তুত করিবার জ্ঞান বা বিদ্যা শুভজনক হইবে। ইহাই বিদ্যার অধিকার ভেদ। একই বিদ্যা অধিকার ভেদে কাহারও পক্ষে শুভ, কাহারও পক্ষে অশুভ হইতে পারে। অধিকারী বিশেষে শুভাশুভ বিদ্যার দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। যেমন, চোরের পক্ষে, কোন্ গৃহস্থের ঘরে কত অর্থ সঞ্চিত আছে, কিরূপে এমন যন্ত্র নির্ম্মাণ করা যায় যাহার দ্বারা দরজায় বা দেয়ালে নিঃশব্দে বৃহৎ ছিদ্র করা যায়, কিংবা লৌহ সিন্দুক ভাঙ্গিতে পারা যায়—এ সকল বিদ্যা অশুভজনক। বিলাসী এবং শক্তিশালী "সভ্য" জাতির পক্ষে, কোথায় কোন দুর্বল জাতি আছে, তাহাদের কি দোষ আছে যাহার ছল ধরিয়া তাহাদের দেশ অধিকার করা যায় এবং বাণিজ্য বিস্তার করিবার সুবিধা পাওয়া যায়,—এই সব বিদ্যা অশুভজনক। চক্রান্তী জমিদারের পক্ষে আইনের জ্ঞান অশুভজনক, যদি সেই আইন-জ্ঞানের সাহায্যে তিনি প্রজার স্বত্ব অন্যায় ভাবে দখল করেন।

মনে হইতে পারে যে, অশুভ বিদ্যার অশুভত্ব অতি সুস্পষ্ট,—দুষ্ট লোক ব্যতীত কেহ অশুভ বিদ্যার চর্চ্চা করিবেন না; অতএব এ বিষয়ে সাবধান করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সকল বিদ্যার অশুভত্ব সুস্পষ্ট নহে। স্বার্থপরতা, দীর্ঘ-

কালের সংস্কার বা বিদ্যার আপাতরমণীয় নামের প্রভাবে অনেক সময় আমাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়, তাহার ফলে অনেক সময় অশুভ বস্তুকে অশুভ বলিয়া বোধ হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আজকাল পাশ্চাত্য দেশসমূহে Patriotism বা স্বজাতিপ্রীতি অনেক সময় পরজাতি বিদ্বেষে পরিণত এবং সেইরূপে অভিব্যক্ত হয়। Patriotism এই আপাতরমণীয় নামের প্রভাবে অনেকে ভুলিয়া যান যে, ইহা সংঘবদ্ধ স্বার্থপরতা মাত্র।(১) দলবদ্ধ স্বার্থপরতার একটা বিপদ আছে, যে বিপদ ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার মধ্যে নাই। কোন ব্যক্তি একা কোন স্বার্থপরতামূলক কার্য্যে লিপ্ত হইলে, সাধারণতঃ তাঁহার এরূপ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে না যে, তিনি অতি মহৎ কার্য্য করিতেছেন। কারণ, তাঁহার প্রতিবেশীগণ তাঁহার সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিবে, তাহার দ্বারা, তাঁহার নিজের এরূপ ভ্রম হইলে, তাহা সংশোধিত হইবে। কিন্তু দেশের সকলে মিলিয়া যদি একটা স্বার্থপরতামূলক কার্য্যে রত হয়, তাহা হইলে সকলেই মনে করিতে পারে যে, তাহারা অতি মহৎ কার্য্য করিতেছে। এক্ষেত্রে কাহারও দ্বারা তাহাদের ভ্রম-সংশোধনের অবকাশ থাকে না। এই ভাবে সকলের পক্ষে আত্ম-প্রবঞ্চনা সম্ভবপর। তখন স্বজাতির স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং অন্য জাতির অনিষ্টসাধনের জন্য বিজ্ঞান (science) ভূগোল (geography), অর্থনীতি (political economy) এই সকল বিদ্যার অপব্যবহার হইতে পারে। তথাকথিত সভ্য জাতিরা দুর্বল জাতির মধ্যে আজকাল যে ভাবে বাণিজ্য বিস্তার করেন, তাহাতে এই সকল বিদ্যার অপব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কলকারখানা, রেল, ষ্টীমার, মোটর প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। Banking, Exchange, Large scale

(১) টলষ্টয় বলিয়াছেন—I have several times expressed the thought that in our day the feeling of patriotism is an unnatural, irrational and harmful feeling and a cause of the great part of the ills from which mankind is suffering.

"আমি বহুবার বলিয়াছি যে আজকাল স্বজাতি-প্রীতি সম্বন্ধে সাধারণের মনোভাব অস্বাভাবিক, যুক্তিবিরুদ্ধ এবং অনিষ্ট-জনক। মনুষ্যজাতির অনেক দুঃখকষ্টের কারণ এই স্বজাতিপ্রীতি।"

production প্রভৃতি বিষয়ে অর্থনীতির বহু সিদ্ধান্ত এই বাণিজ-বিস্তার-ব্যাপারে আবশ্যক হয়। কিন্তু ইহার ফল কি হয়? দুর্বল জাতি প্রাচীন উপায়ে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছিল, সভ্য জাতি তদপেক্ষা বহু সুলভে সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করেন। এ কারণে দুর্ব্বল জাতির শিল্পিগণ যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহা বিক্রীত হয় না,—জীবিকার অভাবে তাহারা নিরতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। অনেক স্থলে সভ্য জাতি তাহাদের পণ্য যে দরে বিক্রয় করে, তাহাতে নিজেদেরও লাভ থাকে না। তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে যে, কিছুদিন যদি ক্ষতি সহ্য করিয়াও দুর্ব্বল জাতির শিল্প নষ্ট করিতে পারা যায়, তাহা হইলে পরে বিদেশী দ্রব্য না হইলে যখন তাহাদের চলিবে না, তখন মূল্য বাড়াইয়া প্রচুর লাভ করিতে পারা যাইবে। ফলতঃ এইরূপে সভ্য জাতির বাণিজ্য বিস্তারে দুর্ব্বল জাতির সমূহ ক্ষতি হয়। ইহাতে যে বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি বিদ্যার প্রয়োগ হয়, তাহা অশুভজনক। সভ্য জাতির যে সকল ব্যক্তি এই সকল বিদ্যার চর্চ্চা করেন, তাঁহারা একটা আত্মপ্রাসাদ লাভ করিতে পারেন যে, তাঁহারা জ্ঞানরাজ্যের সীমা বিস্তার করিতেছেন। দেশের লোকেও তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে পারে, কিন্তু এই বিদ্যা চর্চ্চার ফলে জগতে অশান্তি এবং অসুখের মাত্রাই বেশী হয়।

আজকাল বিদ্যাবলে মানুষ রেল, ষ্টীমার, মোটর, এরোপ্লেন তৈয়ার করিয়াছে, ফটোগ্রাফ, বায়স্কোপ, গ্রামোফোন প্রভৃতি কত নূতন কল প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু ইহাতে মানুষের হৃদয়ের উন্নতি হইয়াছে কতটুকু? উন্নতি বোধ হয় কিছুই হয় নাই; বরং অবনতি হইয়াছে। একটা বড় কুফল হইয়াছে—আজকাল সভ্যসমাজে লোকে টাকাকে খুব বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। কারণ, টাকা না হইলে এ সকল কিছুই হয় না, আর এ সকল না হইলে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না! অতএব টাকা চাই। ব্যয়বহুল বিলাসিতা সভ্যজীবনে এত বেশী পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে যে, ইহাতে যে কিছু অন্যায় থাকিতে পারে, অনেকের তাহা মনেই হয় না। মোট কথা আজকাল বিজ্ঞানের যেরূপ চর্চ্চা হইতেছে, তাহাতে সমাজে ভোগ-বিলাসের প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। আমার বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, আধুনিক বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে মানবসমাজের কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু মোটের উপর উপকার অপেক্ষা অপকারই যেন বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে মনে হয়। ডাক্তারকে রোগীর নিকট লইয়া যাইতে যতগুলি মোটরের ব্যবহার

হয়, তদপেক্ষা অনেক বেশী মোটরের ব্যবহার হয় জুয়াড়ীদিগকে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে লইয়া যাইতে, থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখিতে, অথবা শুদ্ধ বাবুগিরি করিয়া বেড়াইবার জন্য। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট স্থানে শস্য যোগাইয়া রেলগাড়ী সমাজের যে উপকার করে, তাহার চেয়ে অনেক বেশী অপকার করে কলের তৈয়ারি সস্তা কাপড় গ্রামে গ্রামে বিলাইয়া দরিদ্রের জীবিকা স্বরূপ চরকা এবং তাঁত বন্ধ করিয়া, এবং অনশনক্লিষ্ট দেশ হইতে খাদ্য শস্য রপ্তানি করিবার সুবিধা করিয়া দিয়া। এমন কি, কলের ছাপাখানাতেও যে অপকার অপেক্ষা উপকার বেশী হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ছাপাখানায় যে সকল পুস্তক ছাপা হয়, তাহার মধ্যে কতকগুলিতে ধর্ম্ম এবং মানবহৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক বিষয় আলোচিত হয়, এবং কতগুলিতে মানবের পশুবৃত্তির উত্তেজক বিষয় থাকে, তাহার সংখ্যা লইলে এ বিষয়ে সত্যনির্ণয় করা যাইবে। (২) বিজ্ঞানের সাহায্যে নানা বিলাসের উপকরণ প্রচলিত হইবার ফলে জমিদারগণ নিজ গ্রাম ছাড়িয়া বড় সহরে আসিয়া বাস করেন, এবং নানাবিধ বিলাসের জন্য প্রজার শোণিততুল্য অর্থ অজস্র পরিমাণে ব্যয় করেন। এদিকে কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতির অভাবে গ্রামবাসিগণ পরিষ্কার জল পান করিতে পারে না। জলের অভাবে কৃষি-কার্য্যের ক্ষতি হয় এবং গ্রামে নানাবিধ কঠিন পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়। আধুনিক বিজ্ঞান যেন ধনীর বন্ধু, দরিদ্রের শত্রু। ধনীর বন্ধু এইজন্য যে বিজ্ঞান নানাবিধ

(২) গান্ধীজি লিখিয়াছেন ;—Formerly the fewest men wrote books that were most valuable. Now any body writes and prints anything he likes and poisons people's minds. (Indian Home Rule)

"পূর্ব্বে অতি অল্প সংখ্যক লোক গ্রন্থরচনা করিতেন এবং সে সকল গ্রন্থ অতি মূল্যবান হইত। আজকাল যে কেহ যাহা ইচ্ছা লিখিয়া ছাপায় এবং লোকের মন বিষাক্ত করে।"

এ বিষয়ে বিখ্যাত লেখক Frederick Harrisonএর On the Choice of Books প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। তিনি বলিয়াছেন যে, আজকাল বাজে পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। কোন্ পুস্তক পাঠ করিতে হইবে তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিয়া পশ্চাতে পাঠ করা উচিত। নির্বিচারে যে কোন পুস্তক পাঠ করা অতি কু-অভ্যাস।

কলকারখানার সৃষ্টি করিয়া ধনীর প্রভূত অর্থাগমের বহু নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছে, নানাবিধ বিলাসের সরঞ্জাম যোগাইতেছে; ব্যাধি প্রতিকারের অনেক বহুমূল্য চিকিৎসার প্রবর্ত্তন করিতেছে; সে সকল চিকিৎসা এত ব্যয়সাধ্য যে দরিদ্রের আয়ত্তের বহির্ভূত। অপর পক্ষে কলের প্রচলন হওয়াতে দরিদ্রের জীবিকার উপায় বন্ধ হইয়াছে, কিংবা জীবিকার জন্য তাহাকে সম্পূর্ণভাবে ধনীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে—ধনীর কলে কাজ না করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের উপায়ান্তর নাই। আধুনিক বিজ্ঞান যুদ্ধ-বিগ্রহের যে সকল মারাত্মক সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার ফলে কেবল যে ভীষণ লোকক্ষয় হইতেছে তাহা নহে, তাহার ফলে ধনী জাতি কর্ত্তৃক দরিদ্র জাতির উপর অত্যাচার করিবার অধিকতর সুযোগও হইয়াছে। এই সকল কারণে বোধ হয় যে, আধুনিক বিজ্ঞান মানব সমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হয় নাই; এবং যাঁহারা বিজ্ঞান-চর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা যদি মনে করেন যে, তাঁহারা কোন মহৎ কার্য্য করিতেছেন তাহা হইলে তাহা তাঁহাদের বুঝিবার ভ্রম। প্রকৃত কথা বোধ হয় তাহার বিপরীত।

আবার কতকগুলি বিদ্যা আছে, যেগুলিকে নিস্ফলা বিদ্যা বলা যায়। আজকাল অনেক নিষ্ফলা বিদ্যারও যথেষ্ট আদর দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, পূর্বে বলিয়াছি, আজকাল বিদ্যার ফলাফল বিচার করা হয় না। বিদ্যা হইলেই তাহার আদর হয়, সে বিদ্যাটি পরাবিদ্যা, অবিদ্যা বা কুবিদ্যা তাহা কেহ দেখেনা। একটি নিস্ফলা বিদ্যার উদাহরণ Pure Mathematics (বিশুদ্ধ গণিত)। অনেক পণ্ডিত সারা জীবন ধরিয়া কেবল অঙ্কই কসিতেছেন। সে অঙ্কে কাহারও কোন উপকার নাই, তাহাতে কাহারও প্রকৃত জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হয় না। Science for science's sake, knowledge for knowledge's sake (বিদ্যার জন্যই বিদ্যা চর্চ্চা)। এইরূপ নিষ্ফলা বিদ্যার উদাহরণ। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি জীবনের কি উদ্দেশ্য তাঁহা ভুলিয়া গিয়া মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে উপায়কে উদ্দেশ্য বলিয়া, ভ্রম করেন, পন্থাকেই গন্তব্যস্থান বলিয়া মনে করেন। এইরূপ নিস্ফলা বিদ্যাকে লক্ষ্য করিয়া টলষ্টয় বলিয়াছেন :—

It (Science) triumphantly tells him how many million miles it is from the earth to the sun; at what rate light travels through space; how many million vibrations of ether per second are caused by light and how many vibrations of air by sound; etc.

"বিজ্ঞান বহু আড়ম্বরের সহিত প্রচার করে, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব কত লক্ষ ক্রোশ, আলোক আকাশের মধ্যে কিরূপ বেগে ধাবিত হয়, আলোক আকাশে যে তরঙ্গ উৎপাদন করে তাহা প্রতি সেকেণ্ডে কয় লক্ষ বার কম্পন করে, শব্দ বাতাসে যে তরঙ্গ তুলে তাহাই বা কতবার কম্পন করে ইত্যাদি।"

পাশ্চাত্য দেশে যে চিরকাল ফলাফল বিচার না করিয়া বিদ্যামাত্রেরই প্রশংসা করা হইত তাহা নহে। খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রন্থে আছে যে, আদি মানব বৃক্ষের ফল খাইয়া স্বর্গ ভ্রষ্ট হইয়াছিল। মনে হইতে পারে, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইলে আদি মানবকে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হইবে কেন? কিন্তু সকল জ্ঞানই শুভ-জনক নহে। যে জ্ঞান অশুভজনক, এখানে সেরূপ জ্ঞানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য ইতিহাসে যাহা মধ্যযুগ (Mediaeval age) নামে পরিচিত, সে সময় পণ্ডিতগণ ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনাতেই সময় অতিবাহিত করিতেন। এই সময়কার Imitation of Christ নামক উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে, উচ্চ ধর্ম্মজীবন যাপনের জন্য বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া আবশ্যক নহে, বরং বিবিধ বিদ্যার অত্যধিক চর্চ্চাতে মানব লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারে,—তাহা আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে বাধাজনক। পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক যুগে বিদ্যামাত্রেরই নির্বিচারে প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। টলষ্টয়-প্রমুখ দূরদর্শী মহাত্মাগণ ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়না। বুদ্ধিমান পাশ্চাত্য সমালোচকগণ টলষ্টয়কে এক প্রকার প্রতিভাশালী উন্মাদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে বিবিধ বিদ্যার চর্চ্চা হইয়াছে সত্য। কিন্তু কখনও যে নির্বিচারে বিদ্যামাত্রেরই আদর করা হইয়াছে, এরূপ বোধ হয়না। প্রাচীন ভারতে সকল বিদ্যার মধ্যে চিরকাল ব্রহ্মবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং

অর্থাৎ, সকল বিদ্যার মধ্যে আধ্যাত্মবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাতেই ভগবানের প্রকাশ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

বিদ্যা হি কা? ব্রহ্মগতিপ্রদা যা

যে বিত্থার ফলে ব্রহ্মলাভ হয়, তাহাই বিত্থা নামের যোগ্য। অন্য বিত্থা বিত্থা নামের যোগ্যই নহে।

এ বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রসিদ্ধ—

তৎকর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিত্থা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম বিত্থান্যা শিল্পনৈপুণং ॥

তাহাকেই কর্ম বলা যায় যাহা কর্মফলরূপ বন্ধন সৃষ্টি করে না; তাহাকেই বিত্থা বলা যায় যাহা মুক্তি বা মোক্ষলাভের কারণ। অপর কর্ম কেবলমাত্র ক্লেশই উৎপন্ন করে। অপর বিত্থা শিল্পনৈপুণ্য ব্যতীত আর কিছু নহে। শিল্প কার্য্যে বুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োগ আছে—এই সকল বিত্থাচর্চ্চাতে সেইরূপ কেবলমাত্র বুদ্ধি ও কৌশলের ক্রীড়া আছে। তাহারা যখন মানব-মনকে ঈশ্বরাভিমুখে লইয়া যায় না, তখন সে বুদ্ধি ও কৌশল ব্যর্থ বলিতে হইবে।

বিত্থা শুভ ও অশুভ দুই রকমই আছে। কিন্তু শুভ বিত্থারও ঠিকমত চর্চ্চা না করিলে, তাহাতে শুভ ফল না হইয়া অশুভ ফল হইতে পারে। কারণ, বিত্থাচর্চ্চা এক প্রকার কর্ম। ভাল কর্মও খারাপ করিয়া করিলে তাহাতে মন্দ ফল উৎপন্ন হয়। আসক্তিপূর্ব্বক, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কোন বিদ্যার চর্চ্চা করিলে, তাহার ফলে একটা মোহ উৎপন্ন হইবে। তাহাতে মনের উন্নতি না হইয়া অবনতি হইতে পারে। যদি মনে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় বা মন বিলাসোন্মুখ হয়, যদি পরের দুঃখ দেখিয়া হৃদয় বিগলিত না হয়,—তাহা হইলে মনের অবনতি হইয়াছে বলিতে হইবে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি বিদ্বান বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিরাছেন, কিন্তু তাঁহার উক্তরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এমন হইতে পারে যে, ঠিক ভাবে বিত্থাচর্চ্চা হয় নাই বলিষা এই সব কুফল হইয়াছে। কারণ ঠিকভাবে বিত্থা চর্চ্চা করিলে বিনয়, উদারতা, সহানুভূতি এ সকল সদ্‌গুণাবলি অবশ্য বিকশিত হইবে। আমাদের প্রাচীন কালে, যাহাতে বিত্থাচর্চ্চা করিয়া দম্ভ অহঙ্কার প্রভৃতি কুফল উৎপন্ন না হয় এ বিষয়ে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হইত। এজন্য হিন্দু শাস্ত্রে বিত্থালাভ বিষয়ে অনেকগুলি বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন তেমন করিয়া কতকগুলি তথ্যলাভ করিলেই হইবে না। দেখিতে হইবে যে, বিত্থালাভের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও প্রকৃত উন্নতি লাভ হয়। শান্ত সংযত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে গুরুর নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। চিত্ত হইতে অহঙ্কার সম্পূর্ণ ভাবে বর্জ্জন করিতে হইতে—বোধ হয় এজন্তই ব্রহ্মচারীকে দ্বারে দ্বারে

ভিক্ষা করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হইত। গুরুকে নিরতিশয় ভক্তি করিতে হইবে। বিলাস ত্যাগ করিতে হইবে। শরীরকে কষ্টসহ করিতে হইবে। এ বিষয়ে মনুসংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির প্রণিধানযোগ্য—

ব্রহ্মারম্ভেঽবসানে চ পাদৌ গ্রাহ্যৌ গুরোঃ সদা।
সংহত্যহস্তাবধ্যেয়ং সহি ব্রহ্মাঞ্জলিঃ স্মৃতঃ॥ মনু ২।৭১

বেদ পাঠের আরম্ভে এবং শেষে গুরুর পাদ বন্দন করিবে। উভয় কর একত্র করিয়া পাঠ করিবে। ইহাকে ব্রহ্মাঞ্জলি কহে।

অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষচর্য্যাং অধঃ শয্যাং গুরোর্হিতং
আ সমাবর্ত্তনাৎ কুর্য্যাৎ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ॥ ২।১০৮

ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইলে গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত প্রভাতে ও সায়ংকালে হোম করিবে, ভিক্ষা করিবে, খাটের উপর শুইবে না এবং গুরুর সেবা করিবে।

লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব চ।
আদদীত যতো জ্ঞানং তং পূর্বমভিবাদয়েৎ॥ ২।১১৭

যাঁহার নিকট লৌকিক, বৈদিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিবে, তাঁহাকে প্রথমে অভিবাদন করিবে।

সাবিত্রীমাত্র সারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
না যন্ত্রিতস্ত্রি বেদঽপি সর্বাশী সর্ববিক্রয়ী॥ ২।১১৮

যে ব্রাহ্মণের আচরণ শাস্ত্রানুযায়ী, তিনি যদি কেবলমাত্র গায়ত্রী মন্ত্র জানেন তাহাও ভাল, কিন্তু সকল বেদ পাঠ করিয়াও তিনি যদি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন বা বিক্রয় করেন, তাহা হইলে ভাল নহে।

বর্জয়েন্মধু মাংসং চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তাণি যানি সর্বাণি প্রাণিনাং চৈব হিংসনং॥ ২।১৭৭

মদ্য, মাংস, গন্ধ, মাল্য, স্ত্রী—এ সকল ভোগ করিবে না। মিষ্ট দ্রব্য টক হইয়া গেলেও আহার করিবে না; প্রাণিহিংসা করিবে না।

অভ্যঙ্গমঞ্জনং চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণং।
কামং ক্রোধং চ লোভং চ নর্ত্তনং গীতবাদনং॥ ২।১৭৮

তৈল মর্দন করিবে না, চক্ষুতে কজ্জলাদি দিবে না, পাদুকা এবং ছাতা ব্যবহার করিবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, এবং নৃত্য-গীত-বাদ্য বর্জন করিবে।

একঃ শয়ীত সর্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎক্কচিৎ।

কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥ ২।১৮০

সর্বত্র একাকী শয়ন করিবে, কোথাও শুক্র ফেলিবে না। ইচ্ছাপুর্ব্বক শুক্রপাত করিলে ব্রত ভঙ্গ হয়।

উদকুম্ভং সুমনসো গোশকৃন্মৃত্তিকাকূশান্।

আহরেত্থাবদর্থানি ভৈক্ষং চাহরহশ্চরেৎ॥ ১৮২

গুরুর প্রয়োজন অনুসারে কলসে করিয়া জল আনিবে, এবং পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা এবং কুশ আহরণ করিবে। প্রত্যহ ভিক্ষা করিবে।

শরীরং চৈব বাচং চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি চ।

নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেৎ বীক্ষমাণো গুরোর্মুখং॥ ২।১৯২

দেহ, বাক্য মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয় এই সকল নিয়মিত করিয়া গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া করযোড় করিয়া বসিয়া থাকিবে।

হীনান্নবস্ত্রবেশঃ স্যাৎসর্বদা গুরু সন্নিধৌ।

উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমংচাস্য চরমং চৈব সংবিশেৎ॥ ২।১৯৪

গুরু সমীপে সর্ব্বদা গুরু অপেক্ষা হীন অন্ন বস্ত্র এবং বেশ গ্রহণ করিবে। গুরুর পূর্ব্বে উত্থান করিবে, পরে উপবেশন করিবে।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যা মাদদীতাববাদপি।

অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥ ২।২৩৮

শূদ্রের নিকট হইতেও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুভবিদ্যা গ্রহণ করিবে, চণ্ডালের নিকট হইতেও মোক্ষ লাভের উপায় শিক্ষা করিবে, নিকৃষ্ট কুল হইতেও উত্তম স্ত্রী গ্রহণ করিবে।

এ বিষয়ে মনুসংহিতাতে আরও আরও অনেক শ্লোক আছে। তাহাতে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সুসংযত ভাবে বিলাস ত্যাগ করিয়া বিনীত চিত্তে অধ্যয়ন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল প্রাচীন আদর্শ আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। ছাত্রদের মধ্যে বিলাস এবং স্বেচ্ছাচার ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছে। বোধ হয় আজকাল শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষার প্রণালী উভয়েরই অবনতি হইয়াছে। এজন্য "উচ্চ" শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যেও ঔদ্ধত্য, অসংযম এবং স্বেচ্ছাচার অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণের জীবনবৃত্তি

সমাজের সর্ব্ববিষয়ক কল্যাণের জন্য চারিটি শ্রেণী বা বর্ণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুদীর্ঘ সাধনার দ্বারা ঋষিগণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া এই কল্যাণজনক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন। এজন্য ইহাও বলা হয় যে, স্বয়ং ভগবান্ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিবেন এবং সমাজে ধর্ম্মভাব প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন; ক্ষত্রিয়গণ রাজ্য শাসন করিবেন, দেশে শান্তিরক্ষা করিবেন এবং বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবেন; বৈশ্যগণ কৃষি, গোপালন, ব্যবসা প্রভৃতির দ্বারা দেশের আর্থিক অভাব মোচন করিবার চেষ্টা করিবেন; এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। চারি বর্ণের চারি প্রকার বৃত্তিই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। কেহই নিজ বৃত্তির জন্য লজ্জিত হইবেন না। প্রত্যেক বর্ণের বৃত্তি স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং তাহা পালন করিয়া সমাজের সেবার দ্বারা ভগবানেরই সেবা করা হয়, ইহা মনে করিয়া সকলে যত্নপূর্ব্বক নিজ বৃত্তি পালন করিবেন, এবং নিজ সন্তানগণকে সেই বৃত্তি পালন করিবার অনুরূপ শিক্ষা দিবেন। মধ্যে মধ্যে বৈলক্ষণ্য দেখা গেলেও সাধারণতঃ পুত্রকন্যাগণ পিতামাতার অনুরূপ গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার উপর যদি তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে পুত্রকন্যাগণ বড় হইলে সর্ব্বতো-ভাবে পিতামাতার অনুরূপ বৃত্তি পালন করিবার উপযোগী হয়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। সাধারণ নিয়ম অনুসারেই সামাজিক ব্যবস্থা প্রণীত হইয়া থাকে। বিশেষ কারণ অনুসারে মধ্যে মধ্যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। কিন্তু সেজন্য ইহা বলা যায় না যে, সাধারণ নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা প্রণয়ন করা নিরর্থক।

ধর্ম্ম প্রচার করা যখন ব্রাহ্মণের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন তাহার এরূপভাবে জীবন যাপন করা উচিত, যাহাতে ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। অহিংসা ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ,—"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"। জগতের ব্যপার আলেচেনা করিলে দেখা যায় যে, প্রায়ই বলশালী প্রাণী দুর্ব্বল প্রাণীকে বধ করিয়া আহার করে। জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে—সর্ব্বত্রই এই ভাবে দুর্ব্বল প্রাণীর উপর

অত্যাচার চলিতেছে। সাধারণ প্রাণীর ন্যায় মানবের ও এইরূপ দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে। কিন্তু যিনি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করিবেন, তাঁহাতে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার হইতে বিরত থাকিতে হইবে। এজন্য মনু বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণকে এরূপভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে—যাহাতে কোনও প্রণীর উপর অত্যাচার না হয়।

"অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি ॥' ৪২

"যেরূপ ভাবে জীবনযাত্রা করিলে কোনও প্রাণীর পীড়া হয় না, অথবা অল্পমাত্র পীড়া হয়, ব্রাহ্মণ সেইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিবে। তবে আপৎকালে এই নিয়ম রক্ষা করা কঠিন হইতে পারে।"

এই নিয়ম অনুসারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৃত্তির নাম 'উঞ্ছশিল'। পথে বা ক্ষেত্রে যে ধান্যাদি পড়িয়া থাকে, তাহাই এক একটি করিয়া কুড়াইয়া আনিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাকে 'উঞ্ছশিল' বলা হয়। ইহাকে যখন জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে হইবে হইবে যে, সে সময় জীবিকা খুব সচ্ছল ছিল, এবং সমাজে পরপীড়াবর্জ্জন সম্বন্ধে খুব উচ্চ আদর্শ পোষণ করা হইত। উঞ্ছশিল বৃত্তির অপর নাম হইতেছে 'ঋত'। এই বৃত্তি ঋত বা সত্যের ন্যায় ফলদায়ক বলিয়া ইহাকে ঋত বলা হইত। ঋত বা উঞ্ছশিল অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট বৃত্তি হইতেছে, অযাচিত দানগ্রহণ। এই বৃত্তির অপর নাম 'অমৃত'। অযাচিত দান অমৃতের ন্যায় সুখকর বলিয়া ইহার নাম অমৃত। প্রাচীনকালে ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করা সমাজের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এজন্য অনেক গৃহস্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন। উঞ্ছশিল এবং অযাচিত দান গ্রহণ, এই দুইটি বৃত্তি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, ইহাতে কাহাকেও পীড়ন করা হয় না। এই দুই জীবিকার কিছু নিকৃষ্ট বৃত্তি ভিক্ষা। ইংরাজী পড়িয়া আমরা শিখিয়াছি যে, যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিতে পারে, তাহাকে ভিক্ষা দেওয়া এবং তাহার পক্ষে ভিক্ষা গ্রহণ করা অতিশয় গর্হিত। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুসমাজে ভিক্ষা-গ্রহণ ব্রাহ্মণের বৈধ জীবিকারূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। কৃষি, বাণিজ্য এবং চাকুরী করা অপেক্ষা ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আমরা একটু বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, এই প্রাচীন মতটি যুক্তিযুক্ত ছিল। সকল সমাজেই অর্থ-সম্পত্তি অসমানভাবে বিতরিত হয়। এমন কতকগুলি

লোক থাকে—যাহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ উপার্জ্জন করে। এই প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ তিন ভাবে ব্যবহার হইতে পারে,—প্রথম দান, দ্বিতীয় বিলাস, তৃতীয় সঞ্চয়। দান যদি সৎপাত্রে করা হয়, তাহা হইলে ইহাই অর্থের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার। সৎপাত্রের দুইটি লক্ষণ থাকা চাই—সৎস্বভাব এবং দারিদ্র্য। যিনি ধর্ম্মালোচনা, ধর্ম্মজীবন যাপন এবং ধর্ম্মপ্রচারই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছেন, যিনি তাঁহার সমস্ত চেষ্টা এই উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত করিয়াছেন, এমন কি, নিজের জীবিকার জন্যও চেষ্টা করেন না তাঁহার অপেক্ষা সৎপাত্র আর কে? আজকাল এত প্রকার বিলাসের উপকরণ হইয়াছে যে, যাহারা যথেষ্ট উপার্জ্জন করে, বিলাসে তাহাদের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া যায়, দানের নামে তাহারা বিরক্ত হয়। গ্রহীতার দিক হইতে দেখিলেও যে ব্রাহ্মণ ভিক্ষাই জীবিকারূপে গ্রহণ করেন, তাঁহার মনে কখনও অহঙ্কার আসিতে পারে না। তাঁহার জীবন বিলাসের দ্বারা দূষিত হয় না। ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট জীবিকা হইতেছে কৃষিকার্য্য। কৃষিকার্য্যে ভূমিস্থিত। অনেক প্রাণী নিহত হয়। এজন্য তাহা নিন্দনীয় এবং স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে—"প্রমৃত"। কৃষি অপেক্ষা হীনবৃত্তি হইতেছে বাণিজ্য। তাহার কারণ এই যে, বাণিজ্যে মধ্যে মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। মনু বাণিজ্য-বৃত্তির নাম দিয়াছেন—"সত্যানৃত"। ইহা সত্য এবং মিথ্যার সংমিশ্রণ। বণিক কখনও সত্য কথা বলেন, আবার কখনও মিথ্যা বলিতে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বৃত্তি—যাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে,—তাহা হইতেছে সেবা বা চাকরের কার্য্য করা।

"সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।"

"সেবা বা চাকরী করা কুকুরের জীবন, এজন্য তাহা বর্জ্জন করিবে।" এই এক কথায় স্বাধীনতার কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পরাধীনতার প্রতি কি মর্ম্মান্তিক ধিক্কার ধ্বনিত হইয়াছে। চাকুরী করিলে কেবল দেহের নয়, মনেরও দাসত্ব প্রায় অনিবার্য্য। দাসসুলভ মনোভাব (Slave mentality) অতি ভয়ানক জিনিষ। "এইরূপ কথা বলিলে প্রভু খুসী হইবেন," "এই প্রকার বেশ পরিধান করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন," এইরূপ ভোজন, এইরূপ জীবনযাপন তাঁহার প্রিয়" দাসের পক্ষে ঈদৃশ চিন্তা প্রায় অপরিহার্য্য। এইরূপ মনোভাব হইলে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হয়। মনের স্বাধীনতা বা originality কিছুমাত্র থাকে না।

বর্ত্তমান সমাজে কৃষি, বাণিজ্য এবং চাকুরী এই তিনটির মধ্যে কৃষি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ. তাহার পর বাণিজ্য, এবং তাহার পর চাকুরী। কৃষিকার্য্যের দোষ এই যে ইচ্ছাকৃত না হইলেও বহু ক্ষুদ্র জীব হত্যা অনিবার্য্য। আমাদের দেশে একটি সংস্কার আছে ব্রাহ্মণের লাঙ্গল ঠেলিতে নাই, তাহার কারণ এই যে, হল চালনার সময় অনেক প্রাণিবধ হয়। কৃষি অপেক্ষা বাণিজ্য কিছু নিকৃষ্ট। বাণিজ্যে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয় এই দোষ, চাকুরী অতি হেয় কার্য্য! ভারতের অন্য প্রদেশবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালী বেশী চাকরী প্রিয় (আজকাল বোধ হয়, মান্দ্রাজীরা এ বিষয়ে বাঙ্গালীদিগকে ছাড়াইয়া যাইতেছে)। বেশভূষা, আহার-বিহার এমন কি, সমাজ এবং ধর্ম্ম বিষয়েও বাঙ্গালী অপর জাতি অপেক্ষা অনুকরণপ্রিয়। চাকরীপ্রিয়তা এবং অনুকরণপ্রিয়তা একই মনোবৃত্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি। আজ এই ঘোর জাতীয় দুর্দ্দিনে, বাঙ্গালী যদি এই দাস-সুলভ মনোভাব হইতে মুক্ত হইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার মনুপ্রচারিত মহামন্ত্র জপ করা উচিত,—

"সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।"

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ যে দুইটি বৃত্তি,—উঞ্ছশিল এবং অযাচিতদানগ্রহণ,—তাহাদের মধ্যে উঞ্ছশিলবৃত্তি আজকাল দেখা যায় না। অযাচিতদানগ্রহণরূপ বৃত্তি সমাজে বিরল হইলেও একেবারে লোপ পায় নাই। আজও অনেক বড় সাধু এই বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভাস্করানন্দ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ এবং তাঁহাদের অনেক শিষ্যরাও এই বৃত্তি দ্বায়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। দুঃখজ্বালাময় সংসারে এই সকল সাধুর পুণ্যজীবন মরুউদ্যানের ন্যায় সন্তাপহারক। যে সকল বস্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দুঃখ-মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় নহে, আমরা তাহাদের জন্য অস্থিরচিত্তে ছুটিয়া বেড়াই, তাহাদিগকে পাইবার চেষ্টায় কত নূতন দুঃখের সৃষ্টি করি,—আর যে সকল বস্তু জীবনরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, যাহাদের অভাবে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, যথা—আহার, আশ্রয় এবং শীতবস্ত্র,—সাধু মহাত্মাগণ সে সকল বস্তু পাইবার জন্যও কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না। ঈশ্বরের উপর কেমন করিয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হয়, ইঁহারা নিজের জীবনে তাহা দেখাইয়া দেন।

ইঁহাদের জীবনে আমরা প্রায়ই দেখি যে, অনেক শিষ্য আসিয়া উপস্থিত

হইয়াছে, তাহাদিগকে খাওয়াইবার কিছুই সংস্থান নাই, অথচ কোথা হইতে রাশি রাশি খাদ্যদ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তেমন করিয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিলে, ভক্তের অভাবমোচনের ভার ভগবান্ স্বয়ং গ্রহণ করেন গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

"যাহারা অপর সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমাকেই চিন্তা করে„ এবং আমার উপাসনা করে সেই সকল নিত্য মদেকনিষ্ঠ ভক্তদের যাহা অপ্রাপ্ত, তাহা প্রাপ্ত করাইবার, এবং যাহা প্রাপ্ত, তাহা রক্ষা করিবার ভার আমি নিজে বহন করি।"

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই ভাবে ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া জীবন-যাপন করিবার প্রণালীকে "আকাশবৃত্তি" বলিতেন। আকাশ হইতে জল পড়ে, তৃষ্ণা দূর করিব, নচেৎ নিজে জল আহরণ করিবার কোনও চেষ্টা করিব না, ইহাই আকাশবৃত্তি। যাহারা একান্ত অলসপ্রকৃতি, তাহাদের সহিত এই বৃত্তির অনেকটা সাম্য আছে। জগতে দুইটি একান্ত বিপরীত বস্তু প্রায়ই খুব কাছাকাছি আসিয়া থাকে। ইহা তাহারই একটি উদাহরণ। অত্যন্ত তমোভাবাপন্ন ব্যক্তি এবং আধ্যাত্মিকজগতের উচ্চতম শিখরে আরূঢ় ব্যক্তির বাহ্য আচরণ অনেক সময় একইরূপ হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়া মনু ব্রাহ্মণের জন্য কয়েকটি নীতি প্রচার করিয়াছেন।

"ন লোকবৃত্তং বর্ত্তেত বৃত্তিহেতোঃ কথঞ্চন।"

"জীবিকার জন্য লোকবৃত্তি গ্রহণ করিবে না।"

টীকাকার কুল্লুকভট্ট "লোকবৃত্ত" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "সাধারণ প্রিয়াখ্যানং বিচিত্রপরিহাসকথাদিকং" যে সকল কথা বলিলে সাধারণ লোক আহ্লাদিত হয় অথচ যাহাতে তাহাদের চরিত্রের কোনও উন্নতি হয় না। অর্থাৎ শ্রেয়ঃ-বর্জ্জিত প্রেয়। সাধারণ লোককে খুসী করাই যাহার উদ্দেশ্য হইবে, যাহাতে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করা যাইবে, সে তাহাই বলিবে, তাহাতে লোকের এবং নিজের উপকার হইবে, না অপকার হইবে, সে তাহা বিবেচনা করিবে না। অনেক সময় এইরূপ প্রসঙ্গ যে বলিবে, তাহার অবনতি হইবে এবং যে শুনিবে, তাহারও অবনতি হইবে। আজকাল একটা কথা শোনা যায়, Art for Art's

sake। যাঁহারা এই মত সমর্থন করেন, তাঁহারা বলেন, কবির উদ্দেশ্য হইবে কেবল রসসৃষ্টি করা বা আনন্দ বিতরণ করা; কবি তাঁহার রচনার মধ্যে সাধারণের শিক্ষার উপযোগী কোনও বস্তু গ্রথিত করিলে, Art বা শিল্প হিসাবে সে রচনার মূল্য কমিয়া যায়। কিন্তু কেবল লোককে খুসী করার চেষ্টা, বিশুদ্ধ Artএর চর্চ্চাকে মনু একটা জঘন্য বৃত্তি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, সাধারণ লোকের মনোবৃত্তি এইরূপ যে, এক দিকে তাহারা যেমন কতকগুলি শ্রেয়স্কর পদার্থ ভাল লাগে, আবার অপর দিকে কতকগুলি অকল্যাণকর পদার্থ আপাততঃ রুচিকর বলিয়া তাহাকে আকর্ষণ করে। ক্ষমা, দয়া, স্বার্থত্যাগ, ভগবদ্ভক্তির কাহিনী বলিয়া যেমন মানব মন রসসিক্ত করিতে পারা যায়, ইন্দ্রিয়সুখ, ভোগবিলাস' এবং ব্যভিচারের কথাতেও সেরূপ তাহাকে উপভোগ্য উত্তেজনা দেওয়া যায়। কেবল রস, কেবল আনন্দের সৃষ্টি করিব,—তাহার মধ্যে সুনীতি থাকে বা দুর্নীতি থাকে, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না,—এই মত গ্রহণ করিলে অকল্যাণকর জিনিষগুলি ত বাদ দিতে পারা যায় না। ফলেও যাঁহারা এই মত বেশী জোরে প্রচার করেন, তাঁহাদের রচনার মধ্যে শ্রেয়োযুক্ত প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়ঃ-পরিপন্থী প্রেয়ের আধিক্য থাকে। কারণ, শেষোক্ত দ্রব্যের উগ্রতা বেশী, এজন্য মানব-মন সহজেই অধিক পরিমাণে বিচলিত করিতে পারে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে সাত্ত্বিক সুখে প্রথমে কষ্ট, শেষে সুখ; রাজসিক সুখে প্রথমে সুখ, শেষে কষ্ট।

"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্" ॥১৮-৩৭

"যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় এবং পরিণামে অমৃতের ন্যায়, তাহা সাত্ত্বিক সুখ। বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে এই সুখ উৎপন্ন হয়।"

"বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাদ্যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ১৮-৩৮

"বিষয় (ভোগ্যবস্তু) এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা প্রথমে অমৃতের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায় কষ্টদায়ক, তাহা রাজসিক সুখ।"

Art for Art's sake এই নীতি অনুবর্ত্তন করিলে রাজসিক সুখের বাহুল্য অনিবার্য্য। সাত্ত্বিক সুখকে Artএর মধ্যে আনা কঠিন। কারণ, সাত্ত্বিক সুখের গোড়াতেই কষ্ট,—ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা—এই সকল কষ্টকর ব্যাপার সাত্ত্বিক

সুখের গোড়ার জিনিষ। অথচ চিত্ত আকর্ষণ না করিতে পারিলে Art বা শিল্প হয় না। সাত্ত্বিক সুখের অভ্যাসে যে কষ্ট আছে, সেই কষ্টে চিত্ত দ্রবীভূত করা, এবং আনন্দের অংশ সমুজ্জ্বল করিয়া তোলা উচ্চ অঙ্গের Artএর লক্ষণ। রাজসিক সুখের চিত্র অঙ্কিত করিয়া চিত্ত আকর্ষণ করা অপেক্ষা, সাত্ত্বিক সুখের চিত্র দ্বারা চিত্ত আকর্ষণ করা অধিকতর দুরূহ. ইহাতে কবির কৃতিত্ব অধিক। শুদ্ধসৌন্দর্য্যবাদী আধুনিক লেখকগণ এই তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া সমাজের যথেষ্ট অকল্যাণ সৃষ্টি করিতেছেন।

"ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্জেত কামতঃ।
অতিপ্রসক্তিং চৈতেষাং মনসা সংনিবর্ত্তয়েৎ॥ মনু ৪-১৫

উপভোগের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হইবে না। সংসারের অনিত্যতা, মানবদেহের পরিণাম প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে অতিরিক্ত আসক্তি নিবারণ করিবে।

"ন সীদেৎ স্নাতকো বিপ্রঃ ক্ষুধা শক্তঃ কথঞ্চন।
ন জীর্ণমলবদ্বাসা ভবেচ্চ বিভবে সতি॥" মনু৪-৩৪

সঙ্গতি থাকিলে ক্ষুধায় শরীরকে পীড়িত হইতে দিবে না। ছিন্ন এবং মলিন বস্ত্র পরিধান করিবে না।

"কৢপ্তকেশনখশ্মশ্রুর্দান্তঃ শুক্লাম্বরঃ শুচিঃ।
স্বাধ্যায়ে চৈব যুক্তঃ স্যান্নিত্যমাত্মহিতেষু চ॥" মনু ৪-৩৫

কেশ, নখ এবং শ্মশ্রু ছেদন করিবে, আত্মসংযম অবলম্বন করিবে, শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিবে, শরীর পবিত্র রাখিবে, শাস্ত্র পাঠ করিবে এবং যাহাতে নিজের কল্যাণ হয়, এরূপ আচরণ করিবে।

অনর্থক শরীরকে পীড়ন করিবে না, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবে, আন্তরিক পবিত্রতা এবং বাহ্য শৌচ উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, এই উদ্দেশ্যে উপরিলিখিত উপদেশগুলি দেওয়া হইয়াছে।

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥" মনু৪-১৩৮

যাহা সত্য এবং প্রিয়, তাহা বলিবে। যাহা প্রিয় নহে, তাহা সত্য হইলেও বলিবে না; যাহা সত্য নহে, তাহা প্রিয় হইলেও বলিবে না।

"যাহা প্রিয় নহে, তাহা সত্য হইলেও বলিবে না" এই উপদেশটি আপাততঃ উচ্চনীতিসঙ্গত বলিয়া মনে না হইতে পারে; কিন্তু অনর্থক কলহ ও অশান্তি

নিবারণ করা এই নীতির উদ্দেশ্য। "সত্য কথা বলব তাতে ভয় কি ?" এই বলিয়া অনেক কলহের সৃষ্টি করে। মনে করুন, এক ব্যক্তি কোনও স্থানে অপমানিত হইয়াছে। সেই অপমানের কথা অপরের সম্মুখে তাহাকে বলা উচিত নহে। এইরূপ স্থলে সত্য কথা অপ্রীতিকর বলিয়া বলা উচিত নহে। ছাত্র বা বালকদিগকে শিক্ষা দিবার সময় অপ্রীতিকর হইলেও সত্য কথা বলিতে হয়।

"বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্বিকীম্॥" মনু ৪-১৪৮

সর্ব্বদা বেদ পাঠ করিলে, পবিত্র জীবন যাপন করিলে, তপস্যা করিলে এবং কোনও প্রাণীর অনিষ্ট না করিলে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে।

"পৌর্বিকীং সংস্মরঞ্জাতিং ব্রহ্মৈবাভ্যসতে পুনঃ।
ব্রহ্মাভ্যাসেন চাজস্রমনন্তং সুখমশ্নুতে॥" মনু৪-১৪৯

যখন পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ হয় এবং ইহা দেখা যায় যে, বার বার সংসারে আসিয়া গর্ভবাস-দুঃখ ব্যাধি, শোক, জরা, মৃত্যু, প্রভৃতি কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তখন অন্তরে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং সংসারে সুখলাভ করিবার আশা ত্যাগ করিয়া মানব আগ্রহের সহিত ঈশ্বরলাভ করিবার জন্য ঈশ্বরবিষয়ক কথা শ্রবণ করে, সর্ব্বদা ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তা করে এবং মনকে দীর্ঘকাল ঈশ্বরবিষয়ে নিবিষ্ট রাখিবার চেষ্টা করে। এই সকল অভ্যাসের ফলে চিরকাল ধরিয়া অত্যন্ত সুখ পাওয়া যায়।

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥"মনু৪-১৬০

যে সকল দ্রব্য পরের অধীন, তাহারা সকলেই দুঃখজনক; যে সকল বস্তু নিজের অধীন, তাহারা সকলেই সুখকর। ইহাই সুখ এবং দুঃখের লক্ষণ।

"ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকাণং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ম্॥ মনু ৪১৭১

ধর্ম্মপথে থাকিয়া কষ্ট পাইলেও মন অধর্ম্মে নিবিষ্ট করিবে না। কারণ, যাহারা অধার্ম্মিক এবং পাপী, তাহারা পরিশেষে দুঃখ পায়।

"মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥ ৪-২৪১

আত্মীয়গণ মৃত ব্যক্তির শরীরকে কাষ্ঠ বা লোষ্ট্রের ন্যায় ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়। কেবল ধর্ম্মই পরলোকে মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে।

"তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সংচিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্॥" মনু ৪২৪২

এ জন্য সর্ব্বদা ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম সহায়ের জন্য সঞ্চয় করিবে। ধর্ম্ম সহায় হইলে দুস্তর নরকাদি দুঃখ উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

——— মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৪২

বলশেভিক ও হিন্দুধর্ম্ম

বলশেভিক-রুশিয়া পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিয়াছেন। সে বলে, ধূর্ত্তগণ নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য ধর্ম্ম নামক বস্তু উদ্ভাবন করিয়াছে, সকল সমাজেই নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তির সংখ্যা অধিক, এই সকল নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি পরলোকে পুরস্কার লাভ করিবার আশায় পুরোহিত এবং সন্ন্যাসীদিগকে অর্থ দান করে; ধর্ম্মের প্রভাবেই দরিদ্র ব্যক্তিগণ অভাব ও দুঃখের মধ্যেও সন্তুষ্ট থাকে, নচেৎ তাহারা ধনীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া নিজ অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করিত, যেমন রুশিয়াতে হইয়াছে; ধর্ম্মের সাহায্যে ধনী ব্যক্তিগণ আরাম ও বিলাসের মধ্যে তাহাদের জীবন অতিবাহিত করিতে পারে, দরিদ্র ব্যক্তিগণ উৎপাত করে না; এজন্য ধনিগণ ধর্ম্মের প্রতি সদয় এবং ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট অর্থদান করিয়া থাকেন।

কিন্তু বলশেভিকদের এই অভিযোগ যে মিথ্যা, তাহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারকদের জীবনচরিত, নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীত হইবে। ব্যাস, বাল্মীকি, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, চৈতন্য, বুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট ইহারা যে প্রবঞ্চনার সহায়তা করিবে, ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না যে, তাঁহারা এরূপ একটা সত্য অনুভব করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহাদিগকে পরম আনন্দ দান করিয়াছিল; অন্য মানবগণও এই আনন্দ আস্বাদন করিয়া নিজ জীবন ধন্য করুক, ইহাই তাঁহাদের একান্ত অভিলাষ ছিল। বহুসংখ্যক ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্ম ও সত্যের জন্য স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য, নির্য্যাতন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিয়াছেন। দুঃখের কষ্টিপাথরে ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে বহুবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাঁহারা প্রবঞ্চক এবং মিথ্যাবাদী নহেন। ইহা সত্য যে, কোনও কোনও প্রবঞ্চক ব্যক্তি ধর্ম্মপ্রচারক সাজিয়াছেন, কিন্তু সকল উত্তম বস্তুর মন্দ অনুকরণ হইয়া থাকে, তাহাতে প্রমাণ হয় না যে, উত্তম বস্তু নাই।

ধর্ম্ম প্রবঞ্চনার উপর প্রতিষ্ঠিত, বলশেভিকদের এই অভিযোগ যে মিথ্যা; তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। কিন্তু বলশেভিকদের আর একটি যুক্তি আছে— তাহার উত্তর দেওয়া কিছু দুরূহ। তাহারা বলে, মন্দির বা গির্জ্জা নির্ম্মাণ

করিতে এবং ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যে উদ্যম এবং সময় ব্যয় হয়, সে উদ্যম এবং সময় দুঃখীর দুঃখমোচনের জন্য ব্যয় করা উচিত, অর্থাৎ মন্দির এবং গির্জ্জা নির্ম্মাণ না করিয়া হাসপাতাল এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তাহারা বলে, যদি-ই বা ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, সে নিজে ইহলোকে বা পরলোকে উপকৃত হইতে পারে, কিন্তু নিজ উপকারের জন্য চেষ্টা করা স্বার্থপরতারই নামান্তর। অতএব ঈশ্বরকে আরাধনা না করিয়া, পরদুঃখ মোচনের চেষ্টাই কর্ত্তব্য। এজন্য বলশেভিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাদের রাজ্যে কোনও গির্জ্জা বা মন্দির থাকিবে না এবং জাতির সমগ্র উদ্যম আর্থিক উন্নতির জন্য নিযুক্ত হইবে। তাহারা বলে যে, আত্মসুখান্বেষণ অপেক্ষা পরোপকার চেষ্টা শ্রেষ্ঠ, ইহা যদি সকল জাতি সত্যসত্যই বিশ্বাস করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রদর্শিত পথে সকল জাতির অগ্রসর হওয়া উচিত।

বলশেভিকদের এই যুক্তি যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে সত্যসত্যই পৃথিবী হইতে ধর্ম্মানুষ্ঠান উঠিয়া যাইবে। কারণ, তাহা হইলে যে কেবল মন্দির থাকিবে না তাহা নহে, গৃহে বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান বা উপাসনা করাও স্বার্থপরতার কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। যে সময়টুকু ধ্যান বা উপাসনা করিবেন, সে সময়টুকু কোনও রোগীর সেবা করিবেন না কেন; অথবা দরিদ্রের জন্য অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন না কেন?

বলশেভিকদের এই যুক্তির উত্তরে বলা যায় যে, একটি মন্দির বা গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা করিলে অনেক ব্যক্তি সেখানে গিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে। এবং উপাসনা করিয়া সুখ এবং মানসিক উন্নতি লাভ করিতে পারে, হাসপাতাল বা বিদ্যালয় স্থাপন করিলে সাধারণের যতদূর উপকার করা যায়, মন্দির বা গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা করিলে তদপেক্ষা অধিক উপকার করা যায়। কারণ, কোনও ব্যক্তির ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি করিলে তাহার যত উপকার করা হয়, অপর কোনও উপায়ে ততদূর করা সম্ভব হয় না। ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তি ইহাও বলিবেন যে, রোগী ও দুঃখীর জন্য প্রার্থনা করিয়া তাহার যতদূর কষ্ট লাঘব করা যায়, সেবা ও ঔষধের দ্বারা ততদূর করা যায় না।

কিন্তু এই সকল সাধারণ যুক্তির দ্বারা বলশেভিককে নিরস্ত করা দুরূহ। তাহারা বলিবে, ঈশ্বরের প্রশংসাসূচক স্তব করিলে তিনি যতদূর প্রীত হইবেন, দুঃখীর দুঃখমোচনের চেষ্টায় তিনি অধিকতর প্রীত হইবেন,—যদি তিনি সত্য সত্যই দয়ালু হন। মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অনেক ব্যক্তি উপাসনা করিবার

সুযোগ দেওয়া হয় সত্য, কিন্তু উপাসনা করিবার সুযোগ দেওয়া এবং স্বার্থপর হইবার সুযোগ দেওয়া, একই কথা। উপাসনা করা অপেক্ষা পরোপকার করা যখন শ্রেয়ঃ, তখন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উপাসনা করিবার সুযোগ দেওয়া অপেক্ষা, হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া সেবা করিবার সুযোগ দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

আমার মনে হয় যে, হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ হইতে বলশেভিকদের যুক্তির যেরূপ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারা যায়, অপর কোনও ধর্ম্মেয় পক্ষ হইতে সেরূপ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারা যায় না। এই উত্তর দিতে হইলে মানব কেন সুখ ও দুঃখ পায়, তাহা বিচার করা উচিত।

মানব পাপ করিলে দুঃখ পায়, পুণ্য করিলে সুখ পায়। হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অপর ধর্ম্মে এই সত্য আংশিক ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্মে বলা হইয়াছে যে, মানব ইহজন্মে যে পাপ করে, তাহার ফলে ইহলোকে বা পরলোকে দুঃখ পাইবে; কিন্তু ইহা স্বীকৃত হয় নাই যে, ইহ জন্মে মানব যে সুখ বা দুঃখ পায়, সকলই তাহার ইহ জন্মে বা পূর্ব্বজন্মে কৃত পুণ্য বা পাপের ফল। ইহা না স্বীকার করিলে সত্যটির পরিপূর্ণরূপ উপলব্ধি হয় না, এবং ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর এবং খামখেয়ালী বলিতে হয়। হিন্দু ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর প্রত্যেক মানবের কর্ম্ম অনুসারে তাহাকে সুখ বা দুঃখ দেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ,—কর্ম্ম অনুসারেই ফল প্রদান করেন। তিনি দয়ালু—পাপীও যদি অনুতাপ করে এবং একান্ত ভাবে তাঁহার শরণ লয়, তাহা হইলে তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

মানব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে, তাই বলিয়া কি কাহারও দুঃখ দুর করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত নহে? বলা বাহুল্য, হিন্দু ধর্ম্মের এরূপ অভিপ্রায় নহে। কাহারও দুঃখ দেখিলে সে দুঃখ দুর করিবার জন্য চেষ্টা অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু সে চেষ্টার উদ্দেশ্য হইবে, আত্মচিত্ত শুদ্ধি; আমার হৃদয়ে যে বিলাস-বাসনা আছে, পরের দুঃখে সহানুভূতি করিলে, পরের দুঃখ দুর করিবার চেষ্টা করিলে তাহা বিদূরিত হইবে, এজন্য সেরূপ চেষ্টা করাই উচিত। কিন্তু এরূপ চেষ্টা করিবার সময়ও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, ঈশ্বরই সকলকে নিজকর্ম্ম অনুসারে দুঃখ দিতেছেন, তিনি দুঃখ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছেন বলিয়া দুঃখ দিতেছেন; তিনি ইচ্ছা করিলে সকল জীবের দুঃখদূর করিতে পারেন। পিতা অবাধ্য সন্তানকে দণ্ড দেন, কিন্তু কেহ যদি এরূপ সন্তানের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হন। সেইরূপ ঈশ্বরও অবাধ্য

সন্তানকে দণ্ড দেন কিন্তু কেহ যদি দণ্ডিতের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। দুঃখীকে দয়া কর, ইহা তাঁহারই আদেশ, তাঁহার আদেশ পালন করিতেছি বলিয়াই দুঃখীকে দয়া করা উচিত। কাহারও দুঃখ দূর করিতে পারিলে যেন চিত্তে এরূপ অহঙ্কার না হয় যে, আমি ইহার দুঃখ দূর করিলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া আমাদের অপরের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। ঈশ্বর ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক কর্ম্ম করিবার সময় এই নিয়মগুলি মনে রাখিতে হইবে ঃ—

(১) কর্ম্মে আসক্তি থাকিবে না।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।" ৩।১৯

"অতএব অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে।"

(২) কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" ২।৪৭

"তোমার কর্ম্মেই অধিকার আছে। কর্ম্মফল কদাপি অধিকার নাই।"

(৩) অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে,—"আমি কর্ম্ম করিতেছি" এ বোধ থাকিবে না।

"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" ৩।২৭

যাঁহারমন অহঙ্কারে আবৃত হয়, তিনি মনে করেন, "আমিই কর্ত্তা।"

(৪) ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া কর্ম্ম করা উচিত।

"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥"

"যে ব্যক্তি মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত করিয়া অসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করে, সেই উত্তম কর্ম্মী।

(৫) ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করা উচিত।

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ"

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কৃতকর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়। এই সকল নিয়ম মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম চিত্ত শুদ্ধির কারণ হয়।

"যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।"

"যোগিগণ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন।"

পরোপকাররূপ কর্ম্ম করিবার সময়ও এই নিয়মগুলি পালন করিয়া কর্ম্ম করা উচিত। এই নিয়মগুলি পালন না করিয়া পরোপকাররূপ কর্ম্ম করিলে, তাহাতে

অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। বলশেভিক রুশিয়াতে তাহাই হইয়াছে। পরোপকার মানবজীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। মানবজীবনে উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। পরোপকাররূপ কর্ম্ম ঠিকমত করিলে এই উদ্দেশ্যের সহায়ক হইবে। ঠিকমত না করিলে অন্তরায় হইবে। পৃথিবীতে দুঃখের পরিমাণ খুব বেশী (তাহার কারণ পাপের পরিমাণ খুব বেশী) যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও এই দুঃখের অল্প ভাগই দুর করিতে পারা যায়। দুঃখমোচনরূপ কর্ম্মফলে যদি আসক্তি থাকে, তাহা হইলে অশান্তি এবং নাস্তিকতা আসিবার সম্ভাবনা আছে ; "আমরা চেষ্টা করিয়া পৃথিবীর এত বেশী দুঃখের অল্পপরিমাণই দুর করিতে পারি" এইরূপ ভাবিয়া পরোপকার হইতে বিরত হইয়া কাহারও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত নহে। পরদুঃখ মোচনের জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু এই চেষ্টার উদ্দেশ্য থাকিবে, আত্মশুদ্ধি।

কোনও ব্যক্তির দুঃখ দুর করিলেই সব সময় তাহার প্রকৃত উপকার করা হয় না। দুঃখ অনেক সময় হিতকারী বস্তু। দুঃখের আগুনে পুড়িয়া চিত্তের মলিনতা দুর হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। নচেৎ পরমকারুণিক ভগবানের বিধানে দুঃখের সৃষ্টি হইত না। যাহারা সুখ এবং বিলাসে লালিত হয়, তাহারা অনেক সময় মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। পৃথিবীতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ মানব হইয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই অভাব ও দুঃখের মধ্যেই পালিত হইয়াছেন। এজন্যও পর দুঃখ মোচন জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ, আমি কোনও ব্যক্তির দুঃখ মোচন করিয়া তাহার প্রকৃত উপকার করিতে পারিব কি না, কে বলিতে পারে ? কিন্তু পরদুঃখ মোচন জীবনের উদ্দেশ্য না হইলেও পরদুঃখমোচনের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত, উপযুক্ত পাত্রে দান করিলে, সে দানে অনিষ্ট হইবে না। অধিকন্তু যথাবিহিত দান করিলে, আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হইবে। ঈশ্বরের আদেশ মনে করিয়া, অপর সকল আদেশ পালনের সহিত দান করাও উচিত।

পুর্ব্বে বলিয়াছি, ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য, পরোপকার চেষ্টা এই উদ্দেশ্যলাভের সহায়ক উপায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্যলাভের পক্ষে পরোপকার চেষ্টা একমাত্র উপায় নহে, এমন কি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়ও নহে। শ্রেষ্ঠ উপায়, ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরারাধনা। মন্দির বা গির্জ্জায় ঈশ্বরকে আরাধনা করিবার সুবিধা হয়— সহজে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি আসে। এজন্য পরোপকারের অজুহাতে মন্দির ও গির্জ্জা পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—আমি পরের দুঃখ দূর করিতেছি এরূপ অহঙ্কার থাকা পাপ, ঈশ্বরের নিকট কি কতকগুলি স্কুল ও হাসপাতাল চাইবি—না বল্‌বি, হে ঈশ্বর, আমাকে দেখা দাও ঃ—যার বুদ্ধি নাই, সে কালীঘাটে গিয়া ভিখারীকে পয়সা দিবার সময় ভিখারীর ভিড়ে আটকাইয়া যায়, মা'কে আর দর্শন করা হয় না।

বলশেভিক রুশিয়া পরোপকারের ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছে। এজন্য রুশিয়াতে আমোদপ্রমোদ থিয়েটার-বায়স্কোপ এ সকল নিষিদ্ধ হয় নাই। যদি রুশিয়াতে পরোপকারের জন্য এই সকল আমোদ প্রমোদের অজস্র ব্যয় নিবারিত হইত, তাহা হইলে ইহা বুঝা যাইত যে, তাহারা পরোপকারসাধনাই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বাস্তবিক বলশেভিক রুশিয়া ইন্দ্রিয় সুখভোগকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ধর্ম্ম এই উদ্দেশ্যের প্রতিকুল বলিয়া তাহারা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিয়াছে। ধর্ম্মবর্জ্জিত ইন্দ্রিয়সুখভোগের অনুসরণ করিয়া তাহারা নিষ্ঠুরতা দুর্নীতি এবং ব্যভিচারের পথেই অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কাব্য ও সুনীতি

কাব্য যে চিত্তাকর্ষক হওয়া প্রয়োজন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই! কোনও রচনা যদি চিত্তাকর্ষক না হয়, তাহা হইলে তাহাতে যতই কেন মহামূল্য উপদেশ থাকুক, তাহাকে কাব্য বলা যায় না। 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্।" কাব্যে রস থাকা চাই। যাহা চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে, তাহাই "রস"।

কিন্তু কোনও কাব্য চিত্তাকর্ষক হইলেই যে তাহা প্রশংসার্হ, এ কথা বলা যায় না। মানব-চিত্তকে অসৎপ্রসঙ্গের দ্বারাও আকর্ষণ করা যায়। যে কাব্যে অসৎপ্রসঙ্গের দ্বারা চিত্ত আকর্ষণ করা যায়, তাহা অসৎকাব্য। সৎকাব্য প্রশংসার্হ। অসৎ-কাব্য প্রশংসার্হ নহে।

কিন্তু এ কথা সকলে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, কাব্যের সহিত সুনীতি-দুর্নীতির কোন সম্বন্ধ নাই। কাব্য কেবল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিবে। যাহা সুন্দর, তাহা সকল দেশের সকল সময়ের লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে। কিন্তু সুনীতি-দুর্নীতির কোনও সার্ব্বজনীন লক্ষণ নাই। যাহা একজন সুনীতি বলে, তাহা আর একজন দুর্নীতি বলে। যাহা এক কালে সুনীতি বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা আর এক কালে দুর্নীতি বলিয়া উপেক্ষিত হয়। তাঁহারা বলেন যে, কাব্যে যদি সুনীতি শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তাহার যাহা প্রধান উদ্দেশ্য—সৌন্দর্য্যসৃষ্টি তাহারও অন্তরায় হয়।

কিন্তু এ সকল আপত্তি যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। রামায়ণে যথেষ্ট সদুপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পুত্রের কর্ত্তব্য, ভ্রাতার কর্ত্তব্য, পত্নীর কর্ত্তব্য, রাজার কর্ত্তব্য—এ সকলই রামায়ণে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কাব্যের সৌন্দর্য্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ঘটনাগুলি এরূপ ভাবে বিবৃত করা হইয়াছে যে, তাহা চিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। রাজ্যাভিষেক অবহেলা করিয়া রাম পিতৃসত্য পালন করিতে প্রসন্নবদনে বনে যাইতেছেন, রাজা শোকে অচেতন, সমগ্র অযোধ্যাপুরী মুহ্যমান, এই সকল কাহিনী শুনিলে হৃদয় করুণরসে বিগলিত হয় এবং সেই বিগলিত-হৃদয়ে এই উপদেশ গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া যায় যে, পিতার আদেশ পালন করা পুত্রের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। কৈকেয়ী মনে করিতেছেন, তিনি কৌশলে রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া ভরতের জন্য রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া রাখিয়াছেন, ভরত ইঁহা শুনিয়া লজ্জায় ও ক্রোধে অধীর হইতেছেন, কবি অপরূপ কৌশলের সহিত দেখাইতেছেন—ভ্রাতৃ-ভক্তি কি সুন্দর, সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিদ্বেষ কি কুৎসিত। সৎশিক্ষা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টির কোনও অন্তরায় হয় নাই। এইখানেই কবিপ্রতিভার সার্থকতা। সৎশিক্ষা দেওয়া হইবে, অথচ সে জন্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টির কোনও ব্যাঘাত হইবে না, কাব্য যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক থাকিবে। যে সকল নীতি রামায়ণে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, সে সকল নীতি কোনও বিশেষ দেশ বা কালের উপযোগী, তাহা বলা যায় না। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, সকলেই এই সকল নীতির সমাদর করিয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে অন্য সকল দেশেও সমাদৃত হইয়াছে। সুতরাং সকল দেশে ও সকল কালে আদৃত নীতি অবলম্বন করিয়া চিত্তাকর্ষক কাব্য রচনা করা অসম্ভব নহে।

অবশ্য এমন কতকগুলি নীতি আছে—যেগুলি এক দেশে আদৃত নীতি

অন্য দেশে আদৃত নহে, অথবা এক সময়ে আদৃত, কিন্তু অন্য সময়ে অনাদৃত। মানবের জ্ঞানের উন্নতি সকল দেশে ও সকল সময়ে সমান থাকে না কোনও দেশে জ্ঞান সমধিক উন্নত, কোনও দেশে ততদূর নহে। কোনও সময়ে জ্ঞানের উন্নতি আবার কোনও সময়ে অবনতি হয়। এই সকল কারণে সকল উত্তমনীতি সকলদেশে সকল সময়ে আবিষ্কৃত হয় না বা জ্ঞানিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইলেও বহুসংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা আদৃত হয় না। কিন্তু এই ভাবে নীতির যেরূপ দেশ ও কালভেদে প্রভেদ হয়, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও সেইরূপ দেশ ও কালভেদে লোকের ধারণা ভিন্ন হইয়া থাকে। এক দেশে বা এক সময়ে যাহা সুন্দর বিবেচিত হয়, অন্য দেশে বা অন্য সময়ে তাহা সুন্দর বিবেচিত না হইতে পারে। চীনদেশে রমণীর ক্ষুদ্র পদ এক সময় সুন্দর বিবেচিত হইত, অন্য দেশে নহে ; চীনদেশেও বোধ হয় এখন বিবেচিত হয় না। পুর্ব্বে দীর্ঘকেশ সৌন্দর্য্যের বিষয় ছিল এক্ষণে bobbed bair সৌন্দর্য্যের বিষয় হইয়াছে অতএব দেশ ও কালভেদে নীতির যেরূপ প্রভেদ দেখা যায়, সৌন্দর্য্যেরও সেইরূপ প্রভেদ দেখা যায়।

দেশ ও কালভেদে নীতির যে প্রভেদের কথা বলা হইল, তাহার সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করা যাইতে পারে। কোন্ নীতি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর, কোন্ নীতি নহে, ইহা জ্ঞানের কথা। যাঁহার প্রকৃত জ্ঞান হইয়াছে, তিনি এ বিষয়ে যথার্থভাবে নির্ণয় করিতে পারেন। যাঁহার প্রকৃত জ্ঞান হয় নাই, তাঁহার এ বিষয়ে ভ্রম হইতে পারে,—তাঁহার দৃষ্টিতে উত্তম নীতি মন্দ বলিয়া মনে হইতে পারে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিতে যদি তমোগুণ প্রবল হয়, তাহা হইলে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বুদ্ধিকে নির্ম্মল করা প্রয়োজন, বুদ্ধি হইতে তমোগুণ দূর করা প্রয়োজন। কামনা বা বাসনাই বুদ্ধির মলিনতা। কামনা দূর করা অতিশয় দুরূহ। সুদীর্ঘ সাধনার দ্বারা ঋষিগণ চিত্ত হইতে কামনা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল চিত্তে বেদ উপনিষদ্ ও দর্শনসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। তপস্যার দ্বারা তাঁহারা বেদের প্রকৃত অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি ঋষি প্রণীত শাস্ত্র গ্রন্থে বেদের প্রকৃত অর্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যদি মনে হয় যে, এই সকল নিয়ম ঘৃণা বা সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত এবং সমাজের অকল্যাণজনক, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের

বুদ্ধি নির্ম্মল নহে বলিয়া এইরূপ মনে হইতেছে। এ কথা বলা যায় না যে নিয়মগুলি প্রাচীন যুগের উপযোগী ছিল, এ যুগের উপযোগী নহে। যে নিয়ম ঘৃণা বা সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত, তাহা কোনও যুগের উপযোগী নহে, প্রাচীন যুগেরও নহে, বর্ত্তমান যুগেরও নহে। বিভিন্ন যুগে মানবের শক্তির প্রভেদ হেতু শাস্ত্রে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তনের কথা আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ নিয়ম (প্রায় সকল নিয়মকে) সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গ, অতএব অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং যে সকল কারণ আমরা নীতির পরিবর্ত্তন সম্ভব বলিয়া মনে করি, সে সকল কারণে প্রকৃতপক্ষে নীতির পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় না। দেশ ও কালভেদে মানবের বুদ্ধির প্রভেদ হয়,—এজন্য প্রকৃত নীতি কোথাও আবিষ্কৃত হয়, কোথাও হয় না; আবার কখনও বা ঋষিগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত প্রকৃত নীতি মন্দ বলিয়া প্রতিভাত হয়।

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস 'রঘুবংশে' বলিয়াছেন যে, মনু যে সকল নিয়ম করিয়াছিলেন, রঘুবংশের নৃপতিসকল যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সেই সকল নিয়ম অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন।

"রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাৎ আমনোর্বর্ত্মনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥"

—রঘুবংশ ১।১৭

কালিদাস এ বিষয়ে বাল্মীকির অনুসরণ করিয়াছেন। কারণ, বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায় যে, বালীবধপ্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র মনুর উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "আমরা স্বাধীন নহি, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের অধীন।" পুনশ্চ কালিদাস বলিয়াছেন :—

"শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ"—(রঘুবংশ)

অর্থাৎ স্মৃতি যেমন বেদের অর্থ অনুসরণ করে, সুদক্ষিণা সেইরূপ বশিষ্ঠের ধেনুর অনুসরণ করিয়াছিলেন।

বেদ এবং বেদমূলক শাস্ত্র যে সত্য-সনাতন নীতি প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহা যে কেবল শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি আচার্য্য ও মহাপুরুষগণ প্রচার করিয়াছেন, তাহা নহে, ব্যাস, বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিগণও ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আমাদের প্রাচীন কাব্যসকল ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করেন নাই। ধর্ম্মশাসনের অধীন থাকিয়া গ্রন্থকারগণ কাব্য রচনা করিয়াছেন—সৌন্দর্য্যচর্চ্চা করিয়াছেন। অথবা ধর্ম্মের তত্ত্বসকল সরল ও হৃদয়গ্রাহীরূপে

প্রচার করিবার জন্য তাঁহাদের প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা সৌন্দর্য্যসৃষ্টির যথেষ্ট অবকাশ লাভ করিয়াছেন। নিয়মের বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সাহিত্য কালজয়ী, তাঁহাদের সাহিত্যিক প্রতিভা ক্ষুণ্ন হয় নাই।

সংস্কৃত-সাহিত্যে গ্রন্থসকলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—প্রভুসম্মিত, সুহৃদ্‌সম্মিত ও কান্তাসম্মিত; যে গ্রন্থ প্রভুর ন্যায় আদেশ করেন, যুক্তি দেন না, তাহা প্রভুসম্মিত; যথা—বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র। যে গ্রন্থ যুক্তির দ্বারা কল্যাণের পথ নির্ণয় করে, তাহা সুহৃদ্‌সম্মিত; যথা—দর্শনশাস্ত্র। যে গ্রন্থ কান্তার ন্যায় চিত্ত আকর্ষণ করিয়া সৎপথে চলিবার প্রবৃত্তি প্রদান করে, তাহা কান্তাসম্মিত। সৎগ্রন্থ সকলেরই উদ্দেশ্য—মানবকে কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তিত করা। উদ্দেশ্য এক হইলেও এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থ বিভিন্ন উপায় গ্রহণ করিয়াছেন। শাস্ত্র কেবল আদেশ দিয়াছেন। যাঁহাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, তাঁহারা সে আদেশ পালন করেন—যুক্তির অপেক্ষা রাখেন না। কিন্তু অনেকের সে বিশ্বাস নাই, তাঁহাদিগকে যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়—দর্শনগ্রন্থরাজি তাহাই করেন। আবার অনেকের এইরূপ স্বভাব যে, তাঁহারা সুযুক্তিতেও কর্ণপাত করেন না। কাব্য করুণ মধুর প্রীতি প্রভৃতি বিবিধ রসের দ্বারা চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তিত করিবে। ইহাতেই কাব্যগ্রন্থের সার্থকতা।

মানবচিত্ত পরস্পর সম্বন্ধবিহীন বিভিন্ন কক্ষে (water-tight compartment) বিভক্ত করা যায় না। সৌন্দর্য্যচর্চ্চা এবং ধর্মচর্চ্চা উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। সকল বিষয়েই দুইটি পথ আছে—একটি কল্যাণের পথ, একটি অকল্যাণের পথ; একটি ধর্ম্মের পথ, একটি অধর্ম্মের পথ। একমাত্র পরব্রহ্মই ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উচ্চে অবস্থিত।

"অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ
অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ
অন্যত্র ভূতাৎ চ ভব্যাৎ চ
যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ।"

(কঠোপনিষৎ)

"যাহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম হইতে ভিন্ন, ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন—তাহা আপনি জানেন, আমাকে তাহাই বলুন।"

একমাত্র ব্রহ্মই এইরূপ বস্তু, আর কিছুই নহে। কাব্যগ্রন্থ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উচ্চে অবস্থিত নহে। তাহারা হয় ধর্ম্মানুমোদিত, নয় ধর্ম্মবিরোধী।

কঠোপনিষদ বলিয়াছেন যে, যাহারা শ্রেয়ঃ গ্রহণ করে, তাহাদের কল্যাণ হয়; যাহারা প্রেয় গ্রহণ করে, তাহাদের কল্যাণ হয় না।

> "শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
> হীয়তে অর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীতে।"

যাহা চিত্তাকর্ষক তাহা প্রেয়। যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহা শ্রেয়ঃ। যে কাব্যে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সামঞ্জস্য হইয়াছে, তাহাই সার্থক; যথা—রামায়ণ ও মহাভারত। যে কাব্যে প্রেয়ের অনুরোধে শ্রেয়কে বিসর্জ্জন করা হইয়াছে, তাহা বর্জ্জনীয়।

কবি কোনও উদ্দেশ্য লইয়া কাব্য রচনা করিবেন না,—এ কথা শ্রদ্ধেয় নহে। মানব বুদ্ধিমান্ জীব। মানব কোনও উদ্দেশ্য না লইয়া কোনও কার্য্য করে না। "প্রয়োজনং বিনা কার্য্যে মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে।" সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিয়া যশ বা আনন্দ লাভ করিব,—সকল লোকেরই এইরূপ উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে; ইহা প্রেয়ের কথা। ইহার সহিত শ্রেয়ের সংযোগ থাকা প্রয়োজন। নচেৎ সে কাব্যে জগতের কল্যাণ হইবে না। অকল্যাণও হইতে পারে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেবাসুর-যুদ্ধের কাহিনী আছে। দেবগণ কনিষ্ঠ, অসুরগণ জ্যেষ্ঠ। দেবগণ ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির সাহায্যে উৎকর্ষলাভের চেষ্টা করেন। অসুরগণ ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকে পাপের দ্বারা সংসৃষ্ট করেন। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রবিহিত সৎকর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিকে দেবতা বলা হইয়াছে, ভোগের প্রবৃত্তিকে অসুর শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কাব্যের দ্বারা যদি সুনীতি প্রচার করিবার উদ্দেশ্য না থাকে, তাহা হইলে কাব্য ভোগের উপকরণে পরিণত হইবে। কারণ, ভোগের প্রবৃত্তি বড় প্রবল।

Art for arts sake এই ধুয়া ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতে Artএর নামে কাম এবং ইন্দ্রিয়-তর্পণের আয়োজন চলিতেছে। টলষ্টয় তাঁহার প্রণীত 'What is Art' গ্রন্থে তাহা দেখাইয়াছেন। সম্প্রতি রোমা রোঁলাও সেই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার এক জন চরিত্র বলিয়াছেন—"You cover your

national lewdness in the name of Art and Beauty." "তোমরা শিল্প ও সৌন্দর্য্যের নামে তোমাদের কামুকতা আবৃত করিয়া রাখ মাত্র।"

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার হইবার পর হইতে অপর অনেক বিষয়ে আমরা যেরূপ পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিয়াছি, সেইরূপ সাহিত্যেও পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতেছি। Art for art's sake-এর বাণী আমাদের দেশেও সুপ্রচারিত হইয়াছে। Art-এর উদ্দেশ্য কেবল সৌন্দর্যসৃষ্টি, ধর্ম্মের সহিত নীতির সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই, এই মত প্রচারিত হইয়াছে। ফলে মানবের স্বাভাবিক প্রবল ভোগবৃত্তি Art-এর উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। Art-এর নামে অধর্ম্ম ও দুর্নীতি চিত্তাকর্ষক ভাবে অঙ্কিত হইতেছে। ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ যে সকল আদর্শ উপলব্ধি করিয়া রামায়ণ ও মহাভারত অঙ্কিত করিয়াছেন, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিগণ যে সকল চরিত্র চিত্রণ করিয়া নিজদিগকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মানিয়াছিলেন, সে সকল চরিত্রে আধুনিক নবীন লেখকদিগের অনেকের রুচি নাই। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষি সমাজের কল্যাণজনক যে সকল নীতি প্রচার করিয়াছিলেন, একশ্রেণীর আধুনিক তরুণ সাহিত্যিক তাহাদিগকে অবজ্ঞা ও উপহাস করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে সরস্বতীর পুণ্য তপোবন ব্যভিচারে প্লাবিত হইতেছে। বহু তরুণ পাঠক-পাঠিকা এই সকল রচনাকে প্রশংসা করিতেছেন। লেখকগণ নিজদিগকে দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া মনে করিতেছেন। আধুনিক লাইব্রেরীগুলি এক একটি দুর্নীতিপ্রচারের কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে।

যক্ষ্মারোগ মানবদেহের প্রতি যেরূপ অনিষ্টকর, দুর্নীতি সমাজ দেহের প্রতি সেইরূপ অনিষ্টকর। সাহিত্যে দুর্নীতি হইতে সহজেই সমাজে দুর্নীতি প্রচারিত হয়। যদি সৎসাহিত্যের পুণ্য অবদানে আমাদের জাতীয় জীবন গৌরবান্বিত করিবার বাসনা থাকে—যদি ব্যাস বাল্মীকির প্রচারিত আদর্শ সঞ্জীবিত রাখা প্রয়োজন হয়, যদি জগতে হিন্দুর জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাহা হইলে এই নীতিবিহীন সাহিত্যিক অভিযান হইতে আমাদের মাতৃভাষাকে রক্ষা করিতে হইবে। যে লেখক ব্যভিচারকে চিত্তাকর্ষকরূপে অঙ্কিত করেন, তিনি যতই প্রতিভাশালী হউন না কেন, তাঁহার রচনা বর্জ্জন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি প্রবঞ্চক বা পরস্বাপহারক, তাহার প্রতিভা যেমন তাহাকে আরও ভীষণ করিয়া তুলে, সেইরূপ এই শ্রেণীর লেখকের প্রতিভা সমাজের পক্ষে ভয়াবহ।

(মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫)

বেদ ও জাতিবিভাগ

হিন্দুধর্ম্মে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্যকর্ম্ম তাঁহার জাতি বা বর্ণ এবং আশ্রমের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। এ জন্য হিন্দুধর্ম্মের একটি নাম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কারকগণ বলিয়া থাকেন যে, বেদে জাতি-বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায় না। কথাটি সত্য হইলে বড় বিচিত্র তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, হিন্দুধর্ম্ম বেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কথাটি সত্য কি না, তাহা আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ঋগ্বেদসংহিতা ১০ম মণ্ডল ৯০ সূক্ত পুরুষসূক্ত নামে পরিচিত। এই সূক্তে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রঃ অজায়ত॥

"ব্রাহ্মণ জাতি সেই বিরাট পুরুষের মুখ ছিলেন। বাহুদ্বয়কে ক্ষত্রিয় জাতি করা হইয়াছিল। বৈশ্য ছিলেন উরুদ্বয়। পদদ্বয় দ্বারা শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন।"

ইহার অর্থ এই যে, বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি, উরু হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি এবং পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি। কিন্তু অনেক আধুনিক পণ্ডিত এই ব্যাখ্যা স্বীকার করেন না এবং বলেন যে, বেদে আর কোথাও জাতিবিভাগের উল্লেখ নাই।

কিন্তু এই উক্তি যথার্থ নহে। যজুর্ব্বেদসংহিতার নিম্নলিখিত অংশে চারি বর্ণের উল্লেখ আছে। পুরুষসূক্তের পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋক্‌টির অর্থও যজুর্ব্বেদসংহিতার এই অংশে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রজাপতিঃ অকাময়ত প্রজায়েয় ইতি (প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন যে সৃষ্টি করিব) স মুখতঃ ত্রিবৃতং নিরমিমীত ··ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাং···তস্মাৎ তে মুখ্যাঃ··· মুখতো হি অসৃজ্যন্ত···(তিনি মুখ হইতে ত্রিবৃৎ নামক স্তব সৃষ্টি করিলেন··· মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ···এ জন্য তাহারা প্রধান···কারণ, তাহারা মুখ হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল) উরসঃ বাহুভ্যাং পঞ্চদশং নিরমিমীত···রাজন্যঃ মনুষ্যাণাং··· তস্মাৎ তে বীর্য্যবন্তঃ, বীর্য্যাৎ হি অসৃজ্যন্ত (বক্ষঃ এবং বাহু হইতে পঞ্চদশ বস্তু

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—মনুষ্যদের মধ্যে ক্ষত্রিয়, এ জন্য তাহারা বীর্য্যবান, বীর্য্য হইতে তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল), মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত···বৈশ্যো মনুষ্যাণাং···তস্মাৎ ভূয়াংসঃ অন্যেভ্যঃ (মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মনুষ্যদের মধ্যে বৈশ্য, এ জন্য তাহারা অন্য সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী) পত্তঃ একবিংশং নিরমিমীত (পদ হইতে একবিংশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন) শূদ্রো মনুষ্যানাং (মনুষ্যদের মধ্যে শূদ্র) তস্মাৎ শূদ্রো যজ্ঞে অনবকৢপ্তঃ (এ জন্য শূদ্র যজ্ঞ করিতে পারে না)।

—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।১

পুরুষসূক্তের পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্রটি ব্রহ্মার মুখ প্রভৃতি অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, সায়ণাচার্য্য এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং এই ব্যাখ্যার সমর্থন স্বরূপ বলিয়াছেন যে যজুর্বেদসংহিতাতে এই অর্থটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্মপ্রতিপাদক অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থেও ব্রাহ্মণাদি জাতির এইভাবে উৎপত্তির উল্লেখ আছে। মনু ১।১৪ শ্লোকে বলিয়াছেন—

তৎ হি স্বয়ম্ভূঃ স্বাদ্ আস্যাৎ তপঃ তপ্তা আদিতঃ অসৃজৎ

অর্থাৎ স্বয়ম্ভু তপস্যা করিয়া সর্ব্বপ্রথমে মুখ হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য সনাতনকে উপদেশ দিবার সময় চতুর্ব্ববর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন :—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণাঃ গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্

—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা, ২২ পরিচ্ছেদ।

"ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে বিভিন্ন গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ এবং আশ্রম সকলের উদ্ভব হইয়াছিল।"

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত হইতে যে মন্ত্র পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, এই মন্ত্র অন্যান্য বেদেও দেখা যায়। যথা যজুর্বেদীয় বাজসনেয়িসংহিতা ৩১।১১৬, অথর্ব্ববেদ ১৯।৬, সামবেদ কৌথুমী শাখা, আরণ্য সংহিতা। বেদের অন্যান্য স্থলেও বিভিন্ন জাতির উল্লেখ আছে।

ইন্দ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীণাং (ঋগ্বেবেদ সংহিতা ১।৭।৯)

"ইন্দ্রঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পঞ্চ জাতির লোককে অনুগ্রহ করুন।"

যে বা জনেষু পঞ্চসু (ঋগ্বেদ-সংহিতা ৯।৬৫।২৩)

এখানে 'জনেষু পঞ্চসু' এই শব্দে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ এবং নিষাদ এই পঞ্চম বর্ণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

পঞ্চজনা মম হোত্রং জুষধ্বং (ঐ ১০।৫৩।৪)

'পঞ্চজন' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পাঁচ বর্ণ।

দ্বে তে চক্রে সূর্য্যে ব্রহ্মাণঃ ঋতু থা বিদুঃ (ঐ ১০।৮৫।১৬)

(ব্রহ্মাণঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ)

ব্রহ্মভ্যো বিভজাবসু (ঐ ১০।৮৫।২৯)

"ব্রাহ্মণ দিগকে ধন দাও (প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ)"

সূর্য্যাং যো ব্রহ্ম বিদ্যাৎ স বধূয়ং অর্হতি (ঐ ১০।৮৫।৩৪)

"যে ব্রাহ্মণ সূর্য্য দেবতাকে জানেন, তিনি বধূর বস্ত্র পাইবার যোগ্য।"

তানি ব্রহ্মা তু শুংধতি (ঐ ১০।৮৫।৩৫)

(ব্রহ্মা = ব্রাহ্মণ)

ব্রহ্মা বৈ দেবানাং বৃহস্পতিঃ (কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩।১।১।৪)

"বৃহস্পতি দেবতাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ।"

মম দ্বিতারাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য (ঋগ্বেদসংহিতা ৪।৪২।১)

"আমি ক্ষত্রিয় জাতি সম্ভূত ; আমার দুইটি রাষ্ট্র, স্বর্গ ও পৃথিবী।"

বাবৃধানৌ অসতিং ক্ষত্রিয়স্য ঋগ্বেদসংহিতা ৫।৬৯।১

'ক্ষত্রিয় জাতীয় যজমানের রূপ বৃদ্ধি করিবে।"

ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ" (ঋগ্বেদসংহিতা ৬।৭৫।১)

"সোমযজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

ব্রাহ্মণাসঃ অতিরাত্রে ন সোমে (ঋগ্বেদসংহিতা ৭-১০৩-৭)

ব্রাহ্মণগণ সোমযোগে যেরূপ স্তবপাঠ করেন (হে ভেকগণ তোমরাও সেইরূপ শব্দ কর)

তান্ নু ক্ষত্রিয়ান্ অব আদিত্যান্ যাচিষামহে (ঋগ্বেদসংহিতা ৮-৬৭-১)

"সেই সকল ক্ষত্রিয়ের নিকট প্রার্থনা করি।"

ব্রাহ্মণম্ অদ্য বিদেয়ং পিতৃমন্তং (শুক্লযজুর্ব্বেদ—৭-৪৬)

"অদ্য পিতৃমান ব্রাহ্মণকে লাভ করিব।"

বস্তুতঃ বেদে বহুস্থলে ব্রাহ্মণাদি জাতির উল্লেখ আছে। উপরে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বাক্যের উল্লেখ করা হইল। ইহা ব্যতীত ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রে ব্রাহ্মণ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়:—১০-৮৮-১৯ ; ১০-৯৭-২২ ; ১০-১০৯-৪ ;

১০-৭৯ ; ২৩-৩৮-৫ ; ১০-১৬-৬। ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রেও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ আছে—১০-১০৯-৩ ১০-৬৬-৮। যজুর্বেদের বহুমন্ত্রে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদে'ও বহুস্থানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদের বৈশ্যের উল্লেখের দৃষ্টান্ত ঃ—৫-১৭-৯ ; ১৯-৬-৬ ; শূদ্রের উল্লেখের দৃষ্টান্ত ৪-২০-৪; ১৯-৬-৬। "বৈদিক যুগে" নামক গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি লিখিয়াছেন ঃ—

"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্র বা রাজন্ সম্বন্ধে এই মন্ত্রগুলি বর্ণাশ্রমের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।" এই বলিয়া তিনি ঋগ্বেদের আরও কতকগুলি মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—৩।৩৮।৬, ৩।৩৮।৫, ৩।৫৯।৪, ৪।৫০।৯, ৫।২৭।৬, ৫।৩৪।৯, ৫।৪৪।১০, ৮।২২।৭, ৮।২৫।৮, ১০।৬৬।৮, ১।১০৮।৭।

আষাঢ় ১৩৩৪ এর 'ব্রাহ্মসমাজ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম, এ লিখিয়াছেন ঃ—

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ডক্টর হগ তাঁহার 'ব্রাহ্মণের উৎপত্তি' বিষয়ক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন,—

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বেদের প্রথম অংশে জাতি বিভাগের কথা দেখা যায় না, পরবর্ত্তী কালে ঐ প্রথার সৃষ্টি হয়। এ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। বেদের সময় জাতিভেদপ্রথা পূর্ণরূপেই বর্ত্তমান ছিল।

"তিনি বেদ ও জেন্দএভেস্থার সাহায্যে এ বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ যে বংশগত ছিল, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন।"

আমরা এ পর্য্যন্ত বেদের মন্ত্র অংশেরই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ই 'বেদের অন্তর্গত। * সুতরাং বেদে জাতিবিভাগের উল্লেখ আছে কি না, ইহা বিচার করিলে ব্রাহ্মণ অংশের কথা ও বলিতে হয়। ব্রাহ্মণ অংশে বহুস্থলে জাতিবিভাগের উল্লেখ আছে। উপনিষদ্‌গুলি সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ অংশের অন্তর্গত, কোনও কোনও উপনিষদ্ (যথা ঈশোপনিষদ্) মন্ত্র অংশের অন্তর্ভুক্ত।

* "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনাধেয়ং

—আপস্তম্ব প্রণীত যজ্ঞপরিভাষাসূত্র।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নাম বেদ। স্বামী দয়ানন্দ ব্রাহ্মণ অংশকে বেদের বহির্ভূত বলিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার এই মত কোনও প্রাচীন বৈদিক পণ্ডিতের দ্বারা সমর্থিত নহে।

বস্তুতঃ সকল উপনিষদ হয় 'মন্ত্র' নয় 'ব্রাহ্মণ' অংশের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং সকল উপনিষদ্ যে বেদের অন্তর্গত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপনিষদে জাতিবিভাগের উল্লেখ অতিশয় স্পষ্ট।

কোনও কোনও পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, বেদে ব্রাহ্মণাদি জাতির উল্লেখ থাকিতে পারে; কিন্তু তখন জন্মগত জাতি ছিল না; ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ হইত না; যে যজ্ঞ করিত, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিত। কিন্তু ইহা তাঁহাদের কল্পনা মাত্র। এই মতের সমর্থক কোনও বাক্য বেদে নাই। পুরুষসূক্তে ব্রহ্মার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে। জাতি জন্মগত হইলেই এই উক্তি সুসঙ্গত হয়। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে ব্রাহ্মণ এবং নমস্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নচিকেতা বালক, তাঁহাকে জন্ম অনুসারেই ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকিবে, কর্ম্ম অনুসারে হইতে পারে না। ঋগ্বেদসংহিতা ১০-৭১-৯ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যে সকল ব্রাহ্মণ বেদের অর্থ জানে না, তাহারা নিন্দিত কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলে কৃষিকার্য্য করিলেও ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত হইত। যদি কর্ম্ম অনুসারে জাতি বিভাগ হইত, তাহা হইলে ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া বৈশ্য বলিয়া অভিহিত করা উচিত হইত। মনু ১০।৫ শ্লোকে * বলিয়াছেন, পিতা ও মাতা সমান জাতীয় হইলে তাহাদের পুত্রেরও সেই জাতি হয়। মনু ১২।৯৭ ‡ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, চারি বর্ণ ও চারি আশ্রম বেদ হইতেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। মনু ২।৭ ‡ শ্লোকে বলিয়াছেন

* সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু
আনুলোম্যেন সংভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে। মনু ১০।৫
অর্থাৎ সকল বর্ণে তুল্যজাতীয় স্ত্রীর গর্ভের সন্তান সেই জাতিই প্রাপ্ত হয়।

‡ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাঃ চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি॥ মনু ১২।৯৭ অর্থাৎ চারিবর্ণ, চারি আশ্রম প্রভৃতি সকলই বেদ হইতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

‡ যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥ মনু ২।৭
মনু যাহার জন্য যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকলই বেদে উক্ত হইয়াছে।

যে, মনুসংহিতার সকল ব্যবস্থাই বেদানুযায়ী। শঙ্কর রামানুজ, সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ মনুর ব্যবস্থাসকল বেদানুযায়ী বলিয়া মান্য করিয়াছেন*। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিপাদক গ্রন্থেও দেখা যায়, যে, জন্ম অনুসারে জাতিনির্দ্দেশই সাধারণ নিয়ম। তপস্যার দ্বারা কয়েক স্থলে জাতি-পরিবর্ত্তন দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধ করিতেন বলিয়া তাঁহার জাতি ক্ষত্রিয় হয় নাই, ব্রাহ্মণ ছিল। অশ্বত্থামার জাতিও ব্রাহ্মণ ছিল। বিশ্বামিত্র তপস্যার দ্বারা জাতি-পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, জন্ম অনুসারে জাতিই সাধারণ নিয়ম। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলেই তপস্যার কি প্রয়োজন হইত?

পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক ব্যক্তি জাতিবিভাগের বিরোধী, এ জন্য তাঁহারা এইরূপ প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করেন যে, জাতি বিভাগ বেদানুযায়ী নহে। তাঁহারা বলেন যে, জন্ম একটা আকস্মিক ঘটনা (accident)। তাহার দ্বারা জাতি নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত নহে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম অনুসারে জন্ম একটা আকস্মিক ঘটনা নহে, পুর্ব্বজন্মের কর্ম্ম অনুসারে ঈশ্বর কর্ত্তৃক জন্ম নির্দ্দিষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যন্তে
ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা।
কপুয়চরণাঃ কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যন্তে
শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।

৫।১০।৭

যাঁহারা উত্তম কর্ম্ম করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যযোনি প্রাপ্ত হন; যাঁহারা নিন্দিত কর্ম্ম করেন, তাঁহারা কুকুর, শূকর বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হন।

উপনিষদের এই বাক্য হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, জন্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ হইত। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ যদি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম না করেন, ব্রাহ্মোণোচিত গুণলাভের চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণবংশে

* শঙ্কর ও রামানুজ মনুসংহিতা সমর্থন করিবার জন্য বেদ হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, "যদ্ বৈ কিঞ্চিৎ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজং" (তৈত্তিরীয়-সংহিতা ২।২।১০।২) অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা ঔষধের ন্যায়।

জন্মলাভ বৃথা হয়। এইরূপ হীন গুণকর্ম্মসমন্বিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্র শ্রেষ্ঠ, ইহাও শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, ব্রাহ্মণোচিত গুণের প্রশংসা করিবার জন্য শাস্ত্রে কোনও কোনও স্থলে এরূপ কথা বলা হইয়াছে যে, যাহাদের এই এই গুণ আছে, তাহারাই ব্রাহ্মণ। এইরূপ বাক্যের দ্বারা জাতি নির্দ্দেশ করা হইবে, ইহা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল না কারণ, তাহা অসম্ভব, কোন ব্যক্তির কি গুণ আছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না এবং অন্যত্র বহুস্থলে শাস্ত্র স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জন্ম অনুসারে জাতি হয়। সেই সকল বাক্যের সহিত যাহাতে বিরোধ না হয়, এইভাবে অন্য শাস্ত্রবাক্যগুলি ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পিতামাতার গুণ সন্তানে সাধারণতঃ বিদ্যমান থাকে। এজন্য সকল মানবের বংশানুযায়ী কর্ম্ম করিবার সমধিক উপযোগিতা থাকে। এই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর হিন্দুর জাতিবিভাগব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। ইহার ফলে ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য, শৌর্য্য, শিল্প, সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ প্রাচীন জগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল।

জাতিবিভাগের ফলে হিন্দুর জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছে, আজকাল অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকেন। ইহা বুঝিবার ভুল। পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে, একত্র পান-ভোজন না করিলে যে জাতীয় ঐক্য থাকে না, তাহা ঠিক নহে। "আমরা সকলে এক সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গ, আমরা পরস্পর সহায়তা করিয়া সমগ্র জাতির উন্নতি করিব" এইরূপ বোধ থাকিলেই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিবিভাগ এইরূপ বুদ্ধি নষ্ট করে না। পুরুষসূক্তের যে মন্ত্র পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই ভাবের পরিপোষক। একটি পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কে কাহাকে সম্মান করিবে, কে কি কার্য্য করিবে, এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে পারিবারিক ঐক্য বিনষ্ট হয় না। সেইরূপ জাতিবিভাগে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয় না। জাতীয় ঐক্যের জন্য শ্রেণীবিভাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। জাতিবিভাগের দ্বারা স্বাভাবিক নিয়মে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। জাতীয় ঐক্যের জন্য ইহা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য সমাজে ইহার অভাবে সাধারণতঃ ধন অনুসারে শ্রেণীবিভাগ হয়। ইহাতে সমাজে ধনের প্রভাব অতিরিক্তভাবে বাড়িয়া থাকে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষের ভাব দেখা যায়। বেদমূলক স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগ হিন্দু জাতিকে এই সকল অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছে।

(মাসিক বসুমতী, চৈত্র, ১৩৪৪)

জন্ম ও জাতি

জন্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ করা হইবে—না গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ করা হইবে? ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ বলা হইবে, না যাহার ব্রাহ্মণোচিত গুণ আছে, যে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে? এই প্রশ্ন আজকাল প্রবলভাবে উত্থিত হইয়াছে। প্রশ্নটির মীমাংসা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ হিন্দুর বিবাহ, উপনয়ন, অশৌচ প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠান তাহার জাতি বা বর্ণের উপর নির্ভর করে। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব—সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুই জাতিবিভাগ স্বীকার করে। জাতি বা বর্ণ বিভাগ হিন্দুর জীবনে এত বৃহৎ বস্তু যে হিন্দুধর্ম্মের একটি নাম হইতেছে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। সুতরাং বর্ণ বা জাতি কিরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে ইহা অবশ্যই নিশ্চয়রূপে জানা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা ছিল যে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হইবে, শূদ্রের পুত্র শূদ্র হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা আজকাল অনেকের মনঃপুত নহে। তাঁহারা বলেন যে জন্ম অনুসারে জাতি বিভাগ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে—গুণ এবং কর্ম অনুসারে জাতিবিভাগই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" (গীতা ৪।১৩)। যাহারা বলেন যে জন্ম অনুসারে জাতি বিভাগ করা উচিত নহে তাঁহারা এই বাক্যের অর্থ করেন—"গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি (ঈশ্বর) চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।" প্রধানতঃ এই বাক্য হইতে তাঁহারা স্থির করেন যে গুণ কর্ম্ম অনুসারে বর্ণ নির্দ্দেশ করাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়।

কিন্তু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলে ইহা দেখা যাইবে যে গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বর্ণ নির্দ্দেশ করা শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় নহে, জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্দ্দেশ করাই তাঁহার অভিপ্রায়। মহাভারতের কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণের (দ্রোণাচার্য্যের) পুত্র হইলেও যুদ্ধ ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্ম ছিল ক্ষত্রিয়োচিত, ব্রাহ্মণোচিত নহে। তিনি এরূপ ক্রূরস্বভাব ছিলেন যে রাত্রিকালে পাণ্ডব

শিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীর নিদ্রিত পঞ্চপুত্রকে হত্যা করেন এবং উত্তরার গর্ভস্থ শিশু হত্যা করিবার জন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। সুতরাং তাঁহার গুণ বা কর্ম কিছুই ব্রাহ্মণোচিত ছিল না। গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ করিলে অশ্বত্থামাকে কিছুতেই ব্রাহ্মণ বলা যায় না। কিন্তু যখন তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ধরিয়া আনা হইল তখন তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহাকে বধ করা হইল না, তাঁহার সহজাত মস্তকের মণি কাটিয়া লইয়া তাঁহাকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইল। এই উপলক্ষ্যে ভীমসেন দ্রৌপদীকে বলিলেন

জিত্বা মুক্তো দ্রোণপুত্রো ব্রাহ্মণ্যাদ্গৌরবেনচ।

মহাভারত, সৌপ্তিকপর্ব, ১৬।৩২

অর্থাৎ দ্রোণপুত্রকে জয় করিয়া মুক্তি দেওয়া হইয়াছে কারণ সে-ব্রাহ্মণ এবং গুরু দ্রোণাচার্য্যের পুত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে এই কথাই বলিয়াছেন।

ব্রহ্মবন্ধুর্নহন্তব্যো আততায়ী বধার্হণঃ।

ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনুশাসনম্॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।৫৩

অর্থাৎ "শাস্ত্রে আমি (ভগবান) বলিয়াছি যে পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও বধ করিতে নাই, আবার ইহাও বলিয়াছি যে—যে আক্রমণকারী তাহাকে বধ করা উচিত। আমার উভয় আদেশই পালন করিতে হইবে।" (মস্তকের মণি গ্রহণ করাই বধতুল্য হইয়াছে)।

দ্রোণাচার্য্য এবং কৃপাচার্য্য যুদ্ধ ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলা হয় নাই, ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, কারণ ব্রাহ্মণবংশে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে কর্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ করা হয় নাই, জন্ম অনুসারেই করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ করা সম্ভব নয়। এক ব্যক্তির গুণ ব্রাহ্মণের মত এবং কর্ম ক্ষত্রিয়ের মত হইলে কি জাতি হইবে? একই ব্যক্তির গুণ ও কর্মের পরিবর্ত্তন হয়, ইহা দেখা যায়। গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ করিলে এই সকল ক্ষেত্রে বারবার জাতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কোনও এক ব্যক্তির গুণ ভাল বা মন্দ ইহাও অনেক সময় নির্ণয় করা দুরূহ হয়—মিত্রপক্ষের লোক যাহাকে ভাল বলেন, শত্রুপক্ষের লোক তাহাকেই মন্দ বলেন।

গীতার উপদেশ আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে জন্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ করিয়া জাতি অনুসারে কর্ত্তব্য নির্দেশ করাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বেই অর্জ্জুন বলিলেন "আমি যুদ্ধ করিব না, ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিব।" গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ করা যদি শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেন, "ভাল কথা। তুমি আজ হইতে ব্রাহ্মণ হইলে। কারণ ব্রাহ্মণের যে সকল গুণ থাকা উচিত (শম, দম, তপঃ শৌচ, ক্ষমা, সরলতা—গীতা ১৮।৪২) সে সকল গুণই তোমার আছে। ভিক্ষা করা ব্রাহ্মণের কর্ম। সুতরাং তুমি ভিক্ষা জীবিকা গ্রহণ করিলে তোমার গুণ ও কর্ম উভয়ই ব্রাহ্মণোচিত হইবে। সুতরাং তুমি ব্রাহ্মণ হইবে।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিলেন না। বলিলেন, তুমি যুদ্ধ না করিলে তোমার পাপ হইবে। "অর্থাৎ" তুমি ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়াছ, অতএব তুমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ পরিত্যাগ করা পাপ।"

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য নির্ণয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ (গীতা ১৬।২৪) (১)। মনুসংহিতা একটি সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ইহা যে গীতার এবং মহাভারতের বহুপূর্বে রচিত হইয়াছিল এ বিষয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সকল পণ্ডিতগণ একমত। মহাভারতের বহুস্থলে মনুসংহিতার উল্লেখ আছে এবং মনুসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যখন শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়াছেন তখন এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে মনুসংহিতাকেও তিনি প্রামাণিক বলিয়া মনে করিয়াছেন। মনুসংহিতা ১০।৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে পিতা ও মাতার যে বর্ণ পুত্রেরও সেই বর্ণ (২) শ্রীকৃষ্ণ যখন মনুসংহিতাকে প্রামাণিক বলিয়াছেন তখন এরূপ হইতে পারে না যে গীতায় জাতি নির্ণয় সম্বন্ধে মনুসংহিতার বিপরীত মত তিনি গীতায় প্রচার করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন, তোমার সকল কথাই না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু গীতায় ভগবান স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ (গীতা ৪।১৩)

অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্ম অনুসারে চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি—তুমি ত ইহার কোনও উত্তর দিলে না। ইহার উত্তর এই যে ঐ বাক্যের এই অর্থ নয়। এই বাক্যের অর্থ এই যে গুণ অনুসারে কর্ম সকল বিভক্ত হইয়াছে। এখানে কর্ম

---

১ তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ

২ সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্ত এব তে॥

শব্দের অর্থ কর্ত্তব্যকর্ম। ভগবানের উদ্দেশ্য এই যে পূর্ব জন্মের কৃতকর্ম অনুসারে যাহার যেরূপ গুণ হয় তাহাকে তদনুরূপ জাতিতে ভগবান জন্মপ্রদান করেন এবং তদনুসারেই বিভিন্ন জাতির কর্ত্তব্য নির্দেশ করা হইয়াছে।" এই কথা গীতা ১৮।৪১ শ্লোকে ভগবান স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম তাহাদের স্বভাবজাত গুণ অনুসারে বিভক্ত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির নির্দিষ্ট কর্ম কি তাহা উল্লেখ করিয়া ভগবান ১৮।৪৫ শ্লোকে বলিয়াছেন যে নিজ নিজ কর্ম করিয়া লোকে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। কর্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ করিলে একথা বলা যায় না। কারণ কর্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ করিলে সকলেই ত নিজ জাতির কর্ম করিবে। জন্ম অনুসারে জাতি এবং জাতি অনুসারে কর্ত্তব্য নির্দেশ করিলেই একথা বলা যায় যে, যে ব্যক্তি তাহার জাতির নির্দিষ্ট কর্ম করিবে সে সিদ্ধিলাভ করিবে।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য কেহ কেহ বলেন যে বর্ণ জন্মের উপর নির্ভর করে না, কর্মের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য বিশ্বামিত্রকে কঠোর কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছিল। তপস্যার অলৌকিক শক্তি। তপস্যার দ্বারা দেহের উপাদান পরিবর্ত্তন করা সম্ভব, সুতরাং তপস্যার দ্বারা জাতি পরিবর্ত্তন সম্ভব। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে বর্ণ কর্মের উপর নির্ভর করে না। যদি কর্মের উপর নির্ভর করিত তাহা হইলে ব্রাহ্মণের কর্ম করিয়াই বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন, এত কঠোর তপস্যার প্রয়োজন হইত না। বিশ্বামিত্রের ন্যায় আরও কয়েকজন ঋষির তপস্যার প্রভাবে বর্ণপরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহাভারত বনপর্ব ১৭৯ অধ্যায় দেখা যায়—সর্প জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ব্রাহ্মণ কে"; যুধিষ্ঠির উত্তর দিতেছেন "যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, আনৃশংস্য, তপঃ ও ঘৃণা লক্ষিত হয় সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ"। যুধিষ্ঠির পুনরায় বলিয়াছেন যে শূদ্রের মধ্যেও এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা উচিত এবং ব্রাহ্মণের এই সকল গুণ না থাকিলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা উচিত নহে। এখানে ব্রাহ্মণ শব্দ দুটি অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে (১) যাহার জাতি ব্রাহ্মণ (২) যাহার ব্রাহ্মণোচিত গুণ আছে। এই বাক্যের উদ্দেশ্য সত্য, দান,

ক্ষমা প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করা। কি ভাবে জাতি নির্ণয় করা হইবে, তাহা নির্দেশ করা এই বাক্যের উদ্দেশ্য নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে কে ক্ষত্রিয় ও কে বৈশ্য তাহাও উল্লেখ করা হইত, কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের কথাই থাকিত না। সত্য, দান, ক্ষমা প্রভৃতি গুণ সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল গুণ কত পরিমাণে থাকিলে ব্রাহ্মণ হইবে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। মনুসংহিতা প্রামাণিক গ্রন্থ, এ কথা মহাভারতে অন্যত্র বলা হইয়াছে।(৩) পূর্বে বলা হইয়াছে যে মনুসংহিতাতে ইহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্দেশ করা হইবে। মহাভারতে এক স্থলে মনুসংহিতাকে প্রামাণিক বলিয়া অন্যস্থলে মনুসংহিতার বিরুদ্ধ মত প্রচার করা হইবে ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে বর্ণ জন্মের উপর নির্ভর করে না, গুণের উপর। তাঁহাদের মতে সত্যকামের মাতা জবালা বহু পুরুষ-গামিনী ছিলেন, তথাপি সত্যকামকে ব্রাহ্মণ বলা হইল কারণ সত্যকাম সত্যকথা বলিয়াছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে জবালা বহু পুরুষগামিনী ছিলেন না। উপনিষদের বাক্যটি হইতেছে "বহু অহং চরন্তী"। "বহু" শব্দটির ক্লীবলিঙ্গ। দ্বিতীয়ার এক বচনে প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব ইহা ক্রিয়ায় বিশেষণ এবং এই বাক্যের অর্থ, "আমি বহুপরিমাণে পরিচর্যা করিয়াছিলাম।" যদি ইহা বলা উদ্দেশ্য হইত যে জবালা বহু পুরুষগামিনী ছিলেন তাহা হইলে বলা হইত "বহূন্ অহং চরন্তী"। অর্থাৎ বহু শব্দের পুংলিঙ্গ দ্বিতীয়ার বহুবচন থাকা উচিত ছিল। সত্যকামের আচার্য গৌতম প্রথমে সত্যকামের বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে জন্মের দ্বারা জাতিনির্ণয় করাই সাধারণ নিয়ম। যখন গৌতম বালকের বংশপরিচয় জানিতে পারিলেন না, তখন তিনি যোগলব্ধ দিব্যদৃষ্টিতে বুঝিতে পারিলেন যে এই বালক ব্রাহ্মণবংশপ্রসূত।

(৩) পুরাণং মানবোধর্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥ (মহাভারত)

পুরাণ, মনুসংহিতা, বেদ, বেদ, আয়ুর্বেদশাস্ত্র—ইহারা ঈশ্বরের আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত, যুক্তির দ্বারা ইহাদিগকে আঘাত করা উচিত নয়।

জন্ম অনুসারে জাতিনির্ণয় করার ব্যবস্থাতে আজকাল অনেকে যে আপত্তি করেন, তাহার কারণ ইঁহারা মনে করেন যে জন্ম একটি আকস্মিক ঘটনা; ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করা কোনও কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে; সুতরাং এই কারণে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা সমীচীন নহে; যে ব্যক্তি ভাল কাজ করিয়াছে, সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়াছে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এই প্রকার কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। জন্মের পূর্বের বৃত্তান্ত আমরা অবগত নহি বলিয়া আমরা মনে করি যে জন্ম একটি আকস্মিক ঘটনা। বর্ণ বা জাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও জন্মের উপর সুখ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি এত বেশী পরিমাণে নির্ভর করে যে জন্মকে আকস্মিক ঘটনা বলা সমুচিত হয় না। ঈশ্বর যদি পক্ষপাতশূন্য হয়েন তাহা হইলে বিনা কারণে এক ব্যক্তিকে উত্তম গৃহে জন্ম দিয়া সুখী এবং আর একজনকে মন্দ গৃহে জন্ম দিয়া অসুখী করিতে পারেন না। অপর দিকে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করা যেরূপ যুক্তিসঙ্গত, জন্মের পূর্বেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করাও সেইরূপ সঙ্গত। হিন্দুধর্ম বলে যে জন্মের পূর্বেও আমরা কর্ম করিয়াছি এবং সেই কর্ম অনুসারেই আমাদের জন্মের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি উত্তম জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে পূর্ব জন্মে উত্তম কর্ম করিয়াছিল এবং যে ব্যক্তি, অধম জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে ব্যক্তি পূর্বজন্মে মন্দ কর্ম করিয়াছিল—ইহা বেদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে।

রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্
ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা
কপূয়চরণা কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা
শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।

ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।১০।৭

অর্থাৎ যাহারা উত্তম কর্ম করে তাহারা উত্তমযোনি লাভ করে, যথা ব্রাহ্মণযোনি ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্যযোনি। যাহারা মন্দকর্ম করে তাহারা মন্দযোনি লাভ করে, যথা কুকুরযোনি বা শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি।

উত্তম কর্ম করিলে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু স্বর্গে কেহ চিরকাল থাকিতে পান না। পুণ্য ক্ষীণ হইলে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে হয়। স্বর্গবাসের পর যে কর্ম অবশিষ্ট থাকে তাহার দ্বারা পরজন্ম নির্দিষ্ট হয়।

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। আমরা পূর্বজন্মে কি কর্ম করিয়াছি তিনি সকল অবগত আছেন। কে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিবার উপযোগিতা অর্জন করিয়াছে তাহা

তিনিই বলিতে পারেন। আমরা অহঙ্কারবশতঃ মনে করি যে কাহার কোন্ বর্ণোচিত গুণ আছে তাহা আমরা স্থির করিতে পারি। কিন্তু আমাদের জ্ঞান অতিশয় সামান্য। কাহার কি গুণ আছে তাহা আমরা সম্যক অবগত নহি। বিশেষতঃ কাহার মনে কি সুপ্ত সংস্কার আছে তাহা আমরা কিছুই জানি না। অতএব কাহার কোন্ বর্ণ হওয়া উচিত আমরা তাহা বলিতে পারি না। ঈশ্বরই তাহা জানেন।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে কেহ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে সদ্গতি লাভ করিবে এবং চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহ করিলেই যে অসদ্গতি লাভ করিবে এমন কোনও কথা নাই। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মন্দ কর্ম করিলে নরক যাইতে হইবে এবং পরজন্মে কুকুর প্রভৃতি নীচ যোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। অপরপক্ষে চণ্ডালযোনি লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করিতে পারে সে ইহজন্মেই মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে। এ কথা ভগবান গীতায় স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন :—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাংগতিং ॥৯।৩২

"চণ্ডালাদি অস্পৃশ্য জাতির লোক, স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র, সকলেই আমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারে।"

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতো সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। গীতা ১৮।৪৪

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ বর্ণবিহিত কর্ম শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারে।

বর্ণবিভাগ দ্বারা স্থির হইয়াছে কাহার কোন্ কর্ম করা উচিত। যিনি যে বর্ণেরই হউন না কেন, নিজ বর্ণ বিহিত কর্ম করিলে সকলেরই এক ফল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে আমাদের জন্ম নির্দিষ্ট হয়, জন্ম অনুসারে বর্ণ বা জাতি নির্দ্ধারিত হয়, কোন্ বর্ণের কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য ইহা শাস্ত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে, নিজ বর্ণবিহিত কর্ম ভক্তিপূর্বক অনুষ্ঠান করিলে ঈশ্বর প্রীত হন ও চিত্ত শুদ্ধ করিয়া দেন, চিত্ত শুদ্ধ হইলে সদাসর্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া মৃত্যুর পর তাঁহাকে লাভ করা যায়।

(ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯)

বেদে বাল্যবিবাহ

পাশ্চাত্য শিক্ষিত আধুনিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে বৈদিক যুগে বাল্য-বিবাহ প্রথা বিদ্যমান ছিল না, রমণীগণ যৌবনপ্রাপ্ত হইবার পর স্বয়ং পতি নির্বাচন করিতেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, পরবর্তী যুগে এই বৈদিক প্রথা প্রবর্তিত হয় এবং বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়; মনু. পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিতে এই পরবর্তী প্রথার উল্লেখ দেখা যায়। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে দেখিতে পাইব যে, বেদের প্রাচীন অংশেও বালিকার অল্প বয়সে বিবাহের উল্লেখ আছে; মনু, পরাশর প্রভৃতির ব্যবস্থা বেদবিরোধী এরূপ মনে করিবার কারণ নাই; বরং কয়েকটী প্রাচীন বেদ মন্ত্রের সূক্ষ্ম অর্থ আলোচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন হইবে যে বালিকার অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত ইহাই বেদের অভিপ্রায়।

ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ম মণ্ডল, ১২৬ সূক্ত, ৬ এবং ৭ ঋকে বৃহস্পতির কন্যা রোমশা এবং বৃহস্পতির জামাতা ভাবযব্যের কথোপকথনের উল্লেখ আছে। ভাবযব্য বলিতেছেন,

আগধিতা পরিগধিতা কশীকেব জংগহে
দদাতি মহ্যং যাদুরী যাশূনাং ভোজ্যাশতা।

—ঋগ্বেদ, ১।১২৬।৬

রোমশা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভাবযব্য উপহাস করিয়া বলিতেছেন যে, রোমশা এখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। ইহার উত্তরে রোমশা বলিতেছেন—

উপোপ মে পরামৃশ মামে দভ্রাণি মন্যথাঃ।
সর্বাহমস্মি রোমশা গন্ধারীণামিবাবিকা॥

—ঋগ্বেদ, ১।১২৬।৭

ইহার তাৎপর্য এইরূপ যে, রোমশা ছোট নহেন, তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সায়ণাচার্যের ভাষ্য এইরূপ—"উপ উপেত্য * * মে মম গোপনীয়ং অঙ্গং পরমৃশ সম্যক্ স্পৃশ। মে অঙ্গানি রোমাণি দভ্রাণি মা মন্যথাঃ, অল্পানি মাবুধ্যস্ব, অদভ্ররোমশা বহুরোমযুক্তা অস্মি। অতঃ সর্বা সংপূর্ণাবয়বা অস্মি।"

যদি যুবতী-বিবাহই বৈদিক যুগে একমাত্র প্রচলিত প্রথা হইত তাহা হইলে ভাবযব্যের মনে এরূপ আশঙ্কা উঠিত না যে, রোমশা এখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। ভাবযব্যের মনে এই সন্দেহের উদয় হওয়াতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে সে সময় বাল্যবিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল। এই কথোপকথনের সময় রোমশা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইহা সত্য। কিন্তু এই কথোপকথন যে বিবাহের অব্যবহিত পরেই ঘটিয়াছিল এরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। বহুদিন একত্র বাস করার ফলে স্বাভাবিক সংকোচ দূর হইলেই এইভাবে কথোপকথন সম্ভবপর হয়। বিবাহের সময় রোমশা অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন, তাহার পর তিনি যে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন তাঁহার স্বামী ভাবযব্য তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

ঋগ্বেদ সংহিতার অন্যত্রও বাল্যবিবাহের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ ১।১১৬।১ ঋকে দেখা যায় যে, রাজকুমার বিমদ যখন তাঁহার নব-বিবাহিতা পত্নী লইয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন তখন শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন ; তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তব করেন ; তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিমদের পত্নীকে নিরাপদে গৃহে পৌঁছাইয়া দেন। এই ঋকে বলা হইয়াছে "যৌ (যে অশ্বিনীদ্বয়) অর্ভগায় (বালকায়) বিমদায় (এতৎ সংজ্ঞায় রাজর্ষয়ে) সেনাজুবা (শত্রুভিঃ দুষ্প্রাপেন) রথেন ন্যূহতু (বাহিতবন্তৌ)।" বিমদকে যখন বালক বলা হইয়াছে তখন তাঁহার পত্নীর যৌবনের পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সায়ণাচার্য তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, বিমদ তাঁহার পত্নীকে স্বয়ম্বর সভায় লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মূল মন্ত্রে স্বয়ম্বরের কোনও উল্লেখ নাই।

ঋগ্বেদ সংহিতা ১-১২৪-৭ এবং ৩-৩১-১এ পুত্রিকাপুত্র প্রথার উল্লেখ আছে। পুত্রিকাপুত্র প্রথাতে পিতা কন্যার বিবাহ দেন এই সর্ত্তে যে প্রথম পুত্র কন্যার পিতা পাইবেন। এই প্রথাতে পিতাই কন্যার বিবাহ স্থির করেন। সুতরাং ইহা স্বয়ম্বর প্রথা নহে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উষস্তি ঋষির পত্নীকে "আটিকী" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আটিকী শব্দের অর্থ—যে রমণীর স্তনোদ্গম হয় নাই।

এক্ষণে বেদে যে সকল স্থলে স্বয়ম্বর প্রথার উল্লেখ আছে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন।

কিয়তী যোষা মর্য্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পণ্যসা বার্য্যেণ
ভদ্রাবধূর্ভবতি যৎ সুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনেচিৎ।

—ঋগ্বেদ, ১০-২৭-১২

"কতকগুলি রমণী মনোহর বাক্যে আকৃষ্ট হইয়া অযোগ্য পতি নির্ব্বাচন করে—যাহারা ধনী এবং রমণীপ্রিয়। যে রমণী কল্যাণগুণযুক্তা এবং সুন্দরী সে স্বয়ং সৎপাত্র বরণ করে।"

এখানে স্বয়ম্বর প্রথার উল্লেখ আছে সত্য। কিন্তু ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা যায় না যে, সে সময় কেবলমাত্র স্বয়ম্বর প্রথাই প্রচলিত ছিল। কারণ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, ঋগ্বেদ সংহিতাতে বাল্যবিবাহের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের এই মন্ত্র (১০-২৭-১২) হইতে এরূপও অনুমান করা যায় না যে স্বয়ম্বর প্রথাই উত্তম, ইহাই বেদের অভিপ্রায়। শ্লোকটির তাৎপর্য আলোচনা করিলে বরং ইহার বিপরীতই প্রতীতি হইবে। বেদ বলিতেছেন যে, কতকগুলি রমণী অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করে, যে রমণী কল্যাণগুণযুক্ত অর্থাৎ সুবুদ্ধিমতী এবং সুন্দরী সে উত্তম পতি নির্ব্বাচন করে। উত্তম পতি নির্ব্বাচন করিবার জন্য দুইটি গুণ প্রয়োজন—সুবুদ্ধি ও সৌন্দর্য। কেবল সৌন্দর্য থাকিলে ধনী ব্যক্তি কর্তৃক প্রতারিত হইতে পারে; কেবল সুবুদ্ধি থাকিলে উত্তম পতি কর্তৃক মনোনীত না হইতে পারে। উভয় গুণের একত্র সমাবেশ সচরাচর দেখা যায় না। সুতরাং কন্যার উপর পাত্র নির্ব্বাচনের ভার থাকিলে অধিকাংশ স্থলে সে নির্ব্বাচন বাঞ্ছনীয় হইবে না। পিতার অভিজ্ঞতা অধিক; তিনি স্বভাবতই কন্যার হিতাকাংক্ষী; সুতরাং তিনি স্থির-বুদ্ধিতে যে পাত্র নির্ব্বাচন করিবেন তাহা কল্যাণজনক হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু পিতা যদি পাত্র নির্ব্বাচন করেন তাহা হইলে কন্যার বয়স অল্প হওয়া উচিত। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার একটি নিজস্ব মত হওয়া স্বাভাবিক এবং সে মত পিতার মতের অনুকূল না হওয়াই সম্ভব। ঋগ্বেদেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সবিতা সোমের সহিত তাঁহার কন্যা সূর্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সূর্যা অশ্বিনীদ্বয়কে পতিত্বে বরণ করিলেন এবং তাঁহাদের রথে উঠিয়া বধূরূপে তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন (ঋগ্বেদ সংহিতা, ১।১১৯।৫ এবং ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০।৮৫ সূক্তের সায়ণ-ভাষ্যের উপক্রমণিকা দেখুন)। বলা বাহুল্য, সূর্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মনুসংহিতাতে পিতা কর্তৃক পাত্র নির্ব্বাচন এবং স্বয়ং কন্যা কর্তৃক পাত্র নির্ব্বাচন উভয়েরই উল্লেখ আছে এবং পিতা কর্তৃক পাত্র নির্ব্বাচনপ্রথার প্রশংসা আছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ এবং প্রাজাপত্য, এই চারি প্রকার বিবাহে পিতাই পাত্র নির্ব্বাচন করেন (মনু, ৩২৭-৩০)। স্বয়ম্বর প্রথা গান্ধর্ব্ব বিবাহের অন্তর্গত। মনু ৩।৪১এ গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি বিবাহের নিন্দা আছে। মনু ৯।৯০ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, কন্যা ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে, তাহার মধ্যেও তাহার পিতা বিবাহ না দিলে নিজেই পাত্র নির্ব্বাচন করিবে। মনু ৯।৮৯ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, কন্যা ঋতুমতী হইলেও আমরণ পিতৃগৃহেই থাকিবেন বরং তাহাও বাঞ্ছনীয়, কিন্তু গুণহীন পাত্রে কখনও সমর্পণ করা উচিত নহে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সাধারণত ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে গুণবান পাত্র না পাওয়া গেলে ঋতুমতী হইলেও অবিবাহিত রাখা যাইতে পারে। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে মনুর ব্যবস্থা বেদানুযায়ী—উহা বেদবিরোধী নহে। সে ব্যবস্থা এই যে, কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে তাহার পিতা উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। কন্যা ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যেও যদি পিতা কন্যার বিবাহ দিতে না পারেন, তাহা হইলে পাত্র নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন, তখন কন্যা মনোমত স্বজাতীয় পতি নির্ব্বাচন করিবেন। কন্যা ঐরূপ বয়সপ্রাপ্ত হইবার পরে তাঁহার অবিবাহিত থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

গৃহ্যসূত্রে এইরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিবাহের পর তিন রাত্রি পতি পত্নীকে সম্ভোগ করিবেন না, চতুর্থ রাত্রিতে করিবেন। ইহা হইতে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কন্যা রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ দেওয়া অভিপ্রেত নহে। কিন্তু এই যুক্তি যথার্থ নহে। যে ক্ষেত্রে কন্যা রজঃস্বলা হয় নাই সে ক্ষেত্রে পত্নীতে উপগত হওয়া অবশ্যই অন্যায়। (পূর্ব্বোদ্ধৃত রোমশা ও ভাবযব্য সংবাদে এ বিষয়ে বেদের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট)—যে ক্ষেত্রে কন্যা রজঃস্বলা হইবার পর বিবাহ হইয়াছে (যেমন স্বয়ম্বর প্রথা) সে ক্ষেত্রে চতুর্থ রাত্রিতে সম্ভোগের বিধান প্রযোজ্য। সূত্রকারের যদি এরূপ অভিপ্রায় হইত যে, অজাতরজা কুমারীর বিবাহ হইবে না তাহা হইলে সেকথা স্পষ্টভাবেই বলা হইত।

বিবাহের মন্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, পত্নী পুত্রবতী হইবে। ইহারও

উদ্দেশ্য কন্যা ভবিষ্যতে পুত্রবতী হইবে। বিবাহের সময় কন্যা পুত্রধারণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

পৌরাণিক যুগে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে স্বয়ম্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্বয়ম্বরের উদ্দেশ্য এই যে ১৪ বা ১৫ বৎসরের পর কন্যা যেন অনূঢ়া না থাকে। অধিকন্তু ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সকল ক্ষেত্রেই যে কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা হইবার পর বিবাহ হইত ইহা বলা যায় না। সীতার সাত বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। দণ্ডকারণ্যে রাবণ যখন ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করিতে আসিয়াছিল তখন সীতা বলিয়াছিলেন যে, বিবাহের পর তিনি ১২ বৎসর অযোধ্যায় বাস করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। অতএব ক্ষত্রিয় রমণীদের কোনও ক্ষেত্রে ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহ হইত, কোনও ক্ষেত্রে ঋতুর পর বিবাহ হইত—সকল ক্ষেত্রেই ১৫।১৬ বৎসরের পূর্ব্বেই বিবাহ হইত।

বৃহস্পতি, ভাবযব্য, উষস্তি ইঁহারা সকলে বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বৃহস্পতি অজাতরজা কন্যার বিধাহ দিয়াছিলেন। ভাবযব্য ও উষস্তি অজাতরজা কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলের আচরণ কখনও বেদবিরোধী হইতে পারে না।

মনু পরাশর প্রভৃতি স্মৃতির ব্যবস্থা যে বেদানুযায়ী, তাহা সকল প্রাচীন বৈদিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতে মনুসংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং মনুর ব্যবস্থা প্রামাণিক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বেদ হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া মনুসংহিতা সমর্থন করিয়াছেন ঃ

যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজং

অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন সকলই ঔষধের ন্যায় হিতকারী। বলা বাহুল্য, শঙ্কর ও রামানুজের বহু শতাব্দী পূর্বে মনুসংহিতা বর্ত্তমান আকারে বিদ্যমান ছিল।

বিচারপতি লিণ্ডসে তাঁহার প্রণীত 'রিভোল্ট অফ্ মডার্ন ইয়ুথ' গ্রন্থে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছেন যে, আমেরিকায় যে সকল বালিকা স্কুল-কলেজে পড়ে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের চরিত্র দূষিত হয়। পাশ্চাত্য সমাজের অবস্থা দেখিয়া আমাদের এইরূপ শিক্ষালাভ করা উচিত যে, অল্প বয়সে বিবাহের শাস্ত্রানুমোদিত প্রাচীন ব্যবস্থাই সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। (ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৪৫)

বিবাহ-সমস্যা

বালিকাদের বিবাহ আজকাল অতি দুরূহ সমস্যা হইয়াছে, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন। পণপ্রথার জন্য সমস্যা দুরূহ হইয়াছে, ইহা যথার্থ নহে; সমস্যা দুরূহ বলিয়াই পণপ্রথা কুটিলভাবে দেখা দিয়াছে। পণপ্রথা রোগের কারণ নহে, ইহা লক্ষণ মাত্র। কারণ দুইটি;—আর্থিক অবনতি এবং বিলাসিতা। আয় কম; লোক যেরূপ কৃত্রিম ও বিলাস-বহুল জীবনে অভ্যস্ত হইতেছে, স্বল্প আয়ে সেরূপ জীবন নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়াছে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার প্রতিপালন করিবার মত আয় খুব অল্পসংখ্যক পাত্রেরই আছে। নিজ কন্যার জন্য সকলেই সঙ্গতিসম্পন্ন পাত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই কারণ পণপ্রথা ভয়ানকভাবে দেখা দিয়াছে।

বিবাহ-সমস্যার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—আর্থিক অবনতি এবং বিলাসিতা। এই উভয় কারণের মধ্যে আর্থিক অবনতি অপেক্ষা বিলাসিতাই গুরুতর কারণ। কিয়ৎপরিমাণে আর্থিক উন্নতি হইলে এই সমস্যা সমাধান করা যতদূর সম্ভব হইবে, সেই পরিমাণে বিলাসিতা দূর করিলে তদপেক্ষা অধিক সুফল পাওয়া যাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ সকল দেশে আর্থিক অবস্থা আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত; কিন্তু বিবাহ-সমস্যা বিশেষ সরল হয় নাই। অবিবাহিত স্ত্রীপুরুষের অনুপাত ঐ সকল দেশে আমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক অধিক। আমাদের দেশের যদি বহু পরিমাণে আর্থিক উন্নতি হয়, কিন্তু আমাদের সমাজ যদি পাশ্চাত্যসমাজের অনুকরণ করিতে চাহে (আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের সে বিষয়ে ব্যগ্রতা দেখা যায়), তাহা হইলে বিবাহ সমস্যার কিছুই সমাধান হইবে না।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজে বিবাহ-সমস্যা আবির্ভাব হইবার কারণ আমাদের পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণপ্রিয়তা। বহুবিধ পাশ্চাত্য 'মালের' সহিতই আমরা এই সমস্যা আমাদের দেশে আমদানী করিয়াছি। এ জন্য ইংরাজী-শিক্ষিত লোকের মধ্যেই এই সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অশিক্ষিত সমাজে এই সমস্যা প্রবল হয় নাই। আমার যতদূর বিশ্বাস, সংস্কৃত-শিক্ষিত

ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজেও এ সমস্যা সেরূপ প্রবল হয় নাই। অথচ অশিক্ষিত সমাজ এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজ নিশ্চয়ই ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজ অপেক্ষা আর্থিক উন্নত নহে।

সমাজ-জীবনে বিবাহ একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় সংস্কার। বিবাহপ্রথাই পশুসমাজ এবং মানবসমাজের মধ্যে পার্থক্যের একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন। ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজে এ বোধ নাই। অশিক্ষিত সমাজে এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজে এ বোধ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এ জন্য শেষোক্ত সমাজে বিবাহ-সমস্যা তেমন প্রবল হইয়া দেখা দেয় নাই।

বাস্তবিকপক্ষে সমাজ দরিদ্র হইলে সেই সমাজে বিবাহ-সমস্যা বিশেষ দুরূহ হইবার ততদূর কারণ নাই। কন্যার ভরণপোষণের ব্যবস্থা পিতৃগৃহে না হইয়া শ্বশুরগৃহে হইলে তাহা সমগ্র সমাজের ব্যয়বাহুল্যের কারণ হয় না। ব্যয়-বাহুল্যের কারণ দুইটি ;—বিবাহ উৎসবের ব্যয় এবং সন্তান হইলে সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয়। বিবাহ মানব-জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এ জন্য এই উপলক্ষ্যে ব্যয় করিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। উৎসবের আনন্দ একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য সম্পাদন করে,—দরিদ্রের জীবনেও ইহা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় কোনও ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। উৎসবের ব্যয় সংযত করা সমাজের অবশ্যকর্ত্তব্য। বিবাহ হইলে ব্যয়বাহুল্যের অপর কারণ সন্তানের ভরণপোষণ। কিন্তু সন্তানের জন্ম না হইলে সমাজের জীবনরক্ষা হয় না। সমাজের জীবনরক্ষার জন্য যাহা অপরিহার্য্য, তাহার জন্য যে ব্যয়, তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় নাই। জীবনে যে পরিমাণে কৃত্রিমতাবর্জ্জন করা যাইবে, সে পরিমাণে এই অতিরিক্ত ব্যয় কমান যাইবে।

পাত্র উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিবে, এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে তাহার ফল এই হইবে যে, খুব উচ্চপণে বিবাহ হইবে এবং অনেক বালিকার বিবাহ হইবে না। কারণ, উপার্জ্জনক্ষম পাত্রের সংখ্যা কম। বিবাহ যদি অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মসংস্কার বলিয়া সকলের দৃঢ়বিশ্বাস থাকে এবং উপার্জ্জনের পূর্ব্বেই যদি বিবাহের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে পণপ্রথার অত্যাচার কমিয়া যায়। পূর্ব্বে সকলের এইরূপ বিশ্বাস ছিল, এ জন্য পূর্ব্বে অতিরিক্ত পণের প্রথা ছিল না। এখনও হিন্দু সমাজের যে সকল শ্রেণীতে এই ধারণা আছে, সে সকল শ্রেণীতে পণের জন্য বিবাহের বিশেষ বাধা হয় না।

পূর্ব্বে মেয়ের বয়স ৯।১০ বৎসর হইলেই তাহার সম্বন্ধের চেষ্টা করা হইত,

১১।১২ বৎসরের পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হইত। আজকাল মেয়েরা স্কুলে কলেজে পড়ে, ১৫।১৬ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহের চেষ্টা করা হয় না, যাহাদের রূপ বা অর্থবল নাই, তাহাদের সম্বন্ধ স্থির করিতে দেরী হয়, মেয়ে ১৯।২০ বৎসরের হইয়া যায়, তখন বিবাহ হওয়া আরও দুরূহ হয়। সমাজের যদি সকল কন্যার বিবাহ দেওয়া বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে মেয়েদের অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। হিন্দুদের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলিয়া অধিকাংশ রমণীরই (প্রায় সকল রমণীরই) বিবাহ হইত, এবং সমাজে শান্তি ও পবিত্রতা বিরাজ করিত। এই ব্যবস্থা নাই বলিয়াই পাশ্চাত্য সমাজে অনূঢ়া বয়স্কা রমণীর সংখ্যা এত অধিক, এবং সমাজে নানা অশান্তি এবং অনাচার প্রচলিত দেখা যায়। যাঁহারা কন্যার বিবাহ দিতে আন্তরিক ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যতদূর সম্ভব কন্যা অল্পবয়স্ক থাকিতেই এ বিষয়ে উদ্যোগী হইবেন। বালকদের পিতারাও বালকদের পাঠ সমাপ্ত হইলেই যথাসম্ভব শীঘ্র তাহাদের বিবাহ দিবেন, এবং অত্যধিক পণের লোভ ত্যাগ করিবে। পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হয় নাই বলিয়া অথবা অত্যধিক পণের আশায় যাঁহারা পুত্রের বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক হয়েন, তাঁহারা সমাজের অনিষ্টকারী—সমাজের অনিষ্ট হইলে তাঁহারা নিজেরাও সে অনিষ্ট ভোগ করিবেন।

(মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৪০)

———

স্ত্রী-শিক্ষা

যে শিক্ষাপ্রভাবে আমাদের বালকগণ ধর্ম্মভাববর্জ্জিত ও অনাচারী হইয়াছে, বালিকাগণকেও সেই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয় না। বালকদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষা না দিয়া উপায় নাই। তাহাদিগকে চাকুরী করিতে হইবে, ওকালতী ও ডাক্তারী করিতে হইবে। বালিকাদিগকে চাকুরী করিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষা না দিলেও চলে।

পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রথম দোষ,—ইংরাজী ভাষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ। শিক্ষার বিষয় হইতেছে, ইংরাজী; গণিত, সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি

বিষয়গুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে—ইংরাজী। অতএব সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় যে ইংরাজী, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না; এইরূপ ইংরাজির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলে নবীন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনীর মনে দাসজনসুলভ মনোভাব এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাব স্বতঃই আবির্ভূত হয়। তাহারা মনে করে, ইংরাজী ভাষা যখন শ্রেষ্ঠ শিক্ষণীয় বিষয় তখন যাহারা এই ভাষায় কথা বলে। তাহারাই শ্রেষ্ঠ জীব; ইংরাজদের বেশভূষা আচার-ব্যবহার সকলই শ্রেষ্ঠ, অতএব অনুকরণীয়, পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মের কথা স্কুলে কিছু পড়া যায় না, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর মধ্যেও ধর্ম্মভাব বিশেষ কিছু দেখা যায় না; সুতরাং ইহাদের মনে হয় ধর্ম্ম কুসংস্কারের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভুগোল পড়িয়া দেখা যায়, পৃথিবীতে ইংরাজ-অধিকৃত দেশই বিস্তৃততম; স্বাধীন ও সভ্যদেশের মধ্যে অধিকাংশই খৃষ্টান; স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নাই বলিলেই চলে। ইতিহাস পড়িয়া শিক্ষা হয়—ইংরাজ আসিয়া আমাদের দেশে শান্তি-স্থাপন করিয়াছে, তাহার পূর্ব্বে কিছু দিন ধরিয়া কেবলমাত্র মারামারি কাটাকাটি হইত। এই অরাজকতার পূর্ব্বে ছিল মোগল-রাজত্ব, তাহার পূর্ব্বে পাঠান-রাজত্ব; তাহার পুর্ব্বে দুই চারি জন বড় হিন্দু রাজা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় নাই, বরং খুব বড় বৌদ্ধ রাজা কয়েক জনের অনেক কথা জানা যায়।

স্কুলের বালক শিখিল না যে, ইংরাজের পূর্ব্বপুরুষগণের যখন বাসগৃহ ছিল বনজঙ্গল বা পর্ব্বতগুহা, পরিধেয় ছিল পশুচর্ম্ম, জীবিকা ছিল পশু-শিকার, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তখন গ্রাম ও নগরে সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিতেন, কৃষিকর্ম্ম করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেন, ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, তপস্যা করিতেন, বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রচার ছিল। তাহারা শিখিল না যে, ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তাঁহাকে পাইবার উপায় সম্বন্ধে হিন্দুগণ অতি পুরাকালে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তে অন্য কোনও জাতি উপনীত হইতে পারে নাই। একমাত্র ভারতবর্ষেই প্রচারিত হইয়াছিল যে, ক্ষুদ্রতম জীবেরও প্রাণ পবিত্র, প্রাণিহিংসা মহাপাপ। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের ঋষিগণ প্রণিধান করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সাংসারিক সুখ-ঐশ্বর্য্যে মানবের তৃপ্তি হইতে পারে না, এজন্য তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা—

ভোগ ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত করিবার জন্য নিযুক্ত না করিয়া অমৃতত্বলাভের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাহারা শিখিল না যে, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারকগণ ভারতবর্ষেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, বাল্মীকি, ব্যাস, পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষি-মুনি এই পবিত্র ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম-জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; তাহারা শিখিল না যে এই প্রাচীন আধ্যাত্মিক বিদ্যা শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া অখণ্ড ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে এবং ভারতের রাজনৈতিক অধীনতার যুগেও শ্রীচৈতন্যদেব, ভাস্করানন্দ, তৈলঙ্গস্বামী, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষ সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা শিখিল না যে, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, ঐশ্বর্য অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞান অপেক্ষা ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসী নানা কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুরাগী এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হন। প্রথম তিনি যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, তাহাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণ-কীর্ত্তনই বেশী থাকে, ভারতীয় সভ্যতার গুণকীর্ত্তন অতি সামান্যই থাকে; নিন্দাবাদই বেশী থাকে। দ্বিতীয়, পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রেয়মূলক, ভারতীয় সভ্যতা শ্রেয়োমূলক। উপনিষদ বলিয়াছেন,—

অন্যচ্ছ্রেয় অন্যদুতৈব প্রেয়ঃ তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তে অর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীতে।

"শ্রেয় এবং প্রেয় বিভিন্ন স্বভাবের বস্তু। তাহারা বিভিন্ন প্রয়োজন জন্য পুরুষকে বন্ধন করে। যাহারা শ্রেয় গ্রহণ করে, তাহাদের কল্যাণ হয়। যাহারা প্রেয় বরণ করে, তাহারা ইষ্টবস্তু লাভ করিতে পারে না।"

প্রেয় বস্তু আপাততঃ মনোহর, কিন্তু অবশেষে কষ্টদায়ক। আর শ্রেয়বস্তু প্রথমে কষ্টদায়ক, কিন্তু শেষে সুখদায়ক। গীতায় শ্রেয়কে সাত্ত্বিক সুখ এবং প্রেয়কে রাজসিক সুখ বলা হইয়াছে।

"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।"

যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় এবং পরিণামে অমৃতের ন্যায়, তাহা সাত্ত্বিক সুখ, যথা—সংযম, ত্যাগ, বৈরাগ্য, তপস্যা।

"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥"

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে যে সুখের উৎপত্তি, যাহা প্রথমে অমৃতের ন্যায় মধুর, কিন্তু পরিশেষে বিষের ন্যায় কষ্টদায়ক, তাহা রাজসিক সুখ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলমন্ত্র বিষয়সুখভোগ। অভাব যত পার বাড়াইয়া যাও। থিয়েটার, বায়স্কোপ, রেডিও, গ্রামোফোন, মোটর, এয়ারোপ্লেন, নিত্য নূতন বিলাসের উপকরণ। ভাল বেশ-ভূষা কর, যাহা ভাল লাগে, তাহাই খাও, হোটেলে রেস্তরায় যেখানে সেখানে যাহার তাহার দ্বারা পরিবেষিত অন্ন ভোজন কর, জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ কি? সপ্তাহে একবার সুসজ্জিত হইয়া ঘণ্টাখানেকের জন্য ভজনালয়ে গিয়া বসিলেই ধর্ম্মের ঋণ শোধ হইবে। হিন্দুর সভ্যতা অন্যরূপ। জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য এই ভাবে অনুষ্ঠান করিবে—যাহাতে মন ভগবদভিমুখ হয়। প্রভাতে উঠিয়া, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া, স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া শয্যাত্যাগ করিবে, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ঈশ্বরকে উপাসনা করিবে. সদাসর্ব্বদা তাঁহার নাম জপ করিবে, যাহা কিছু আহার—তাঁহাকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ মনে করিয়া ভোজন করিবে, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবে, চিত্তবিনোদনের জন্য ধর্ম্মসঙ্গীত, যাত্রা-কথকতা শুনিবে। এই দুই পথের মধ্যে কোন্ পথ ভাল? প্রথম পথ আপাতমধুর। যাহা আপাতমধুর, মানব স্বভাবতঃ তাহার জন্যই ব্যগ্র হয়। তাই আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসী পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুরাগী।

আর এক কারণে ইঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুরাগী। ইংরাজ বিজেতা, আমরা বিজিত। সুতরাং ইংরাজদের সভ্যতাই শ্রেষ্ঠ, আমাদের সভ্যতা নিকৃষ্ট। যে পরিমাণে আমরা ইংরাজী সভ্যতার অনুকরণ করিতে পারিব, সে পরিমাণে আমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত হইব। আমরা ভুলিয়া যাই যে, অনুকরণ মৃত্যুর পথ, স্বতন্ত্রতা-রক্ষাই স্বাধীনতার পথ। ঐ বৃক্ষপত্রটি মাটীর উপর পড়িয়া আছে, যত দ্রুতভাবে উহা মৃত্তিকার অনুকরণ করিবে, তত শীঘ্র উহার মৃত্যু হইবে। আর ঐ যে বীজ মাটী-চাপা আছে, উহা মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতেছে না, নিজের স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত করিতেছে না, উহা মরিবে না, কালক্রমে বিশাল মহীরুহে পরিণত হইবে। ইংরাজ শাসনের ফলে আমরা যদি তাহাদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় মৃত্যু অদূরবর্ত্তী। যদি যত্নপূর্ব্বক আমাদের ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে পারি, তবেই শত বাধা অতিক্রম করিয়া আমাদের জাতীয় জীবন বিকাশিত হইবে।

ইংরাজী শিক্ষা এবং সভ্যতার মোহে আমরা আমাদের জাতীয় জীবন, ধর্ম্মজীবন হারাইতে বসিয়াছি। ধর্ম্মজীবনের কি মূল্য, তাহাও আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। তাই বালিকাদিগকেও এই পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত করিতে আমরা

উন্নত হইয়াছি। যত দিন রমণীগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল, তত দিন আমাদের ধর্ম্মভাব জাগ্রত ছিল। কারণ, গৃহে রমণীর প্রভাবই সমধিক।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" আবাসস্থানকে গৃহ বলা যায় না, গৃহিণীই প্রকৃত গৃহ।

তাই পুরুষগণ ইংরাজী-শিক্ষিত হইলেও ভারত-রমণী ব্রত, পূজা, পার্ব্বণ অনুষ্ঠানে গৃহে গৃহে ধর্ম্মভাব জাগ্রত রাখিয়াছেন, এবং সন্তানগণের কোমল হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ বপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ইংরাজী-শিক্ষাও চলুক, ভারতীয় সভ্যতা ও শিক্ষা দেওয়া হউক, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া কঠিন। বালক বা বালিকারা যতগুলি বিষয় শিখিতে পারে, তাহার একটা সীমা আছে। যে পরিমাণে ইংরাজী শিক্ষা হৃদয় অধিকার করিবে, সে পরিমাণে ভারতীয় সাধনা হৃদয় হইতে বাহিরে থাকিবে। একটি মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশনে বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহার মা তাঁহাকে "সীতা" নাটক দেখাইতে লইয়া যাইবার সময় বলিতেছিলেন, মেয়ে ত রামায়ণ পড়িবার সময় পান নাই, নাটক দেখিলে রামায়ণ গল্পটা শিখিতে পারিবেন! বোধ করি আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক মেয়েই রামায়ণ-মহাভারত পড়িবার অবসর পান না।

আমাদের মেয়েদের যে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহাতে ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থাকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দিতে হইবে। ইংরাজী অপেক্ষা সংস্কৃত শিক্ষা বেশী মূল্যবান, এই ধারণা স্থির রাখিতে হইবে। রামায়ণ-মহাভারত বার বার পড়িয়া এই দুইটি গ্রন্থের শিক্ষা তাহাদের অস্থিমজ্জাগত করিয়া দিতে হইবে। তাহার পর তাহারা সংস্কৃত কাব্য, ইতিহাস, স্মৃতি, দর্শন, উপনিষদ, প্রভৃতি পড়িবে। সংস্কৃত-শিক্ষা ও ধর্ম্ম-শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর ইংরাজী ক্যব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান শিখাইবার বন্দোবস্ত থাকুক আপত্তি নাই। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যে নিপুণতা এবং অনুরাগ রমণীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার চাপে এই নিপুণতা এবং অনুরাগ যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মাসিক বসুমতী মাঘ ১৩৩৯

বালিকাদের শিক্ষা-সমস্যা *

কুললক্ষ্মীগণ, ভদ্রমহোদয়গণ—

কাল আপনারা অনেক সুন্দর আবৃত্তি এবং গান শুনিয়াছেন। অনেকগুলি আবৃত্তি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। ছোট ছোট মেয়েদের আবৃত্তি ও গান শুনিয়া আমরা সকলেই আনন্দিত হইয়াছি। যাহারা বহু যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া বালিকাদিগকে আবৃত্তি ও গান শিখাইয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ। যে বালিকাগুলি উৎকৃষ্ট পাঠ ও আবৃত্তি করিয়াছে, আজ তাহাদিগকে পুরস্কার দ্বারা উৎসাহিত করা হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের বালিকাগণকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। সীতা, সতী সাবিত্রীর শোণিত যাহাদের ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদিগকে আর কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব। আশীর্ব্বাদ করি তাঁহাদের পবিত্র চরিত্রের আদর্শে তোমাদের জীবন যেন গঠিত হয়। তাঁহাদের চরিত্র অনুসারে জীবন গঠিত করিতে হইলে তাঁহাদের জীবনী, কথা বারম্বার পাঠ ও আলোচনা করা উচিত। বড় বড় কাজ করিয়া দেশবিখ্যাত হইবার সুযোগ তোমরা অনেকে পাইবে না। তাহাতে ক্ষতি নাই; ছোট ছোট কাজগুলি যত্নপূর্ব্বক করিবে, ভগবান্ এই কাজ করিবার ভার দিয়াছেন, এইসব কাজ করিলে তাঁহাকে সেবা করা হইবে, ইহা ভাবিয়া কাজ করিবে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ প্রীত হইবেন। বড় কাজ করিলেই ভগবান্ প্রীত হন, ছোট কাজ করিলে তিনি প্রীত হন না, এরূপ নহে। যাহার যাহা কাজ, "ছোট হোক বড় হোক পরের নয়নে পড়ুক বা না পড়ুক"—সেই কাজই যত্নপূর্ব্বক করিলে—ভগবান প্রীত হন।

বালিকাদিগকে বলিবার আর আমার কিছু নাই। অতঃপর বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি। আপনারা বহু পরিশ্রম করিয়া এই বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন, ভগবানের আশীর্ব্বাদে আপনাদের উদ্যম যেন ফল প্রসব করে এবং সকল পরিশ্রম যেন সার্থক হয়। বিদ্যা শিক্ষা

---

* কোনও বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

করিয়া বালিকাগণ অনেক সদগ্রন্থ পাঠ করিতে পারে, বিনয়, সংযম, পবিত্রতা, ভগবদ্ভক্তি অর্জ্জন করিয়া জীবন মহৎ ও সার্থক করিতে পারে, সূচিবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষা করিতে পারে। প্রার্থনা করি, আপনাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ এই ভাবে তাহাদের শিক্ষা সার্থক করুক।

সকল শুভবস্তুর অপব্যবহার হইতে পারে, শিক্ষারও যে অপব্যবহার হইতে পারে ইহা বিচিত্র নহে। অপব্যবহার হইলে শিক্ষার কিরূপ কুফল হইতে পারে, তাহার আলোচনাও প্রয়োজনীয়, কারণ তাহা হইলে সেই কুফল যাহাতে না হয়, সে বিষয়ে আমরা সকলে যত্নবান হইতে পারি। পূর্ব্বে আমাদের মেয়েরা স্কুলে পড়িত না। মায়েদের কাছে একটু লিখিতে ও একটু পড়িতে শিখিত, তখন তাহারা মা ঠাকুরমাদের নিকট রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইত। একবার দুইবার বহুবার তাঁহারা এই সকল গ্রন্থের চিত্তোৎকর্ষকারিণী অথচ হৃদয়গ্রাহিণী কাহিনী পাঠ করিত, পাঠ করিতে করিতে আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইত, অশ্রুজলে গণ্ডস্থল পরিপ্লাবিত হইত, যাহারা পড়িত, তাহারাও কাঁদিত, যাঁহারা শুনিতেন, তাহারাও কাঁদিতেন। কি পড়িত? "সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয় জয়।" কি শিখিত? শিখিত "যে ধর্ম্ম নিত্য, ধর্ম্ম দৈব, স্বার্থপরতা মন্দ, পরের জন্য জীবন, ঈশ্বর আছেন, পাপপুণ্য আছে, পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, জন্ম নিজের জন্য নহে, পরের জন্য, অহিংসা পরমধর্ম্ম, লোকহিত পরম কার্য্য" (বঙ্কিমচন্দ্র) সংক্ষিপ্ত রামায়ণ হয় ত আজও আপনাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত। মহাভারত পাঠ্য কি না জানি না। কিন্তু আগে মেয়েরা যেভাবে পড়িত, যেভাবে পড়িয়া ইহারা অমূল্য উপদেশগুলি বালিকার কোমল হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইত, শিক্ষাগুলি অস্থিমজ্জাগত হইত, আজকাল কি সেরূপ হয়?

আমি পূর্ব্বে বালিকাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, তাহারা যেন সীতা সতী সাবিত্রীর মত হয়। ইহাও বলিয়াছি যে, তাঁহাদের আদর্শে চরিত্র গঠিত করিতে হইলে, তাঁহাদের চরিত্র বারম্বার পাঠ ও আলোচনা করা উচিত। আজকাল বিদ্যালয়ের ছাত্রীর কি তাহার সুযোগ আছে? বালিকারা বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ কি পাঠ অভ্যাস করে, তাহা তাহাদের কল্যকার কবিতা ও গান হইতে পরিচয় পাওয়া যাইবে। এতগুলি কবিতা, এতগুলি গান শুনিলাম. একটিতেও সীতা, সতী বা সাবিত্রীর নামোল্লেখ পর্য্যন্ত শুনিয়াছি বলিয় হয় না। তাহা হইলে কি আজকালকার শিক্ষায় সীতা, সতী ও

চরিত্রকে কোণঠাসা করিয়া রাখা হইতেছে? জানি এ বিদ্যালয়ে কেবল হিন্দু বালিকা পড়ে না, ব্রাহ্ম বালিকারাও পড়িয়া থাকে। কিন্তু সীতা, সতী, সাবিত্রীর চরিত্রে কি এমন কোনও বস্তু আছে, যাহা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিরোধী, শুধু ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন ইহাতে কি এমন কিছু আছে যাহাতে মুসলমান বা খৃষ্টান আপত্তি করিতে পারেন?

ধর্ম্ম বিশ্বাসে আঘাত লাগিবার কথা যখন উঠিল তখন একটা বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কাল একটি কবিতার আবৃত্তি শুনিলাম, নাম, "ধূলা মন্দির।" রবীন্দ্রনাথের কবিতা। কবিতার প্রথম লাইন "ভজন পূজন সাধন আরাধনা, সমস্ত থাক পড়ে।" "নয়ন মেলে দেখ তুই চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে।" আমি শুনিয়াছি আপনারা অনেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পরমভক্ত। মন্দিরের মধ্যে যে সাধনা করিয়া পরমহংসদেব সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এই কবিতায় সে সাধনা সম্বন্ধে কি সুন্দর মন্তব্য প্রকাশ করা হইল! ঈশ্বর মন্দিরে নাই, অতএব ভজনপূজন সাধনা আরাধনা সব ফেলিয়া মন্দির পরিত্যাগ কর। রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতার বিরোধী। তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে মত প্রচার করা। কিন্তু আমরা, আমাদের কোমল মতি বালিকাদিগকে এই কবিতা মুখস্থ করিয়া কি মনোভাবের পরিচয় দিতেছি? যে বয়সে একটি কথা যাহা শিক্ষা করা যায়, পরিণত বয়সে শত সহস্র যুক্তি দিয়াও তাহার ফল বিলুপ্ত করা যায় না, যে কোমল হৃদয়ে জ্ঞানের একটা ক্ষুদ্র বীজ পতিত হইলে বয়সের সহিত সেই বীজ বৃক্ষে পরিণত হয় এবং সহস্র ফল ফুলে বিকশিত হইয়া চিরজীবন মধুময় অথবা বিষময় করিয়া তুলে সেই বয়সে আমরা শিখাইতেছি যে, মন্দিরে দেবতা নাই, ভজন পূজন সাধন আরাধনা সকলই মিথ্যা।

কিন্তু আপত্তি হইতে পারে—কবিতাটির শেষে বড় সুন্দর উপদেশ আছে। জানি আছে। কুলি মজুরের পরিশ্রম অতি মহৎ, সেখানে ভগবান্ আছেন। বেশ কথা। কিন্তু মন্দিরে তিনি কেন নাই? ভগবান্ কি তাহা হইলে সর্ব্বত্র বিরাজ করেন না? রবি বাবুর ন্যায় ভগবানও কি পৌত্তলিকতার গন্ধ পাইলে সে স্থান ত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করেন? ভজন পূজন ছাড়িয়া রবি বাবু ...ন সাধনা উপদেশ দিয়াছেন? কুলি মজুরের সহিত মাটি কাটিতে হইবে? ...াটা ভাল কাজ। কিন্তু মন্দিরে পূজা করা অপেক্ষা মাটী কাটা ভাল ভগবানকে লাভ করিবার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা নহে। কয়জন

সাধক এইরূপ সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন? শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, চৈতন্যদেব, পরমহংসদেব, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ, রামমোহন রায়, কেশব সেন, ভগবানকে লাভ করিবার জন্য কে মাটী কাটিয়া সাধনা করিয়াছেন? যে সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ কবিতার শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন, তিনি নিজে এই সাধনা কতদূর চর্চ্চা করিয়াছেন? রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়াও কেহ এই সাধনা গ্রহণ করে না। মন্দিরেও পূজা করে না, মাটী কাটিয়াও ভগবান্‌কে পাইবার চেষ্টা করে না। সুতরাং ভগবানকে লাভ করিবার পথের এই কবিতা সম্পূর্ণ হন্তারক।

বস্তুতঃ ভগবান সর্ব্বত্র আছেন,—কোথাও বেশী প্রকাশ. কোথাও কম প্রকাশ। যেখানে তাঁহার প্রকাশ বেশী সেইখানে তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র, যেখানে ভগবানের প্রকাশ কম সেখানে আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি না। মন্দিরের মধ্যে তাঁহার প্রকাশ বেশী, মাটী কাটার মধ্যে, ধূলা মাটীর মধ্যে তাঁহার প্রকাশ কম, এ জন্য মন্দিরের মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা বিহিত হইয়াছে।

এই কবিতাকে লক্ষ্য করিয়া আমি ইহাই বলিতে চাহি যে, আমাদের বিশেষ সাবধান হইতে হইবে বালিকাগণ ধর্ম্মবিরোধী শিক্ষা লাভ না করে। মেয়েরা স্কুলে লেখা পড়া শিখিতেছে, প্রাইজের বই আসিতেছে, ইহাতে আমরা বড়ই নিশ্চিন্ত থাকি। এমন কি আমাদের মেয়েদের প্রতি সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, গুণবান্ পাত্রের হস্তে তাহাদিগকে সম্প্রদান করা, সে বিষয়েও যেন কতকটা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। উচ্চ শিক্ষা কি মেয়েদের বিবাহের অভাব পূরণ করিতে পারে? আমার ত মনে হয় না। আমার মনে হয় মেয়েদের বিবাহের পরিবর্ত্তে উচ্চ শিক্ষা দিয়া তাহাদের জীবনের প্রকৃত সুখ-সম্পদের পরিবর্ত্তে একটা নকল জিনিষ দিয়া আমরা মিথ্যা আত্মতৃপ্তি পাইতেছি যে, ইহাদের প্রতি খুব বড় কর্ত্তব্য করিলাম। ইহার উত্তর হয় ত শুনিব, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় না কি করিব? আমার মনে হয় আমরা কিছু বিলম্বে পাত্রের অন্বেষণ করি, যথেষ্ট অনুসন্ধান করি না এবং অতিরিক্ত অর্থশালী পাত্রের চেষ্টা করি। আগে ত সকল কন্যার পাত্র পাওয়া যাইত। এখন পাওয়া যায় না কেন? স্কুল কলেজে উচ্চশিক্ষার সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই ত? এখনও যাহারা স্কুল কলেজে পড়ে না তাহাদের অল্প বয়সেই ত বিবাহ হয়, পাত্রও পাওয়া যায়। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। ভদ্রবংশের সচ্চরিত্র যুবকের সংখ্যা কি

কম? দারিদ্র্য? সে ত আমাদের বাঙ্গালী জীবনের চিরসাথী। দারিদ্র্যের মধ্যেও বিবাহিত জীবনে যে শান্তি ও সুখ পাওয়া যায় অবিবাহিত জীবনে কি তাহা পাওয়া যায়? যাহারা কন্যাদায়গ্রস্ত তাঁহাদেরও ত পুত্র আছে। সকলে যদি হৃদয়ঙ্গম করেন যে, তাহাদের পুত্রের জন্য সদ্বংশজাত বধূ গৃহে আনা সমাজের প্রতি তাহাদের সুমহৎ এবং পবিত্র কর্ত্তব্য এবং এ বিষয়ে কন্যার পিতাকে পীড়ন করা মহাপাপ, তাহা হইলে কন্যাদায়ের একটা সহজ ও স্বাভাবিক মীমাংসা হইয়া যায়।

যে যেরূপ কর্ম্ম করে সে সেইরূপ ফল পায়। যে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের দুঃখমোচনে যত্নবান্ হয়, কর্ম্মফলের অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে সে সমাজের ব্যক্তিগণ কেহই কন্যাদায়ে কষ্ট পায় না। মেয়েদের বিবাহ সহজসাধ্য করিতে হইলে আর এক বিষয়ে আমাদের যত্নবান হইতে হইবে, মেয়েরা যেন গৃহকর্ম্মকুশল হয় এবং বিলাসী না হয়। যাহারা গৃহে বধূ আনিবেন, তাঁহাদের যেন ইহা ধারণা না হয় যে, একটা অতিরিক্ত ব্যয় করিবার যন্ত্র আনিতেছি, ইহার দ্বারা গৃহকর্ম্মের কোনও সুবিধা হইবে না।

আমাদের বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন আধুনিক উচ্চ শিক্ষা যেন ইহার বিপরীত ফল প্রসব করিয়া মেয়েদের বিবাহ কষ্টসাধ্য করিয়া তাহাদের প্রকৃত সুখের অন্তরায় না হয়।

আমি যদি আপনাদের কাহারও মনঃকষ্ট দিয়াছি তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনারা আমাকে সভাপতির আসন দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, বিনিময়ে যদি আমি আপনাদের মনঃকষ্ট দিই, তাহা হইলে সে অকৃতজ্ঞতার ফলে নরকেও আমার স্থান হইবে না। অন্তর্যামী জানেন আপনাদের মনে কষ্ট দিব বলিয়া আমি এ সকল কথা বলি নাই। আমার অন্তরে যে দারুণ মনঃকষ্ট পাইয়াছি, তাহাই বন্ধুভাবে আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম। আমাদের মেয়েদের ঐকান্তিক মঙ্গল হউক ইহা আমার আন্তরিক কামনা। ইংরাজের অনুকরণে আমাদের দেশে যে উচ্চ শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে যেন সে মঙ্গল হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কাল অপরাহ্ণে পুরস্কার বিতরণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ক্রুদ্ধ বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া চন্দ্রাতপ উড়াইয়া দিবার যে উপক্রম করিয়াছিল, তাহার মধ্যে কি বিধাতার এই ইঙ্গিত ছিল না,—হিন্দুর মেয়ে যে এতগুলি গান কবিতা আবৃত্তি করিয়া পুরস্কার লইতে যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে সীতা, সতী, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, অহল্যা-বাঈ, রাণী-ভবানী, পদ্মিনী, জওহর-বাঈ, ধাত্রী-পান্না, মীরা-বাঈ, লক্ষ্মী-বাঈ—কাহারও নাম একবারও উচ্চারিত হইল না,—ইহা যে শিবহীন যজ্ঞের ন্যায় ব্যর্থ?

সর্দা আইন

সর্দা আইন ত পাশ হইয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার যে আর আলোচনা হইবে না, বা হওয়ার প্রয়োজন নাই তাহা বলা যায় না। এই আইন হিন্দু সমাজের একটী মৌলিক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া বাল্য-বিবাহ হিন্দু সমাজে চলিয়া আসিয়াছে। ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, হিন্দু সমাজে সর্ব সাধারণ এই নিয়ম মানিয়া চলিয়াছে, স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ একবাক্যে এইরূপ বিধান দিয়াছেন। এই বিধান পরিবর্ত্তন করিবার আইন পাশ হইলেও এ বিষয়ে আলোচনা অবশ্যম্ভাবী। এবং ইহার যে কোনও ফল নাই তাহাও নহে। আইন পাশ হইলেই একটা সামাজিক সমস্যার শেষ মীমাংসা হইয়া যায় না। আজ সর্দা আইন পাশ হইল, আবার কিছুদিন পরে সে আইন রদ হইতে পারে। যদি দেখা যায় যে দেশের অধিকাংশ হিন্দু এই আইনের বিরোধী, তাহা হইলে এই আইন পরিবর্ত্তন হইবে।

যাঁহারা বাল্য-বিবাহের বিরোধী, তাঁহারা বলেন, বাল্য-বিবাহে বালিকা বধুর শরীর খারাপ হয়। কিন্তু কেবল শরীর লইয়াই ত মানুষ নয়। মানুষের মন বলিয়া একটা জিনিষ আছে এবং এই জিনিষটা শরীরের চেয়েও বড়। যদি দেখা যায় যে বাল্য-বিবাহে দাম্পত্য-প্রেম, ও পারিবারিক শান্তি বেশী হয়, স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সেবা-প্রবৃত্তি প্রভৃতি সমধিক পরিমাণে বিকশিত হইবার অধিকতর সুযোগ হয়, তাহা হইলে শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও বাল্যৎ বিবাহকে সমর্থন করা উচিত। সমাজে শারীরিক শক্তি-সম্পন্ন নরনারী যত বাঞ্ছনীয়, মানসিক সদ্‌গুণাবলিযুক্ত নরনারী তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাঞ্ছনীয়। কোনও সামাজিক নিয়ম সম্পূর্ণ নির্দোষ বা সম্পূর্ণ নির্গুণ হইতে পারে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি দেখিবেন একটা নিয়মের গুণ বেশী, না দোষ বেশী। যদি গুণ বেশী হয়, দোষ কম হয়, তাহা হইলে সে নিয়মের সমর্থন করা উচিত। যদি দোষ বেশী হয়, গুণ কম হয়, তাহা হইলে সে নিয়মের বিরোধাচরণ করা উচিত। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, বাল্য-বিবাহের গুণ বেশী এবং দোষ কম। এজন্য এ নিয়ম সমর্থন করা উচিত।

স্বামী স্ত্রী উভয়ের মনের মিলন বিবাহের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা অধিক। অল্প বয়সে মনের বৃত্তি সকল কোমল থাকে, সে সময়ে যে মিলন হয় তাহা যেমন পরিপূর্ণ হইবার যতদূর সম্ভাবনা থাকে, বেশী বয়সে বিবাহ হইলে ততদূর সম্ভাবনা থাকে না। কচি লতা যেমন সুন্দরভাবে একটা বৃক্ষে জড়াইয়া উঠিবে, একটী বড় লতাকে গাছে জড়াইতে চেষ্টা করিলেও সেরূপ সুন্দরভাবে জড়াইতে পারিবে না। বাল্যে যাহাদের সহিত বন্ধুত্ব হয়, বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তাহার প্রভাব প্রবল থাকে। যৌবনের বন্ধুর সহিত মিলন তেমন ঘনিষ্ঠ হয় না। যৌবনের প্রণয় বেশী উদ্দাম হইতে পারে। কিন্তু বাল্যের প্রণয় বেশী গভীর, বেশী অনাবিল, বেশী স্থায়ী হয়।

বেশী বয়সে বিবাহ প্রচলিত হইলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পর পরস্পরকে নির্বাচন করিয়া বিবাহ করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা একপ্রকার অনিবার্য্য হইবে এবং হওয়াও উচিত। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ সর্বদা বিদ্যমান ; রূপ, সঙ্গীতশক্তি বাকপটুতা প্রভৃতি থাকিলে সে আকর্ষণ আরও প্রবল হয়। ফলে মেয়ে বড় হইলে সে যে সকল পুরুষের সংস্পর্শে আসিবে, তাহাদের মধ্যে যাহাকে সকলের চেয়ে বাঞ্ছনীয় মনে হইবে, তাহার সহিত প্রেম হওয়া খুব সম্ভব। এইভাবে প্রেমে পড়া সে মেয়ের পক্ষে দোষের কথা, আমি তাহা মনে করি না ; কারণ, ইহা খুব স্বাভাবিক। মেয়ে যে পাত্রকে নির্বাচন করিবে, মেয়ের পিতামাতা যে সেই পাত্রকেই বেশী বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন, তাহা বলা যায় না। মেয়ের পিতামাতার অভিজ্ঞতা বেশী, এজন্য তাঁহাদের নির্বাচিত পাত্র, কন্যা যে পাত্র নির্বাচন করিবে সে পাত্র অপেক্ষা বাস্তবিক উৎকৃষ্টতর হওয়া সম্ভব। পিতামাতা যুক্তি দ্বারা কন্যাকে বুঝাইতে চাহিবেন যে তাঁহাদের মতানুবর্ত্তিনী হওয়া কন্যার উচিত। কিন্তু যুক্তি দ্বারা প্রেমের গতি নিয়ন্ত্রিত করা যায় না, পিতামাতা ইহা বুঝিবেন না। ইহার ফলে পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হইবে। আর এক রকমে অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। কন্যা একটি পাত্রকে ভালবাসিতে পারে, পাত্র অপর কোনও কন্যাকে ভালবাসিতে পারে, এইরূপ অবস্থা হইতে ভাল উপন্যাসের উপাদান পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু জীবনের শান্তি ইহাতে বিনষ্ট হয়। এবং মানবের যে উদ্যম উৎসাহ অনেক ভাল বিষয়ে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহা ব্যর্থ প্রেমে বিনষ্ট হইয়া যা।

হিন্দুর বাল্য-বিবাহ সমাজকে এই সকল অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছে।

আমাদের সমাজে অল্প বয়স হইতে একটি বালক ও বালিকাকে মিলিত করিয়া দেওয়া হয়। উভয়ে পরস্পরকে জীবনের সঙ্গী বলিয়া বুঝিয়া থাকে। এবং নরনারীর মধ্যে যে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে তাহার ফলে উভয়ে উভয়কে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। বালিকা বড় হইয়া ,প্রেমে পড়িলে সে যাহাকে পছন্দ করিবে তাহাকে বিবাহ করিতে দেওয়া উচিত, তখন তাহাকে অন্য পাত্রসাৎ করিবার চেষ্টা করা পিতামাতার কর্ত্তব্য নহে,—হিন্দু-শাস্ত্র এ কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে।

ত্রীণি বর্ষ্যাণ্যুদীক্ষেত কন্যা ঋতুমতী সতী।

উর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং॥ মনু, ৯।৯০

"কন্যা ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে। তাহার পর স্বজাতীয় সমান গুণবিশিষ্ট পতি বরণ করিবে।"

পাত্র পাত্রী স্বয়ং পরস্পরকে নির্বাচন করিয়া বিবাহ করিলে বিবাহের প্রারম্ভেই কি ভাবে পরিবারিক শান্তি বিনষ্ট হইতে পারে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ বিবাহের পরিণামও অনেক সময় বিষময় হয়। সংসারে অনেক বস্তু প্রথমে যেরূপ প্রতীয়মান হয়, পরে সেরূপ দেখা যায় না। কন্যা যাহাকে বাঞ্ছনীয় পতি বলিয়া মনে করে, বাস্তবিক সে বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। পরে তাহার অনেক দোষ বাহির হইতে পারে। অবশ্য পিতামাতাও যাহাকে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেও পরে অবাঞ্ছনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তবে পিতামাতার অভিজ্ঞতা বেশী; এ জন্য কন্যার ভুল হইবার সম্ভাবনা যত বেশী, পিতামাতার তত ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পাত্র নির্বাচন করিবার সময় পিতামাতা পাত্রের বংশ ইতিহাস আলোচনা করেন, আত্মীয় বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া সম্বন্ধ স্থির করেন। এই সকল কারণেও তাঁহাদের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা খুব কমিয়া যায়। দুষ্ট প্রকৃতির যুবক মিথ্যা আচরণ দ্বারা যত সহজে সংসারানভিজ্ঞ বালিকাকে প্রতারণা করিতে পারে, তাহার পিতামাতাকে তত সহজে পারে না। পাত্র কপটাচরণ না করিলেও প্রেমে পড়িয়া যে বিবাহ হয় তাহার পরিণাম অশান্তিপূর্ণ হইতে পারে। মানুষের রুচি বিভিন্ন। একজনের যাহা ভাল লাগে, অপরের তাহা ভাল লাগিতে না পারে। দুইজন যুবক যুবতী প্রেমে পড়িয়া বিবাহ করিল তাহার পর কিছুদিন একত্র বাস করিবার ফলে দেখিতে পাইল যে, নানা বিষয়ে তাহাদের রুচি বিভিন্ন। তখন উভয়েই বড় হইয়াছে, কাহারও অভ্যাস ক

রুচির পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে। ইহা হইতে দাম্পত্য-প্রীতির ব্যাঘাত ঘটিবে। কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ হইলে, সে ছেলেবেলা হইতে স্বামি-গৃহে বাস করে এবং আপনা হইতে তাহার রুচি সকল বিষয়ে স্বামীর অনুরূপ হইয়া উঠে। এ জন্য দাম্পত্য-প্রণয় সুসম্পুর্ণ হইতে কোনরূপ অন্তরায় থাকে না।

এই সকল আলোচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, অল্প বয়সে বিবাহ হইলে দাম্পত্য-প্রণয় বেশী হয়, পারিবারিক জীবন শান্তিময় হয়, ব্যর্থ প্রেম ও নিষিদ্ধ প্রেম জীবন বিষময় করিয়া তোলে না। এই সকল কারণে বাল্য-বিবাহে শরীরের অনিষ্ট হইলেও বাল্য-বিবাহ সমর্থন করা উচিত। কিন্তু ইহা সত্য নহে যে বাল্য-বিবাহে শরীরের অনিষ্ট হয়। পূর্বে বাল্য-বিবাহ এক্ষণ অপেক্ষা বেশী প্রচলিত ছিল, কিন্তু লোকের স্বাস্থ্য পূর্বে এখন অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। অশিক্ষিত দরিদ্র লোকদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ বেশী প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহাদের শরীর বড়লোকের চেয়ে ভাল। যে সকল মেয়েরা কলেজে লেখাপড়া করে এবং অধিক বয়সে বিবাহ করে তাহাদের স্বাস্থ্য ভদ্র-গৃহস্থের অল্প-শিক্ষিত স্ত্রীলোক অপেক্ষা ভাল হয় না, খারাপই হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য খারাপ হইবার কারণ অপর্য্যাপ্ত,—ভেজাল খাদ্য, ম্যালেরিয়া এবং নগরে পরিস্কার বায়ুর অভাব। পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, রাজপুত, বিহারী, মারাঠী—এই সকল জাতির মধ্যে বহুদিন যাবৎ বাল্য-বিবাহ প্রচলিত। অতএব বাল্য-বিবাহ শারীরিক দুর্বলতার কারণ হইতে পারে না।

দেখা গেল যে বাল্যবিবহে পরিবারিক শান্তির কারণ, অথচ শারীরিক অবনতি আনয়ন করে না। এই জন্য হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সকলেই নিঃসংশয়ভাবে কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। মনুর একটি শ্লোক আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহাতেই এই বিধান আছে যে ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেওয়া না হইলে কন্যা যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্বেই তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত, ইহাই মনুর অভিপ্রায়। নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোকে এই অভিপ্রায় আরও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি সত্বরঃ॥ মনু ৯।৯৪

"ত্রিশ বৎসর বয়সে যুবক দ্বাদশ বর্ষীয়া মনোহারিণী কন্যা বিবাহ করিবে। চতুর্বিংশ বৎসর বয়সের যুবক অষ্টম বৎসর বয়সের কন্যা বিবাহ করিবে।

যদি ধর্মের হানি হয় (অর্থাৎ যদি বিবাহ না করা হেতু গার্হস্থ ধর্মপালনে বিঘ্ন হয়) তাহা হইলে সত্বর বিবাহ করিবে।"

কামমামরণাত্তিষ্ঠেগৃহে কন্যর্তুমত্যপি।"

ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥ মনু ৯।৮৯

"কন্যা ঋতুমতী হইলেও মৃত্যু পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে অবস্থান করিবে সেও ভাল। কিন্তু গুণহীন কোন ব্যক্তির হাতে তাহাকে প্রদান করিবে না।"

কেহ কেহ বলেন প্রাচীন ভারতে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল; বাল্যবিবাহ পরে প্রচলিত হইয়াছিল। তাঁহারা ইহার সমর্থনে সাবিত্রী এবং শকুন্তলার দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। সাবিত্রীর যৌবনে বিবাহ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উপাখ্যানটি পড়িলে বোঝা যাইবে যে সময় বাল্যবিবাহই প্রথা ছিল। সাবিত্রীর যৌবন কাল উপস্থিত হইল, অথচ কোনও নৃপতি আসিয়া তাহাকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করিলেন না, ইহা দেখিয়া সাবিত্রীর পিতা কন্যাকে বলিলেন, "তুমি যাহাকে ইচ্ছা হয় পতিত্বে বরণ কর।" ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে যে, বাল্যবিবাহই নিয়ম ছিল। বাল্যকাল অতীত হইল অথচ বিবাহ হইল না দেখিয়া পিতা সাবিত্রীর বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন, এবং অপর উপায়ে শীঘ্র বিবাহের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সাবিত্রীকে স্বয়ং পতি নির্বাচন করিতে বলিলেন। শকুন্তলারও যৌবনে দুষ্যন্তের সহিত গান্ধর্বমতে বিবাহ হইয়াছিল, সত্য। কিন্তু এই ঘটনা দ্বারা যৌবন-বিবাহ সমর্থন করা যায় না। প্রথমতঃ গান্ধর্ববিবাহ শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ, এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহ কোন বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বিহিত হয় নাই (মনু ৩।২৪)। তাহার কারণ এই যে, বর ও কন্যা পরস্পর অনুরাগ হেতু গান্ধর্ববিবাহে মিলিত হয়। পাত্র বা পাত্রী গুণবান বা গুণবতী না হইলেও এইরূপ অনুরাগ সঞ্চার হইতে পারে। সুতরাং এরূপ বিবাহের ফল অমঙ্গলজনক হইতে পারে। এই ধরুন দুষ্যন্ত বাস্তবিক কি চরিত্রের লোক তাহা জানিবার যথেষ্ট সুযোগ শকুন্তলার ছিল না, তথাপি শকুন্তলা দুষ্যন্তের সহিত প্রেমে পড়িলেন। শকুন্তলার সৌভাগ্যবশতঃ দুষ্যন্ত ভাল লোক ছিলেন। কিন্তু এমন হইতেও পারিত যে দুষ্যন্ত খুব খারাপ লোক, রমণীকে বঞ্চনা করাই তাঁহার স্বভাব। যদি তাহা হইত তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইত। তাই মহর্ষি কণ্ব তপোবনে ফিরিয়া এই গান্ধর্ববিবাহের কথা শুনিয়া বলিয়াছেন,

দিষ্ট্যা ধূমাকুলিতলোচনস্য যজমানস্য পাবক এব আহুতিঃ পতিতা

"পুরোহিতের চক্ষু ধূমে অন্ধ হইলে, তাহার আহুতি ঠিক অগ্নির উপর পড়া যেরূপ আনন্দের বিষয়, অনুরাগান্ধ যুবতীর পক্ষে যোগ্য পাত্র নির্বাচন করা সেইরূপ আনন্দের বিষয়।"

অবিবাহিত কন্যা যৌবনস্থা হইলে সর্বদা গান্ধর্ববিবাহের আশঙ্কা থাকিবে এবং মহর্ষি কণ্বের বচনে "ধূমাকুলিতলোচন যজমানের" ভস্মের উপর ঘৃতাহুতি পড়িবার আশঙ্কা থাকিবে। বেশী বয়সে শকুন্তলার বিবাহ হওয়াই যে মহর্ষি কণ্বের অভিপ্রায় ছিল না, তাহা মহর্ষির এই উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তথাপি মহর্ষি কেন ইতিপূর্বে শকুন্তলার বিবাহ দেন নাই? তাহার কারণ বোধ হয় এই যে যোগ্য পাত্র পাওয়া যায় নাই। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বোধ হয় ইহাও যোগপ্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন যে শকুন্তলা দুষ্মন্তের সহিত পরিণীতা হইয়া দেশবিখ্যাত বীর পুত্রের জননী হইবে। অথচ বিশেষ যোগাযোগ ব্যতীত দুষ্মন্তের সহিত তাহার বিবাহ কল্পনা করা যায় না। হয় ত এ জন্যই মহর্ষি অনূঢ়া শকুন্তলাকে যৌবনসীমা অতিক্রম করিতে দিয়াছিলেন।

অতএব সাবিত্রী ও শকুন্তলার দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, সে সময় বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। অপর পক্ষে সীতা, উর্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি সকলের শৈশবেই বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের সময় রামচন্দ্রের বয়স ছিল ১৫ বৎসর "ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচন" সীতার বয়স ছিল ৭ বৎসর। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাল্যবিবাহের প্রথা থাকিলেও, দুই চারিটা যৌবন-বিবাহের দৃষ্টান্ত পাওয়া সঙ্গত হয়। কিন্তু যৌবন বিবাহের প্রথা থাকিলে বাল্য বিবাহের দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন হইত।

যাঁহারা আমাদের সামাজিক সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রথমে ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবে তাঁহাদের মন পাশ্চাত্য সমাজের অনুকূল হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে যে সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য সমাজের সহিত আমাদের সমাজের পার্থক্য আছে সে সকল বিষয়ে তাঁহারা আমাদের সমাজের প্রতিকূল মন্তব্য পোষণ করেন। সংস্কৃত সাহিত্য এবং ধর্মশাস্ত্রের সহিত পরিচয় না থাকাতে তাঁহাদের মনে হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতির অভাব ঘটিয়াছে। এই সংস্কারকদের মধ্যে অনেকে কিছু-কাল পাশ্চাত্যদেশে বাস করিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষেও যে সমাজের মধ্যে

বাদ করেন, তাহা এই দেশের প্রাচীন আদর্শের উপর গঠিত না হইয়া, পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিছু হিন্দু ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিলেও, পূর্বতন পাশ্চাত্য প্রভাবে তাঁহারা হিন্দুসমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য সমাজের বিবাহ-প্রথা এবং আমাদের বিবাহ-প্রথার কয়েকটি ফল এখানে নির্দেশ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য সমাজে অনেক কন্যার বিবাহ হয় না। তাহারা অনেকে স্বতন্ত্র ভাবে জীবন যাপন করে এবং পুরুষের নিকট চাকুরি করিয়া জীবিকা অর্জন করে। আমাদের দেশে যে অনুপাতে বিধবা আছে, পাশ্চাত্য সমাজে তদপেক্ষা বেশী অনুপাতে অবিবাহিত স্ত্রীলোক আছে। সমাজে বহুসংখ্যক অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষ থাকা সামাজিক পবিত্রতা এবং শান্তির পক্ষে অনুকূল নহে। যৌন-মিলনের আকাঙ্ক্ষা স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক। বিবাহের দ্বারা এই আকাঙ্ক্ষা বৈধভাবে পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ না হইলে, অনেকেই অবৈধভাবে এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা করিবেন এবং পরিতৃপ্ত করিবেন। এজন্য হিন্দুধর্মশাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন যে সমাজের অন্তর্গত স্ত্রী পুরুষ সকলকেই বিবাহ করিতে হইবে। সামাজিক শান্তি ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য যে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত সমীচীন, তাহা নিরপেক্ষ বিবেচক মাত্রই স্বীকার করিবেন। সংস্কারকদের অভিপ্রেত পরিবর্ত্তনগুলি আমাদের সমাজে প্রচলিত হইলে এখানেও প্রাপ্তবয়স্ক অবিবাহিত কন্যা অধিক সংখ্যায় আবির্ভূত হইবে।

মোটের উপর বাল্যবিবাহের ফল সমাজের পক্ষে অনিষ্টজনক কি না, এবং যদি অনিষ্টজনক হয় তাহা হইলে কতখানি অনিষ্টজনক এ বিষয়ে যে মতভেদ হইবে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যাঁহারা সমাজের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; একান্ত নিরীহ এবং ধর্মপরায়ণ, তাঁহারা অনেকেই আন্তরিক বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, বাল্যবিবাহ সমাজের পক্ষে হিতকারী। এরূপ অবস্থায় বাল্যবিবাহ-প্রথা দণ্ডনীয় করা কিছুতেই ন্যায্য হয় নাই। কোনও সভ্যদেশে এরূপ আইন প্রচলিত নাই. যাহাতে যে প্রথা সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ হইতে পারে তাহা দণ্ডনীয় করা হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত এবং মহৎ চরিত্রবান, তাঁহাদের কথা নাই বলিলাম। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় পারদর্শী মহাত্মাগণ যে প্রথার সমর্থন করিয়াছেন তাহা দণ্ডনীয় করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, তাহা নিরপেক্ষ সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। পাশ্চাত্য মত অনুসারে এরূপ সামাজিক আইনের পশ্চাতে অধিক সংখ্যক লোকের সম্মতি থাকা প্রয়োজন। যদি ভারতবর্ষের সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মত লওয়া যায়, তাহা হইলে অধিকাংশ ব্যক্তি এই সর্দা আইন সমর্থন করিবে না। অন্ততঃ অধিকাংশ স্ত্রীলোক যে ইহার বিরোধী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, স্বল্প সংখ্যক ইংরাজি শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন নারীগণ ইহার সমর্থন করিয়া যতই আন্দোলন করুন না কেন।

—০—

বিধবা-বিবাহ

চৈত্রের মাসিক বসুমতীতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "বঙ্গদেশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, আতুর দরিদ্রের বন্ধু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সকলেরই নিকট সুপরিচিত। এই কোমল হৃদয় পুরুষসিংহের বিধবা-বিবাহ সংস্কারের চেষ্টা তাঁহার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা।" বিধবাগণ জীবনের অনেক ভোগসুখ হইতে বঞ্চিত থাকে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে তাহাদের ইহজীবনের ভোগসুখ বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টা অতি উত্তম বলিয়া প্রতীত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে সন্দেহ হইতে পারে যে, বিধবাদের বিবাহ দিলে যদি তাহাদের সুখ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ ইহা স্পষ্টভাবে নিষেধ করিলেন কেন? বিধবাগণ সুখী হউক, ইহা কি তাঁহাদের ইচ্ছা নয়? এমন প্রকৃত হিন্দু খুব কম আছেন, যাঁহারা শাস্ত্রকারগণকে এরূপ নীচাশয় মনে করিবেন। তাহা হইলে এ প্রশ্নের উত্তর কি?

এই প্রশ্নের উত্তর নিম্নলিখিত বেদবাক্যে পাওয়া যাইবে—"যৎবৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্ (ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ)" মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা

বলিয়াছেন, তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকর। ঔষধ তিক্ত, মনুর ব্যবস্থাও কষ্টকর। কুপথ্য মুখরোচক। মনুর বিরোধী ভোগের ব্যবস্থাও আপাত সুখকর। বিধবা সুখী হউক, ইহা মনুরও অভিপ্রেত। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি কেবলমাত্র ইহলোকে আবদ্ধ নহে। তিনি যোগদৃষ্টিতে বিধবার পূর্ব্বজন্ম, ইহজন্ম, পরজন্ম সকল দেখিতে পাইতেছেন। এই রমণী কেন বিধবা হইল? ইহার বৈধব্য কি একটা অহেতুক আকস্মিক ঘটনা? তাহা হইলে কি জগতের প্রত্যেক ব্যাপারের নিয়ামক পরমকারুণিক সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর নাই? না, তাহা হইতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি ইহজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে যে কর্ম্ম করে, তাহার ফল ভোগ করে। যিনি বিধবা হইয়াছেন, তিনি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে বিধবা হইয়াছেন, কর্ম্মফলেই বৈধব্য-দুঃখরূপ রোগের আবির্ভাব হয়। সে রোগের চিকিৎসা কি? মহর্ষি মনু দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলেন, এই রোগের চিকিৎসা ব্রহ্মচর্য্য। আরও দেখিলেন, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া মৃত্যুর পর রমণী দীর্ঘকাল স্বামীর সহিত সুখে বাস করিতেছে,—রোগ সারিয়া গিয়াছে, আর দুঃখ নাই। আরও দেখিলেন, যে যে রমণী ব্রহ্মচর্য্য পালন করিল না, পুনরায় বিবাহ করিল, তাহার মৃত্যুর পর পুনরায় দুঃখ, অনেক সময় ইহজীবনেই দুঃখ। রোগের উপর কুপথ্য হইয়াছে।

রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া যিনি ব্যবস্থা করেন, তিনিই বিচক্ষণ চিকিৎসক। রোগীর দেহ উত্তপ্ত হইয়াছে বলিয়া যিনি শীতল জল প্রয়োগ করিতে বলিবেন, তিনি কোমল হৃদয় হইতে পারেন, কিন্তু উত্তম চিকিৎসক নহেন। বিধবার স্বামী মারা গিয়াছে, তাহাকে অন্য স্বামী দাও, যিনি এরূপ ব্যবস্থা দেন, তিনিও কোমলহৃদয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বিধবার কতদূর উপকার করিলেন, তাহা সন্দেহ।

প্রশ্ন হইবে, পুরুষের যখন স্ত্রী মারা যায়, তখন তাহার ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা দেওয়া হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে কর্ত্তব্য, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য তাহার সমান নহে। কেবল হিন্দুধর্ম্মে নহে, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মেও স্বামীর কর্ত্তব্য এবং স্ত্রীর কর্ত্তব্য সমান বলিয়া নির্দেশ করা হয় না। স্বামীর আদেশ পালন করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য, কিন্তু কোনও ধর্ম্মেই বলে না যে, স্ত্রীর আদেশ পালন করা স্বামীর কর্ত্তব্য। অবশ্য, ইহার অর্থ নয় যে, স্বামী স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিবে। স্বামী অবশ্য স্ত্রীকে আদর-যত্ন করিবে, কিন্তু স্ত্রী যাহা বলিবে, তাহা উচিত কিম্বা অনুচিত, ইহা বিচার না করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করা স্বামীর কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু স্ত্রীর তাহাই কর্ত্তব্য। নচেৎ "Obey thy

husband” স্বামীর আদেশ পালন করিবে, এই কথার কোনও অর্থ হয় না। ন্যায়সঙ্গত মনে হইলে সকলের বাক্যই গ্রহণ করা উচিত, তাহাকে আদেশ পালন করা বলে না। ন্যায় বা অন্যায় বিচার না করিয়া তদনুসারে কার্য্য করাকেই আদেশ পালন করা বলা যায়। “আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া” গুরুর আজ্ঞা বিচার করা উচিত নহে। স্বামীর আজ্ঞা বিচার না করিয়া পালন করা স্ত্রীর উচিত। কারণ, যেরূপ কর্ম্ম করিলে রমণী হইয়া জন্মিতে হয়, সেই কর্ম্মজনিত সংস্কার যাহার আছে, তাহার পক্ষে অন্যরূপ আচরণ অধর্ম্ম। রমণীজন্ম যে পুরুষজন্ম অপেক্ষা দুঃখকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা সামাজিক অত্যাচারের ফল নহে, ইহা প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। এ সম্বন্ধে গর্ভধারণ এবং সন্তানপ্রসবের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। দুঃখবহুল রমণীজন্মের কারণও পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম ক্ষয় করিবার জন্য প্রয়োজন—অবিচারে স্বামীর আজ্ঞা পালন করা। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীর আজ্ঞা পালন করিবার আবশ্যকতা নাই। পুরুষের কর্ম্ম ক্ষয় করিবার জন্য প্রয়োজন—শাস্ত্রের আদেশ পালন করা, পিতামাতার আজ্ঞা পালন করা, (যদিও মাতা রমণী)। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অনুসারেই জন্ম নির্দ্দিষ্ট হয়, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে হয়, এ জন্য জন্মের সহিত কর্ত্তব্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এ জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য বিভিন্ন, স্ত্রী ও পুরুষের কর্ত্তব্য বিভিন্ন, বিধবা ও বিপত্নীকের কর্ত্তব্য বিভিন্ন।

আপত্তি হইতে পারে, বিধবার বিবাহ শাস্ত্র-বিরোধী নহে, পরাশর তাহার ব্যবস্থা দিয়াছেন :—

“নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে বা পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥”

কিন্তু পরাশরের এই বাক্যে বিধবাবিবাহ সমর্থন করা যায় না। ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দুর বেদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কিন্তু বেদের বহু অংশ এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। সেই সকল লুপ্ত অংশে যে সকল বিধিনিষেধ ছিল, স্মৃতিবাক্যে তাহা রক্ষিত হইয়াছে। সকল স্মৃতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনুস্মৃতি, কারণ বৈদিক ব্যবস্থা মনুর মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় :—

“যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ ॥”

মনু যাহার যে ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, সে সকল ধর্ম্ম বেদে উক্ত হইয়াছে, কারণ, বেদ সর্ব্বজ্ঞানময়। এই জন্যই বলা হইয়াছে—

"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।"

যে স্মৃতি মনুর অর্থের বিরোধী, তাহাকে প্রশংসা করা যায় না। মনু খুব স্পষ্টভাবে বিধবাবিবাহের নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ।"

"বিবাহবিধিতে বিধবার পুনরায় বিবাহ কোথাও উক্ত হয় নাই।"

যদি বেদে বিধবাবিবাহের বিধি থাকিত, তাহা, হইলে মনু এ কথা বলিতে পারিতেন না।

মনু পুনরায় বলিয়াছেন,—

"ন চ নামাপি গৃহ্লীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য চ।"

"পতির মৃত্যু হইলে অপরের নামও গ্রহণ করিবে না।"

কেবল মনু নহেন, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, গৌতম, ব্যাস প্রভৃতি প্রধান স্মৃতিকারগণও এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন যে,—যে কন্যার পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই, তাহারই বিবাহ হইতে পারে। যথা, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন।—

"অনন্যপূর্ব্বিকাং কন্যাম্ অসপিণ্ডাং যবীয়সীম্।"

"যাহার পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই, যে কমনীয়, সপিণ্ড নহে এবং বয়ঃকনিষ্ঠ এরূপ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন ঃ—

"অসমানার্ষাম্ অস্পৃষ্টমৈথুনাম্ যবীয়সীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত।"

"যাহার সমান গোত্র, প্রবর নহে, যে মৈথুন দ্বারা স্পৃষ্ট হয় নাই, যে বয়ঃকনিষ্ঠ এবং যে অনুরূপ, এরূপ ভার্য্যা গ্রহণ করিবে।"

গৌতম বলিয়াছেন—"গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত অনন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীং" অর্থাৎ গৃহস্থ সদৃশী ভার্য্যা বিবাহ করিবে, যাহার পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই এবং যে বয়ঃকনিষ্ঠ।

ব্যাস বলিয়াছেন—

"সবর্ণামসমানার্ষাম্ অমাতৃপিতৃগোত্রজাম্।
অনন্যপূর্ব্বিকাং লঘ্বীং শুভলক্ষণসংযুতাম্॥"

"স্বজাতীয়, বিভিন্ন প্রবরের, মাতা ও পিতার গোত্র ভিন্ন অন্য গোত্রীয়, যাহার পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই, যে লঘু ও শুভলক্ষণসংযুক্ত।"

পরাশরের পূর্ব্বোক্ত বাক্যটির অর্থ যদি এই হয় যে, বিধবার পুনরায় বিবাহ হইতে পারে,—তাহা হইলে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস বশিষ্ঠ, গৌতমের এই সকল বাক্য মিথ্যা হইয়া যায়। এজন্য বাধ্য হইয়া বিচার করিতে হয়, পরাশর বাক্যের অন্য কি অর্থ হইতে পারে। এই সমস্যা পূরণ করিবার জন্য বলা হইয়াছে যে, পরাশরের ঐ বাক্যে পতি শব্দের অর্থ বিবাহিত পতি নহে, বাগ্‌দত্ত পতি, পূর্ব্বে বৈদিকমন্ত্র পাঠ করিয়া বাগ্‌দানক্রিয়া হইত, বাগ্‌দানের পর এবং বিবাহের পূর্ব্বে বাগ্‌দত্ত পতি মৃত হইলে তাহার অন্য পতির ব্যবস্থা পরাশর এখানে দিয়াছেন। পরাশর বাক্যের এইরূপ কোনও অর্থ করিবার কারণগুলি নিম্নে একত্র করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—

(১) নচেৎ মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস বশিষ্ঠ, গৌতম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকারদিগের সুস্পষ্ট ব্যবস্থা অমান্য করিতে হয়।

(২) পতি শব্দের সপ্তমীর এক বচনে হয় পত্যৌ,—পরাশর লিখিয়াছেন পতৌ, এজন্য অনুমান হয় যে, পরাশর সচরাচর প্রচলিত অর্থে ইহা ব্যবহার করেন নাই।

(৩) পরাশর পরবর্ত্তী শ্লোকে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের বিধান দিয়াছেন।

(৪) পরাশরের পূর্ব্ব-উদ্ধৃত বাক্যে যদি "পতি" শব্দের অর্থ বিবাহিতা পতি হয়, তাহা হইলে, কেবল যে বিধবার পুনরায় বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিতে হয়, তাহা নহে "নষ্টে" অর্থাৎ স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হইলে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ দিতে হয়. "প্রব্রজিতে" স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ দিতে হয়, "ক্লীবে বা পতিতে" স্বামী রুগ্ন হইয়া ক্লীব হইলে, অথবা পাতকের ফলে পতিত হইলেও স্ত্রীর বিবাহ দিতে হয়। সুতরাং কেবল বিধবা-বিবাহ নহে, অনেক ক্ষেত্রে সধবা-বিবাহও দিতে হয়। পরাশর ৪ অধ্যায়ে ব্যাধিত স্বামীকে উপেক্ষা করা নিন্দা করিয়াছেন।

(৫) আর্য্যরমণী বিধবা হইয়া পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে দেখা যায় না। অনার্য্যরমণী বিধবা হইয়া বিবাহ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত আছে।

(৬) যদি বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত হইত, তাহা হইলে শাস্ত্র সকলের মধ্যে উহার সমর্থনে কেবলমাত্র একটি বাক্য পাওয়া যাইত না; আরও অনেকগুলি বাক্য পাওয়া যাইত। কে দান করিবে, কি মন্ত্র হইবে, কি উত্তরাধিকার হইবে, এ সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকিত। এ বিষয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে, হিন্দু সমাজে দত্তকপুত্রগ্রহণ লক্ষের

মধ্যে একটা হয় কি না সন্দেহ ; কিন্তু সেই দত্তক গ্রহণের ব্যবস্থার জন্য কত শাস্ত্র—কত বিধিব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বিধবা-বিবাহের মত এত বড় ব্যাপার যদি হিন্দু সমাজে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে সে বিষয়ে কেবল একটা মাত্র বাক্য থাকিত না, অনেক বাক্য থাকিত।

অনেকে বলেন যে, "কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ" অতএব কলিকালে অন্য স্মৃতির বিরোধী হইলেও পরাশরবাক্যই বেশী বলবান্। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে "যদ্ বৈ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্" অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী এই বেদবাক্য এবং "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে" অর্থাৎ যে স্মৃতি মনুর বিপরীত, তাহা প্রশংসার্হ নহে, এই স্মৃতিবাক্য উভয়ই মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু "কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ" ইহার অর্থ যদি এরূপ করা যায় যে, পরাশরস্মৃতিতে যে সকল ব্রতের ব্যবস্থা আছে, সেগুলি কলিকালের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অপর স্মৃতিতে সেরূপ বিধান পাওয়া যায় না,—তাহা হইলে পূর্ব্বোদ্ধৃত তিনটি বাক্যের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। সুতরাং এইরূপ অর্থই গ্রহণ করা উচিত। বহুকাল পূর্ব্বে পরাশর স্মৃতির ব্যাখ্যা লিখিবার সময় মাধবাচার্য্যও এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ঋষিগণ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন এবং সকল জীবের হিতকারী ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বিধবা পুনরায় বিবাহ করিলে তাহার অকল্যাণ হইবে। যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র মানেন না, পূর্ব্বজন্ম, কর্ম্মফল এ সকল কিছুই মানেন না, তাঁহারা বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিবেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কি যথাযথভাবে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস করিতেন? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পড়িয়া ত বোধ হয় না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে আস্থাবান্ ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একটি পুরাতন দলিল পাইয়াছিলেন, যাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, হিন্দুদর্শন পাঠ করিলে ছাত্রের যে অনিষ্ট হইবে তাহা সংশোধন করিবার জন্য তাহাদের কিছু ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করা প্রয়োজন। বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাহ্য বেশভূষায় স্বজাতীয় ভাব পরিস্ফুট হইলেও তাঁহার আন্তরিক মনোভাব যেন পাশ্চাত্য প্রভাবেরই পরিচয় দেয়। এ জন্যই কি তাঁহার চরিতাবলী পুস্তকে নীতিশিক্ষা দিবার জন্য কেবলমাত্র পাশ্চাত্যকাহিনী লিপিবদ্ধ

আছে, একটিও স্বদেশীয় কাহিনী নাই? বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল যে হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না, তাহা নহে, ঈশ্বর এবং পরলোক সম্বন্ধেও বোধ তাঁহার বিশ্বাস শিথিল ছিল। শোনা যায় যে, তাঁহার বোধোদয় পুস্তকে প্রথমে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও কথা লেখা হয় নাই। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই ত্রুটি প্রদর্শন করিবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" এই প্রবন্ধটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কোনও কোনও দৈব-দুর্ঘটনার সংবাদে তিনি ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এই ঘটনার পরও কি তোরা বিশ্বাস করিতে বলিবি যে, ঈশ্বর আছেন?" বলা বাহুল্য, তিনি হিন্দুশাস্ত্রের উপর বিশেষ আস্থাবান না হইলেও তাঁহার ন্যায় দাতা এবং পরোপকারী ব্যক্তি অতিশয় বিরল। কিন্তু যিনি শাস্ত্রবিশ্বাসী নহেন, ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে যাঁহার বিশ্বাস শিথিল, তাঁহার প্রদত্ত সামাজিক ব্যবস্থাকে হিন্দু বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত নিরীক্ষণ করিতে পারে না। বিনোদবাবু যে লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালাদেশের সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন সামাজিক প্রথাগুলিকে ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল।" তাঁহার এই উক্তি অতিরঞ্জিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও বিধবাবিবাহ প্রথা বাঙ্গালাদেশে অতি সামান্য পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে মাত্র। "ভাসিয়া যাইবার" মত অবস্থা কখনও হয় নাই। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিলে হিন্দু সমাজে ভ্রূণ-হত্যার সংখ্যা কমিয়া যাইবে, ইহা যথার্থ নহে। যে সকল পাশ্চাত্য দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, সে সকল সমাজে ভ্রূণহত্যার সংখ্যা হিন্দু সমাজ অপেক্ষা অনেক বেশী (বিশেষতঃ আমেরিকায়)। বাস্তবিকপক্ষে বিধবাদের পুণ্যময় জীবন সমাজে সংযম ও পবিত্রতা বর্দ্ধিত করে। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে সমগ্র রমণীসমাজ মোটের উপর বেশী সুখী হইবে, ইহাও যথার্থ নহে। কারণ, যে কয়জন বিধবার বিবাহ হইবে, সেই কয়জন কম কুমারীর বিবাহ হইবে। এখনই অনেক রমণীর বিবাহ হওয়া দুর্ঘট হইয়াছে, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে আরও দুর্ঘট হইবে। পুরুষরা নিজেদের স্বার্থের জন্য বিধবা-বিবাহ রহিত করিয়াছে, ইহাও যথার্থ নহে। ভগিনী বা কন্যা বিধবা হইলে তাহাদিগকে দুঃখভোগ করিতে হইবে, এ দুশ্চিন্তায় কাতর হয় না, হিন্দুসমাজ এত নিষ্ঠুর নহে। নিজের অবর্ত্তমানে তাহার স্ত্রী পাছে বিবাহ করে, এই দুশ্চিন্তা অপেক্ষা ভগিনী বা কন্যা বিধবা হইলে বিবাহ করিতে পারিবে না, এই দুশ্চিন্তা অনেক বেশী প্রবল। সুন্দরী ধনবতী বিধবা রমণীকে বিবাহ

করিবার প্রবৃত্তি পুরুষের স্বাভাবিক। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিলে পুরুষরা সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিলে মোটের উপর পুরুষের ভোগের সুযোগ কমিয়া যাইবে, ইহা ভুল। ফলতঃ বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিলে পুরুষের সুখভোগের সুযোগ কিছুই বাধাপ্রাপ্ত হয় না, বরং বর্দ্ধিত হইবে। পুরুষের সুখের জন্য বিধবাকে বিবাহ করিতে দেওয়া হয় না, অথবা বিধবা পাছে সুখী হয়, এজন্য তাহাকে বিবাহ করিতে দেওয়া হয় না, যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজ এবং হিন্দুশাস্ত্রকার সম্বন্ধে অযথা হীন ধারণা পোষণ করেন। রমণীগণের প্রকৃত কল্যাণের জন্যই দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা প্রথমে কষ্টকর হইলেও পরিণামে সুখাবহ।

(মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২)

"বৃহৎ-বঙ্গ"

(সমালোচনা)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "বৃহৎ-বঙ্গ" নামক পুস্তকের লেখক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন প্রথম অধ্যায় সপ্তম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন যে. শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া আর্য্য-ধর্ম্মের যে পুনরুত্থান হইয়াছিল, তাহাতে ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক পূজা পাইল এবং ব্রাহ্মণের নূতন সংজ্ঞা হইল; বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ জন্ম দ্বারা নির্ণয় হইতেন না, "প্রধানতঃ বৃত্তিই জাতিনির্দ্দেশক ছিল। যে কোন জাতির লোক ব্রাহ্মণ হইয়াছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।" দীনেশ বাবু অন্ততঃ দুই চারিটি প্রমাণ দিলে ভাল করিতেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি জাতির উৎপত্তির কথা ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে (১০।৯০।১২) এবং যজুর্ব্বেদে (কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।১) দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় স্থলেরই অর্থ একরূপ, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। জন্মগত জাতির সহিত এই প্রকার উৎপত্তির সামঞ্জস্য হয়, বৃত্তিগত জাতির সহিত সামঞ্জস্য হয় না। জাতি বৃত্তিগত হইলে একজন ক্ষত্রিয় যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারে। এ

অবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে পুরুষসূক্ত অনুসারে ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন বলা যাইবে, না বাহু হইতে উৎপন্ন বলা যাইবে? বস্তুতঃ ঋগ্বেদ এবং যজুর্ব্বেদের পূর্ব্বোক্ত অংশদ্বয় "বৃত্তি অনুসারে জাতি হইবে" এই মতের বিরোধী। সুতরাং দীনেশ বাবু যে মনে করিতেছেন, বৈদিক যুগে বৃত্তি অনুসারে জাতিনির্দ্দেশ হইত, ইহা তাঁহার কল্পনা মাত্র।

কঠ উপনিষদে দেখা যায় যম, নাচিকেতাকে ব্রাহ্মণ এবং নমস্য বলিয়াছেন। তখন নচিকেতা বালক মাত্র। তাহার কি বৃত্তি ছিল, এ কথা উঠিতে পারে না। সুতরাং উপনিষদেও জন্ম অনুসারে জাতিনির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বৃত্তি অনুসারে নহে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।১০।৭ এর অনুবাদ এইরূপ :—

যাহারা উত্তম কর্ম্ম করে, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, যাহারা কুৎসিত কর্ম্ম করে, তাহারা চণ্ডাল প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

সুতরাং এখানেও দেখা যায়, যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম অনুসারে জন্ম এবং জন্ম অনুসারে জাতি।

শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া যে "নব আর্য্যধর্ম্ম" উত্থিত হইল, বেদব্যাস তাহার প্রধান প্রচারক এবং গীতা তাহার একটি প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। বেদব্যাস— যিনি সমগ্র বেদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন,তিনি অবশ্য বেদের মর্ম্ম অবগত ছিলেন। দীনেশ বাবু যে মনে করিয়াছেন, এই নব ধর্ম্ম প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধী, ইহা তাঁহার ভ্রম। গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, গীতায় সমগ্র বেদের সারভাগ সঙ্কলন করা হইয়াছে। গীতায় যখন সমগ্র বেদের সারভাগ সঙ্কলন করা হইয়াছে তখন গীতা প্রতিপাদিত "নব আর্য্যধর্ম্ম" বেদবিরোধী হইতে পারে না।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—

"কোনও কোনও মহর্ষি গণিকাজাত ছিলেন। সত্যকাম ও নারদের মাতার স্থান এই পর্য্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

সত্যকাম সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে, এই মাত্র উক্ত হইয়াছে যে, সত্যকামের পিতার গোত্র সত্যকামের মাতা, জানিতেন না, যৌবনে তিনি বহু পরিচর্য্যায় ব্যস্ত ছিলেন। ইহা হইতে বলা যায় না যে, তিনি গণিকা ছিলেন। শঙ্কর এ ভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। নারদের মাতা চাতুর্ম্মাস্যকারী সাধুদের দাসী ছিলেন, গণিকার পুত্র ছিলেন ইহা উক্ত হয় নাই। অধিকন্তু সত্যকামের

গল্প হইতে ইহাই বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হইবে, ইহাই নিয়ম ছিল। নচেৎ আচার্য্য সত্যকামকে তাহার বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন কেন?

ব্রাহ্মণজাতীয় ঋষি-মুনির ঔরসে নীচজাতীয় স্ত্রীলোকের গর্ভে, পশুর গর্ভে এবং কুম্ভ হইতেও সাধুপুরুষের জন্ম হইয়াছে, এরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পুরাণে আছে। ঋষি মুনিদের তপস্যার প্রভাবে ইহা সম্ভব হইত। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা ভুল যে, সাধারণ ভাবে সমাজে যে কোনও জাতির স্ত্রী এবং যে কোনও জাতির পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণের জন্ম হইত।

দীনেশ বাবু তাঁহার গ্রন্থে বহু স্থলে উচ্ছ্বসিত ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের নামেই উন্মত্ত হইয়াছিলেন,—যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দীনেশ বাবু নব্য আর্য্যধর্ম্মের সমর্থক বলিয়া কটাক্ষপাত করিয়াছেন। প্রধানতঃ মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব এই দুইখানি গ্রন্থের প্রতি বিশেষ সমাদর ও ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। মহাভারতে পাতিব্রতা ধর্ম্মের এবং ব্রাহ্মণভক্তির উল্লেখ যে সকল স্থলে আছে, দীনেশ বাবু সেই সকল স্থান উদ্ধৃত করিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছেন (১ অধ্যায় ৭ পরিচ্ছেদ)। তিনি ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নৈষ্ঠিক হিন্দু রন্ধনশালায় সতর্ক পাহারা দেওয়াই পরম ধর্ম্ম মনে করিয়া থাকেন। মহাভারতকার বলিয়াছেন, শূদ্রান্ন, শিল্পী ও নিন্দিত ব্যক্তির অন্ন শোণিত সদৃশ।"

শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাইবার পথে যে গ্রামে ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, সেখানে ব্রাহ্মণের গৃহে ভোজন করিতেন, যে গ্রামে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সেখানে তাঁহার সঙ্গী ভট্টাচার্য্য রন্ধন করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং দীনেশ বাবু যে সকল নৈষ্ঠিক হিন্দুকে ঠাট্টা করিয়াছেন, দীনেশ বাবুর অশেষ ভক্তিভাজন শ্রীচৈতন্যদেবকে তাহাদের দলভুক্ত দেখা যায়।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন যে,—

"খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে বাঙ্গালার রাজকুল কনোজ হইতে 'নব ব্রাহ্মণ্যদীক্ষিত সাগ্নিক যজ্ঞানুষ্ঠানে পারগ ব্রাহ্মণদিগকে' আনিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মগুরু ও সমাজগুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'তাঁহাদের অধিকারে যুগে যুগে অনেক বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। এই বিদ্রোহীদলের সর্ব্বজনস্বীকৃত অধিনায়ক ছিলেন সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য দেব।"—(২২ পৃঃ)

দীনেশ বাবুর এই উক্তি যথার্থ নহে। কনোজ হইতে নব্য ব্রাহ্মণ্যদীক্ষিত যে সকল যজ্ঞানুষ্ঠানে পারগ ব্রাহ্মণ আসিয়া ছিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম অবশ্য বেদ ও পুরাণের উপরই প্রতিষ্ঠিত; ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মও বেদ ও পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবকে কনোজ হইতে আগত ব্রাহ্মণ প্রচারিত আদর্শের বিদ্রোহী কিছুতেই বলা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম যে বেদ ও পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে ঃ—

'জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ'

—মধ্যলীলা, ২০ পরিচ্ছেদ

দীনেশ বাবু কল্পনা করিয়াছেন,—

'শ্রচৈতন্যদেব বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, তাহার মূল পাওয়া যায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মে।"—(৫২ পৃঃ)

আমরা পূর্ব্বে দেখাইলাম যে, শ্রাচৈতন্য বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব যে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে সমর্থন করেন নাই তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত চৈতন্যদেবের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—

'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হইল নাস্তিক"

—মধ্যলীলা, ৬ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেব যে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ দীনেশ বাবু বলিয়াছেন যে,—

"তন্ত্ররত্নাকরে লিখিত আছে যে, ত্রিপুরাসুর শ্রীচৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"—(৫২ পৃঃ)

শ্রীচৈতন্যদেব তান্ত্রিক ধর্ম্মের কতকগুলি অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন। তান্ত্রিক যে প্রকারে পূজা করিতেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাহার বিশেষরূপে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এজন্য তন্ত্ররত্নাকরে শ্রচৈনন্যদেবকে ত্রিপুরাসুরের অবতার বলা হইয়াছে। কিন্তু, এই তান্ত্রিকধর্ম্ম কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ এদেশে আনেন নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সময় তান্ত্রিক ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহা বাঙ্গালা দেশেই উৎপন্ন। অতএব তন্ত্ররত্নাকরে চৈতন্যদেবের নিন্দা আছে বলিয়া দীনেশ বাবু যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কনোজ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "নব্য হিন্দুধর্ম্মের" বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্যদেরে বিদ্রোহ

করিয়াছিলেন, দীনেশবাবুর এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। বস্তুতঃ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রচারিত হিন্দুধর্ম্মের একটি শ্রেষ্ঠ ফল হইতেছেন শ্রীচৈতন্য। কারণ, চৈতন্য দেবের ধর্ম্ম বেদ ও পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন যে,—

"মহাভারত জীবে দয়া যথেষ্ট ভাবে প্রচার করিবার পর যজ্ঞে নিহত পশুমাংস ভোজনের ব্যবস্থা দিয়া মাংসাশীদের জন্য রক্ষা কবচের কল্পনা করিয়াছেন।—(৫৩ পৃঃ) সেই রন্ধ্রে মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা দেবস্থানগুলিকে পশুরক্তে রঞ্জিত করিয়া তুলিল'।"

বৈদিক ধর্ম্মের পশুবধকে নিন্দা করিয়া দীনেশ বাবু বৌদ্ধ ধর্ম্মের যজ্ঞবিরোধিতার প্রশংসা করিয়াছেন। দীনেশ বাবু বোধ হয় লক্ষ্য করেন নাই যে, বৌদ্ধধর্ম্মে এরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই যে, বৃথা মাংস ভোজন পাপ। বৌদ্ধ ধর্ম্মে পশুবধেরই নিন্দা আছে, কিন্তু অন্য ব্যক্তি পশু বধ করিলে সেই মাংস ভোজনকে নিন্দা করা হয় নাই। ইহার ফলে ব্রহ্মদেশ এবং চীন তিব্বত প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে মাংস ভোজনের জন্য যত প্রাণিহত্যা হয়, তাহার তুলনায় ভারতবর্ষে মাংস ভোজনের জন্য অনেক কম হত্যা হয়; দীনেশ বাবু বোধ হয় তাহা চিন্তা করেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে বৃথা মাংস ভোজন করা পাপ, এই বিশ্বাস হেতু ভারতবর্ষে মাংস ভোজনের জন্য অনেক কম হত্যা হয়। কারণ যজ্ঞ বা পূজা করিয়া পশুবধ করা প্রত্যহ হইয়া উঠে না; কিন্তু কসাইয়ের মাংস রোজই পাওয়া যায়। যাহাদের মাংসভোজনের প্রবৃত্তি প্রবল, বৃথা মাংস ভোজনের নিন্দা তাহাদের প্রবৃত্তি সংযত করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের এরূপ সংযমের ব্যবস্থা নাই। এজন্য কেবল বৌদ্ধগৃহস্থ নহে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণও অবাধে মাংস ভোজন করিয়া থাকে।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"যজ্ঞে পশুবলির সহিত নরবলিপ্রথার সংযোগ আছে।" এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, জরাসন্ধ নরবলি দিবেন বলিয়া পরাজিত রাজাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং মণিপুরে দেবমন্দিরে ইংরাজকে বলি দেওয়া হইয়াছিল।"—(৫৩ ৫৪ পৃঃ)

কিন্তু মহাভারতে জরাসন্ধের অভীষ্ট নরবলির যথেষ্ট নিন্দা আছে এবং জরাসন্ধকে অসুরপর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে। দীনেশ বাবুই জরাসন্ধের ব্রতপালন, ধর্ম্মযুদ্ধ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া তাহাকে "বৃহৎ-বঙ্গের" একজন মহাপুরুষ বলিয়া খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সেই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের নিন্দা

করিয়াছেন (২৬-২৮ পৃঃ)। দীনেশ বাবু লক্ষ্য করিলেন না যে, যে ব্যক্তি প্রায় শত সংখ্যক পরাজিত রাজাকে দেবমন্দিরে বলি দিতে উদ্যত, তাহার পক্ষে ধর্ম্মের কয়েকটি ব্রত ও আচার পালন কিছুমাত্র প্রশংসার বিষয় নহে। এবং এই প্রকার দৈত্যকে বধ করিবার জন্য ছদ্মবেশ গ্রহণ করা পাণ্ডবদের পক্ষে দূষণীয় হয় নাই। নরহত্যাকারী ব্যক্তি ধর্ম্মের বাহ্য আচার অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে না, ইহাই জরাসন্ধ-কাহিনীর প্রতিপাদ্য শিক্ষা। মণিপুরে রাজনৈতিক যুদ্ধবিগ্রহের উত্তেজনায় যে নরবলি হইয়াছিল, তাহার জন্য যজ্ঞে পশুবধের ব্যবস্থাকে দায়ী করাও দীনেশ বাবুর ভুল হইয়াছে। মণিপুরে নরবলি যে বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্ম্ম অনুসারে করা হইয়াছিল, দীনেশ বাবু তাহার কোনও প্রমাণ দেন নাই।

বিলাতীপণ্ডিতগণ সন্ন্যাসপ্রথার নিন্দা করেন। এজন্য দীনেশ বাবু রামায়ণের মূলনীতি প্রতিপাদন উপলক্ষ্যে সন্ন্যাসধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন (৩য় অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ)। রামায়ণ না কি সন্ন্যাসধর্ম্মের বিরোধী! রামায়ণের নায়ক অবশ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, রামায়ণের মতে সন্ন্যাস গ্রহণ করা অন্যায়। রামায়ণে এ কথা কোথাও বলা হয় নাই। রামায়ণে বলা হইয়াছে যে, রামায়ণ বেদানুযায়ী গ্রন্থ (বাল্মীকি রামায়ণ ১-৪-৬)। অতএব বেদে যে ব্যবস্থা আছে, রামায়ণে তাহার নিন্দা থাকিতে পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের সন্ন্যাসগ্রহণের কথা আছে। অন্য উপনিষদেও আছে। বালিবধ উপলক্ষ্যে শ্রীরামচন্দ্র মনুর নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মনুতে সন্ন্যাসের ব্যবস্থা আছে। এজন্য এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, সন্ন্যাসের নিন্দা করা রামায়ণের উদ্দেশ্য। আর এক কথা—শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীনেশ বাবু শ্রীচৈতন্যকে আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়াছেন। তাহা হইলে তিনি কিরূপে সন্ন্যাসের নিন্দা করিতে পারেন ?

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন,—

"গৌরীদান ও বাল্যবিবাহ নবাগত কনোজিয়া ব্রাহ্মণদের প্রবর্ত্তিত। অবশ্য ব্রাহ্মণেরা অনায়াসে শ্লোক রচনা করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারিতেন, সুতরাং মনু যাজ্ঞবল্ক্য 'প্রভৃতি ঋষিগণকে তাঁহাদের মতের সমর্থকরূপে দাঁড় করাইতে বিশেষ কোন কষ্ট করিতে হইত না।"—(৪৭২ পৃঃ)

দীনেশ বাবুর যুক্তি অতিশয় অদ্ভুত! মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গলাদেশের নবাগত কনোজিয়া ব্রাহ্মণগণ যদি ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ-সমর্থক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার বাহিরে এই সকল গ্রন্থের যে সকল পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বাল্যবিবাহসমর্থক শ্লোকগুলি নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত না। কিন্তু এরূপ একটি পাণ্ডুলিপিও কি দীনেশ বাবু দেখিয়াছেন? তিনি যদি এইরূপ দুই চারিটি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উক্তি যুক্তিসঙ্গত হইত। কিন্তু সকল পাণ্ডুলিপিতেই যখন এই শ্লোকগুলি পাওয়া যাইতেছে, তখন সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, দীনেশ বাবু যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের কল্পনা করিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত। বাস্তবিক কেবল বাঙ্গলাদেশেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত নহে। যুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব, মান্দ্রাজ, বোম্বাই সকল প্রদেশেই ইহা প্রচলিত। সুতরাং ইহা বাঙ্গলার কনোজিয়াগণের কীর্ত্তি হইতে পারে না। বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায় যে, রামচন্দ্রের বিবাহের সময় রামচন্দ্রের বয়স ছিল তের এবং সীতার বয়স ছিল সাত। ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ মণ্ডল ১:৬ সূক্তে বৃহস্পতিকন্যা রোমশা ও তাঁহার স্বামী ভাবযব্যের কথোপকথন আছে। রোমশা মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন, ভাবযব্য তাঁহাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া পরিহাস করিতেছেন, রোমশা উত্তর করিতেছেন যে, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক। যদি বাল্যবিবাহই প্রচলিত প্রথা না হইত, তাহা হইলে ভাবযব্যের উক্তি অসঙ্গত হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে চাক্রায়ণ ঋষির পত্নীকে আটিকী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আটিকী শব্দের অর্থ—যে স্ত্রী ঋতুমতী হন নাই। সুতরাং ব্যল্যবিবাহ উপনিষদের সময়ও দেখা যায়, ইহা কনোজিয়া ব্রাহ্মণদের নূতন ফন্দী নহে। দীনেশ বাবু স্বয়ম্বরপ্রথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, পূর্বে বাল্যবিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু স্বয়ম্বরপ্রথার প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্যরূপ। কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই পিতার কর্ত্তব্য কন্যার বিবাহ দেওয়া; ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে যদি পিতা সে কর্ত্তব্য পালন করিতে না পারেন, তাহা হইলে কন্যা স্বজাতীয় কোনও ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করিবেন, ইহাই স্বয়ম্বর প্রথার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য মনু স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বয়ম্বর বিবাহ অপেক্ষা ব্রাহ্মবিবাহ শ্রেষ্ঠ—তাহাও বলা হইয়াছে। যৌবনে কামের তাড়নায় যুবক-যুবতী যে পরিণয়ে আবদ্ধ হইবে, তাহা অপেক্ষা সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতামাতা ধীর, স্থির ভাবে যে সম্বন্ধ

করিবেন, তাহা যে অধিকতর কল্যাণজনক হইবে, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। এবং পিতামাতার হাতে বর-নির্বাচনের ভার থাকিলে কন্যার অল্পবয়সে বিবাহই সঙ্গত হয়, নচেৎ কন্যা বড় হইলে তাহায় একটা স্বতন্ত্র অভিমত হয় এবং তাহা পিতার মতের অনুরূপ না হইতেও পারে। কন্যা রূপকে প্রধান্য দিবে, পিতা গুণকে প্রাধান্য দিবে, ইহাই স্বাভাবিক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর কল্পনা একান্ত অযৌক্তিক।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন,—

"ভারতবর্ষে কোনও সময় গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ বৈদিক আচার ও যাগযজ্ঞ চালাইয়াছেন, কখনও বা বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রভাবে অহিংসা-মূলক জনমত প্রবল হইয়া পড়িয়াছে।"—(১২৩ পৃঃ)

দীনেশ বাবু বৈষ্ণবধর্ম্মকে বেদবিরোধী বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের কোঠায় ফেলিয়া ভুল করিয়াছেন। রামানুজ আচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্মের একজন প্রধান আচার্য্য। "অশুদ্ধম্ ইতি চেৎ ন শব্দাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।১।২৫) এই সূত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন যে, যজ্ঞে পশুবধে কোনও দোষ নাই, ইহা উত্তম কর্ম্ম। মধ্বাচার্য্য আর একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য্য। তাঁহারও ঐ মত। তিনি ঐ সূত্রের ভাষ্যে বরাহপুরাণ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"হিংসা ত্ববৈদিকী যাতু তয়ানর্থো ধ্রুবং ভবেৎ।
বেদোক্তয়া হিংসয়া তু নৈবানর্থঃ কথঞ্চন ॥"

"বেদে যেরূপ হিংসা করিবার বিধান নাই (অর্থাৎ যজ্ঞে পশু বধ ভিন্ন অন্যত্র হিংসা করিলে) তাহাতে অনিষ্ট হইবে, কিন্তু বেদ বিহিত হিংসার দ্বারা (অর্থাৎ যজ্ঞে পশু বধ করিলে) কখনও অনিষ্ট হইতে পারে না।"

বস্তুতঃ সকল বৈষ্ণব আচার্য্যেরই এই মত। কারণ, সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েই বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করেন, যজ্ঞে পশুবধ বেদের ব্যবস্থা, তাঁহারা কেহ বেদের ব্যবস্থাকে মন্দ বলিতে পারেন না। রামানুজ বলিয়াছেন যে, চিকিৎসক রোগীর অঙ্গচ্ছেদ করিলেও রোগীর হিতকারী, সেইরূপ ঋত্বিক্ পশুবধ করিলেও পশুর হিতকারী। কারণ, বেদ বলিয়াছেন যে, যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। অবশ্য দীনেশ বাবু এই কথা অবিশ্বাস করিতে পারেন। কিন্তু সকল বৈষ্ণব আচার্য্যই ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন। দীনেশ বাবু বৈষ্ণবধর্ম্মের

প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া বেদবিহিত পশুবধের নিন্দা করিয়াছেন,* ইহা পরস্পরবিরোধী হইয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্ম বেদবিরোধী; কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম বেদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। সুতরাং বৌদ্ধ ও জৈনমতের সহিত বৈষ্ণবমতের মূলগত প্রভেদ আছে। দীনেশ বাবু এই তিন মতকে এক কোঠায় ফেলিয়া ভুল করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব বেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই ত প্রমাণ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ পরিচ্ছেদ

শঙ্করাচার্য্যের জীবনী গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধগণের সহিত বিচারে কিরূপে তাঁহার শাণিত যুক্তির সাহায্যে বৌদ্ধমত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহা রূপকচ্ছলে বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধদের শির কুঠার দ্বারা কর্ত্তন করিয়া, তাহা উদূখলে চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধমতের শ্রেষ্ঠ যুক্তিগুলিকে শির বলা হইয়াছে, শঙ্করের যুক্তিগুলিকে কুঠার বলা হইয়াছে, বৌদ্ধযুক্তি খণ্ডন করিয়া শঙ্কর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাই বলা হইয়াছে যে, শঙ্কর বৌদ্ধের শির কাটিয়া উদূখলে চূর্ণ করিয়াছিলেন। দীনেশ বাবু এই রূপক বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, শঙ্করাচার্য্য সত্যসত্যই এইভাবে বৌদ্ধদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন (৯ পৃঃ)। শঙ্করাচার্য্য এইরূপ অমানুষিক কার্য্য করিতে পারেন, ইহা দীনেশবাবু যে বিশ্বাস করিতে পারেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের প্রতি এইরূপ অযথা দোষারোপ করা হইয়াছে, ইহাও বড় দুঃখের বিষয়।

দীনেশ বাবুর গ্রন্থে অনেক মূল্যবান্ তথ্য আছে। কিন্তু তিনি যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলে গুরুতররূপে ভ্রান্ত এবং পরস্পর-বিরোধী। এই প্রবন্ধে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

(মাসিক বসুমতী কার্ত্তিক ১৩৪৫)

* দীনেশ বাবু ১২২ পৃষ্ঠায় "আর্য্যগণের যজ্ঞের বীভৎসতা"র নিন্দা করিয়াছেন।

শ্রীঅরবিন্দ এবং সায়ণাচার্য্য

আর্য্যসমাজীদের 'Vedic Magazine' পত্রিকায় ১৯১৫ ও ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের বিশেষ সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ "দয়ানন্দ,—তাঁহার মনুষ্যত্ব ও তাঁহার কীর্ত্তি" এবং "দয়ানন্দ এবং বেদ" এই নামে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। লাহোর আর্য্য সমাজের বৈদিক পুস্তকালয় হইতে প্রবন্ধ দুইটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইটি প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন যে, দয়ানন্দ যে ভাবে বেদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ—সায়ণাচার্য্য এবং ভারতের প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে ভাবে বেদের ব্যাখ্যা করেন, তাহা ঠিক নহে। দয়ানন্দের ব্যাখ্যা এই যে, বেদে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি নাম পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে,—কোনও দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যাকে polytheistic interpretation of the Vedas বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, অর্থাৎ সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যা একেশ্বরবাদের বিরোধী। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন যে, বেদে যজ্ঞের বিবরণ আছে ইহা স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, ঈশ্বরীয় জ্ঞানের কথা বেদে কিছু নাই। সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ "পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিন্তু বুদ্ধিহীন," "যুক্তিহীন" (arbitrarily erudite, divorced fvom sound judgment often from plainest commensense), "অসংস্কৃত", "পার্থিবভাববহুল" (crude, material) প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং ইহাকে সঙ্কীর্ণ এবং মন্দ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে বিধিমত চেষ্টা পাইয়াছেন।

সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যাকে polytheistic বলা শ্রীঅরবিন্দের ঠিক হয় নাই। যে ধর্ম্মমতে এক পরমেশ্বরের কল্পনা নাই, তাহাকে polytheistic বলা হয়। সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যায় এক পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে কিছুতেই polytheistic বলা যায় না। এক পরমেশ্বরকে স্বীকার করিয়া তাঁহার অধীনে কতকগুলি দেবদেবীর স্বীকার করিলে তাহাকে polytheism বলা যায় না। বৈদিক দেবদেবীগণ মানব অপেক্ষা উচ্চ স্তরের জীব।

মানব অপেক্ষা উচ্চ স্তরের জীবের কল্পনা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। মানবের দেহ এত অসম্পূর্ণ, তাহার শক্তি এত ক্ষুদ্র যে, ইহা নিশ্চয়ই অনুমান করা যাইতে পারে যে, পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া মানবদেহ হইতে শ্রেষ্ঠ দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অধিকতর শক্তিলাভ করিয়া অপেক্ষাকৃত সুখময় জীবন যাপন করা সম্ভব। দেবগণকে পূজা করা অন্যায়, ইহাও বলা যায় না। দেবগণের পূজা করিলে যদি ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হইতেন তাহা হইলে বলা যাইত যে, দেবগণকে পূজা করা অন্যায়।

কিন্তু দেবগণের পূজা করিলে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হইবেন কেন? রাজকর্ম্মচারীকে সম্মান করিলে রাজা কখনও অসন্তুষ্ট হন না। প্রত্যুত রাজা এরূপ ইচ্ছা করেন যে, রাজকর্ম্মচারীকে সম্মান করা হউক। কারণ, যে ব্যক্তি রাজকর্ম্মচারীকে সম্মান প্রদর্শন করে, সে ব্যক্তি যে রাজাকে আরও বেশী সম্মান প্রদর্শন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। সেইরূপ ঈশ্বরই দেবগণের দেবত্ব প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং দেবগণকে পূজা করিলে—সম্মান করিলে ঈশ্বর ক্ষুণ্ণ হন না।

গীতাতে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা খুব উচ্চ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। শ্রীঅরবিন্দও উচ্ছ্বসিত ভাষায় গীতার প্রশংসা করিয়াছে। গীতায় বহু দেবতার অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্' (১৭৪)। যাহারা সত্বগুণপ্রধান, তাহারা দেবগণের পূজা করে। 'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ (৩।১১) মানবগণ দেবগণকে সন্তুষ্ট করুক, দেবগণ মানবগণকে সন্তুষ্ট করুক। 'দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং' (১৭।১৪) দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ সকলকে পূজা করা উচিত। 'অহম্ আদির্হি দেবানাং' (১০।২) ঈশ্বর হইতেই সকল দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। এই প্রকার বহু বাক্য গীতার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি ইহা দোষের বিষয় না হয়, তাহা হইলে সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যা কেন দোষের বিষয় হইবে?

শ্রীঅরবিন্দ বেদ হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বেদে বিভিন্ন দেবতার কথা নাই, অতএব সায়ণের কথা ভুল:—

"একংসদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি
ইন্দ্রং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ'

(ঋগ্বেদ, ১-১।৬৪-৫৬)

"সেই এক সদ্‌বস্তুকে মেধাবিগণ বহুপ্রকারে অভিহিত করেন। কেহ ইন্দ্র বলেন, কেহ যম বলেন কেহ মাতরিশ্বা বলেন।"

কিন্তু সায়ণাচার্য্যও তাঁহার ঋগ্বেদভাষ্যের প্রারম্ভেই এই ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং এই ঋকের তাৎপর্য্য যে সায়ণাচার্য্য লক্ষ্য করেন নাই, ইহা মনে করা যায় না। বস্তুতঃ এই ঋকের এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, ইন্দ্রাদি বিভিন্ন দেবতার অস্তিত্ব নাই। এই ঋকটির অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু ইন্দ্র যম প্রভৃতি দেবগণ প্রলয়ের সময় ঈশ্বরেই বিলীন হইয়া যান, এবং সৃষ্টির সময় ঈশ্বর হইতেই উৎপন্ন হন, অতএব ঈশ্বর ভিন্ন ইঁহাদের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, প্রকৃত পক্ষে সকলেই ঈশ্বরের অংশ। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই বিশ্বজগৎ সকলই ব্রহ্ম। এই দৃষ্টিতে মানবেরও কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কারণ সকল মানবই ব্রহ্মের অংশ। ইহা পারমার্থিক দৃষ্টি। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মানবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, এবং বিভিন্ন মানবের মধ্যেও প্রভেদ স্বীকার করিতে হইবে। সেইরূপ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেবগণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং বিভিন্ন দেবের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করিতে হইবে, যদিও পারমার্থিক হিসাবে সকলেই ব্রহ্ম। সায়ণাচার্য্য তাঁহার প্রণীত ঋগ্বেদভাষ্যের উপক্রমণিকায় যেখানে এই ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেখানেও এই ভাবেই ঋক্‌টির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদের অন্যান্য স্থলে দেবগণের শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ও তাঁহাদের উৎপত্তির কথা আছে। একটি তত্ত্বজ্ঞানের কথায় সে সকল বেদবাক্য উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

শ্রীঅরবিন্দ সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যার আর একটি দোষ দিয়াছেন যে, সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন যে, বেদে দেবগণের উদ্দেশ্যে নানাবিধ যজ্ঞের বিধান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যজ্ঞের কথা গীতাতেও যথেষ্ট আছে। গীতায় অবশ্য বহুবিধ যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে—দ্রব্যযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ প্রভৃতি। কিন্তু বেদবিহিত দ্রব্যের দ্বারা নিষ্কামভাবে যজ্ঞ করাকে যে প্রশংসা করা হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর নাই। যজ্ঞে আসক্তি এবং যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি কামনা অবশ্য নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু আসক্তি এবং কামনা ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ করাকে প্রশংসা করা হইয়াছে। কারণ এই ভাবে যজ্ঞ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্তশুদ্ধ হইলে জ্ঞান হয়। যজ্ঞ করিতে কষ্ট হয় বলিয়া যজ্ঞ ত্যাগ করাকেও নিন্দা করা হইয়াছে। ১৮।৫ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, 'যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ,' অর্থাৎ যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, এই

সকল কর্ম্ম করা উচিত। অজ্ঞানহেতু যজ্ঞাদি কর্ম্মত্যাগকে তামসিক ত্যাগ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন (১৮।৭)। এই সকল কর্ম্ম করিতে অসুবিধা হয় বলিয়া ত্যাগ করাকে রাজসিক ত্যাগ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন (১৮।৮) আসক্তি এবং ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই বুদ্ধিতে যজ্ঞ করাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন (১৮।৯)। ৩য় অধ্যায়ে ১০,১১ ও ১২ শ্লোকে দেবগণের উদ্দেশ্যে হবি-অর্পণরূপ যজ্ঞকে প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং সায়ণাচার্য্য বেদের যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে গীতার অনুমোদিত।

সূর্য্য প্রভৃতি শরীরাভিমানী দেবতা আছেন, তাঁহাদিগকে যথাবিহিত দ্রব্য প্রদান করিয়া যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিবার কথা বেদে উক্ত হইয়াছে,—ইহা শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও বলিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য আচার্য্য শঙ্করের প্রতিপাদিত মতের সম্পূর্ণভাবেই অনুসরণ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যকে polytheistic না বলিলে সায়ণাচার্য্যকে polytheistic বলা যায় না।

উপনিষদ যজ্ঞ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"তৎ এতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যন্"

—(মুণ্ডক উপনিষদ্)

"ঋষিগণ মন্ত্রের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সত্য।" অর্থাৎ বেদের সংহিতাভাগে যে সকল মন্ত্র আছে, সেই সকল মন্ত্রের দ্বারা কি প্রকারে যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ঋষিগণ তাহা দিব্যদৃষ্টিতে অবগত হইয়াছিলেন, এবং বেদের ব্রাহ্মণভাগে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,— ইহা সত্য। সুতরাং সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যাপ্রণালী উপনিষদ্ কর্ত্তৃক সমর্থিত।

শ্রীঅরবিন্দ পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"there has been this double and incompatible tradition about the Veda, that it is a book of ritual and mythology and that it is a book of divine knowledge." অর্থাৎ প্রাচীন মত অনুসারে দুই প্রকার কথা বলা হয়,—প্রথম বেদে কতকগুলি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার প্রণালী বিবৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়, ইহা ঈশ্বরীয় জ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক, এবং এই দুই মত পরস্পর-বিরোধী। শ্রীঅরবিন্দ এ বিষয়ে বেদের ব্রাহ্মণ অংশের মত পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে উপনিষদের মতই আদরণীয়।

যজ্ঞ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ যে বিরোধ কল্পনা করিয়াছেন (incompatible), তাহা কাল্পনিক। গীতা এ বিষয়ে অতি সুন্দর ভাবে মীমাংসা করিয়াছেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শ্রীঅরবিন্দ তাহা লক্ষ্য করেন নাই। গীতা বলিয়াছেন যে, নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্তশুদ্ধ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না।

"যজ্ঞোদানংতপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্" (১৮।৫)

"যাজ্ঞ দান এবং তপস্যা মানবদের চিত্ত শুদ্ধ করে।"

শ্রীঅরবিন্দ কল্পনা করিয়াছেন যে, উপনিষদ্ বুঝি ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বলিয়াছেন এবং "ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী" যজ্ঞের কথা কিছু বলেন নাই। ইহা যথার্থ নহে। উপনিষদ্ও যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন এবং ইহা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সহায়ক। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্"

"দেবকার্য্য (যজ্ঞ) পিতৃকার্য্য (শ্রাদ্ধ ও তর্পণ) যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিবে।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—"তমেতং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন।"

"ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার দ্বারা তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিতে ইচ্ছা করেন।"

আমরা যখন যজ্ঞ করি, তখন বিবিধ দেবরূপে ঈশ্বরেরই পূজা করি, আমাদের দেহ-মন-বুদ্ধির শুদ্ধিবিধানার্থ সকলই ঈশ্বরের পূজায় নিযুক্ত করা উচিত, যজ্ঞের দ্বারা তাহা করা যায়, এইভাবে বিবেচনা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্বন্ধে যজ্ঞের উপযোগিতা উপলব্ধ হইবে। ব্যাস, বাল্মীকি, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি বেদজ্ঞ মহাপুরুষগণ সকলেই বৈদিক যজ্ঞের সমর্থন করিয়াছেন। বেদের প্রকৃত মর্ম্ম তাঁহারা কেহই অবগত হইতে পারেন নাই, ইহা বিশ্বাস্য নহে।

(মাসিক বসুমতী ভাদ্র ১৩৪৫)

জাতিবিভাগ

শ্রদ্ধেয় আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ঢাকায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন ১৩৪৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে "জাতিভেদ ও তাহার বিষময় ফল" নামে তাহা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, জাতিভেদ ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জাতিবিভাগের ব্যবস্থাসকল মনু-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে ঘৃণার ভাব ছিল না। এজন্য ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, এই সকল ব্যবস্থা ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর।

মনুর আদর্শ কিরূপ উচ্চ তাহা মনুসংহিতার ১২।৯১ শ্লোক হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ঐ শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ :—যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন এবং আত্মার মধ্যে সকল প্রাণীকে দর্শন করেন, যাঁহার দৃষ্টিতে সকল প্রাণীই সমান, যিনি আত্মার পূজা করেন—তিনি স্বরাজ্য লাভ করেন।

মূল শ্লোকটির ভাষাও খুব সরল—

সর্বভূতেষু চ আত্মানং সর্বভূতানি চ আত্মনি।
সমং পশ্যন্ আত্মযাজী স্বারাজ্যম্ অধিগচ্ছতি ॥

মনু ১২।৯১

মনুসংহিতায় জাতিবিভাগের যে বিধান দেওয়া হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই সমদর্শন লাভ করা। প্রকৃত সমদর্শন লাভ করিবার পক্ষে জাতিবিভাগ কিরূপ সহায়ক হইয়াছে একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা দেখান যাইতে পারে।

পার্শীদের পূর্বপুরুষগণ পারস্যদেশে বাস করিত। মুসলমানগণ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া বলিয়াছিল, "তোমরা মুসলমান হও, নচেৎ তোমাদিগকে বধ করিব।" অধিকাংশ পার্শী মুসলমান হইল। যে সকল পার্শী স্বধর্ম রক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আশ্রয় লইল, ভারতের হিন্দু রাজা তাহাদিগকে সাদরে আশ্রয় প্রদান করিলেন এবং অবাধে নিজ ধর্ম অনুসারে পূজা করিবার অধিকার দিলেন। মুসলমানগণ যে পার্শীদের সহিতই এরূপ ব্যবহার করিয়াছিল তাহা নহে, কাশ্মীরেও করিয়াছিল, অন্যত্রও করিয়াছিল "এক হাতে তরবারি, এক হাতে

কোরাণ।" অথচ মুসলমানগণের মধ্যে জাতিবিভাগ নাই, তাহাদের "সার্বজনীনতা ও ভ্রাতৃত্বে" আচার্য রায় "মুগ্ধ হইয়াছেন।" দুঃখের বিষয় আচার্য রায় বুঝিলেন না যে, মুসলমানগণের এই যে উক্তি, "তুমি মুসলমান হও তোমার সহিত ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিব, মুসলমান না হইলে তোমাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিব"—ইহাই ভেদের অতিশয় অশোভন ও উগ্র অভিব্যক্তি। হিন্দুদের মনের ভাব এইরূপ—আমাদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি পাঁচটি জাতি আছে, সেইরূপ আর একটি জাতি পার্শী বা মুসলমান থাকিতে পারে, সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করুক, পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ হিংসা যেন না থাকে। যে ব্যক্তি যে ধর্মই পালন করুক কাহাকেও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিব না—ইহাই প্রকৃত সমদৃষ্টি। তোমাকে আমার ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, করিলে তোমার সহিত ভেদব্যবহার করিব না, যদি আমার ধর্ম গ্রহণ না কর তাহা হইলে তোমার ন্যায্য অধিকারও তুমি পাইবে না—ইহা প্রকৃত সমদৃষ্টি নহে। ভেদরক্ষা করিয়া যে সমদৃষ্টি তাহাই যথার্থ সমদৃষ্টি। জোর করিয়া ভেদলুপ্ত করিয়া যে সমদৃষ্টি তাহা প্রকৃত সমদৃষ্টি নহে।

জার্মানগণ য়িহুদিদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহা সকলেই জানেন। পাশ্চাত্য সকল দেশের লোকই য়িহুদিদিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি পোষণ করেন, অল্পবিস্তর য়িহুদি-পীড়ন সকল দেশেই চলে, জার্মেনীতে ইদানীং তাহা খুব বীভৎস মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যদেশে জাতিভেদ নাই। তবে এত ভেদ দৃষ্টি কেন? হিন্দুগণ কখনও কোনও জাতির সহিত এরূপ অন্যায় অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন কি?

আজকাল এই কথা শোনা যায় যে, সকল মানুষের সহিত সমান ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপী ও অসাধু তাহার প্রতি যে ব্যবহার করা উচিত, যে ব্যক্তি সাধু ও পরোকারী তাহার প্রতিও সেই ব্যবহার করা উচিত, নচেৎ সাম্যবাদ নষ্ট হইবে একথা কেহ বলেন না। সুতরাং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা কর্তব্য ইহা যথার্থ নহে। যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত, ইহাই যথার্থ। সকল সমাজেই এই নীতি গৃহীত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করিয়াছে তাহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করা উচিত, এই নীতির উপর হিন্দুর জাতিবিভাগ প্রথাও প্রতিষ্ঠিত। অন্য সমাজে কেবল ইহজন্মের কর্মের হিসাব করা হয়। হিন্দুসমাজে পূর্বজন্মের কর্মের হিসাব

করা হয়। জীব পূর্বজন্মে যেরূপ কর্ম করে তদনুসারে পরবর্তী জন্মলাভ করে—ঋষিগণ তপস্যার প্রভাবে এই জ্ঞানলাভ করিয়াছেলেন। অন্য দেশের ধর্মপ্রচারকগণ এই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই।

পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিতে জন্ম হয় ইহা বেদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫-১০-৭ বাক্যের অনুবাদ এইরূপ :—'যাহারা উত্তম কর্ম করে তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিতে জন্মগ্রহ করে, যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহারা চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিতে জন্মগ্রহণ করে।' মূলটি এইরূপ ;—রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্, ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা, কপূয়চরণা কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।

জাতি বিভাগের মূল কথা এই যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে তাহার ব্রাহ্মণোচিত কর্ম করিবার স্বাভাবিক যোগ্যতা থাকে। সে যে পারি-পার্শ্বিক অবস্থায় বর্দ্ধিত হয়—তাহাও তাহাকে ঐরূপ কর্ম শিক্ষা করিবার অধিকতর সুযোগ প্রদান করে। তাহার ব্রাহ্মণোচিত কর্ম করাই কর্তব্য। সেইভাবে সে সমাজের যত বেশী সেবা করিতে পারিবে, যুদ্ধবিগ্রহ বা কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি কর্ম দ্বারা সে তত বেশী সেবা করিতে পারিবে না। অপর পক্ষে তন্তুবায়ের পুত্রের পক্ষে তন্তুবায়ের কর্মের দ্বারা সমাজের সেবা করা স্বাভাবিক। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করিবে যে, সে যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই জাতির নিদিষ্ট কর্ম তাহার পক্ষে সমাজসেবার এবং সমাজের মধ্য দিয়া ঈশ্বরসেবা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। গীতা ১৮।৪৬ শ্লোকে এই ভাবটি প্রকাশ করা হইয়াছে।

জীবিকার সহিত ঈশ্বরারাধনা করিবার ভাব সংযুক্ত করিয়া দেওয়াতে প্রাচীন ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ভারত একদিকে যেমন জ্ঞান ও ভক্তিতে উন্নত হইয়াছিল, অপর দিকে সেরূপ কারুকার্য এবং সকল প্রকার শিল্পকলাতেও জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিল।* ভারতের যে পতন হইয়াছে, বর্ণাশ্রমধর্ম সে পতনের কারণ নহে,

* মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছে, "জাতিভেদ প্রচলিত থাকায় ভারতবর্ষের সমুদয় শিল্পকার্য্য বহুপূর্ব্বকাল হইতে অপরিসীম উৎকর্ষলাভ করিয়াছে এবং সমস্ত পৃথিবীতে তুলনারহিত হইয়াছে।" (সামাজিক প্রবন্ধ, ১০৪ পৃঃ)

বৌদ্ধযুগের ধর্মবিপ্লবের পর বর্ণাশ্রম ধর্মের অবহেলাই ভারতের পতনের কারণ। কারণ ধর্মযুদ্ধ করা যে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য কর্ম, ধর্মযুদ্ধে শত্রুবধ করিলে যে পাপ হয় না—বৌদ্ধধর্মে অহিংসাধর্মের অতিরিক্ত প্রচারের ফলে লোকে এ কথা ভুলিয়া গেল। হিন্দুধর্মে সন্ন্যাসের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কাহাকেও সন্ন্যাস প্রদানের পূর্বে তাহার সন্ন্যাসলাভের অধিকার আছে কি-না, অর্থাৎ তাহার মনে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে কি-না ইহা বিচার করিতে হইত। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অবিচারে সকলকে সন্ন্যাসী হইতে বলা হইল। ইহার ফলে সমাজে দুর্নীতির প্রসার হইল। এই সকল কারণে হিন্দুমাজের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনিষ্টকর হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে, যখন বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষিত হয় তখন দেশের সকল বিষয়েই উন্নতি হয় এবং বর্ণাশ্রম অবহেলা হইলে দেশের অবনতি হয়, তখন ভগবান অবতীর্ণ হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা করেন, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বর্ণাশ্রমধর্ম আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয় ইহা সত্য। কিন্তু কোনও লোকের স্পর্শ করা অন্ন না খাইলে যে তাহাকে ঘৃণা করা হয় তাহা সত্য নহে। বিধবা নিজের পুত্রের বা কন্যার স্পর্শ করা অন্ন অনেক সময় খান না। তাই বলিয়া তিনি যে পুত্র বা কন্যাকে ঘৃণা করেন তাহা নহে। ভাব শুদ্ধ রাখিবার জন্য এরূপ নিয়ম পালন করা প্রয়োজন এইরূপ বিশ্বাসেই খাওয়া ছোঁয়ার নিয়মগুলি পালন করা হয়। একত্র আহার না করিয়াও এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়াও পরস্পর প্রীতি রক্ষা করা সম্ভব। ভারতবর্ষে চিরকাল তাহা হইয়া আসিয়াছে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, জাতিবিভাগের জন্য ভারত পরাধীন হয় নাই। এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। মুসলমানগণ যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষই জয় করিয়াছিল তাহা নহে। তাহারা মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি নানা দেশ জয় করিয়াছিল, ঐ সকল দেশে জাতিবিভাগ ছিল না, অতএব ইহা কিরূপে বলা যায় যে জাতিবিভাগই ভারতের পরাজয়ের কারণ? বিশেষতঃ অন্যান্য দেশ মুসলমান আক্রমণে যে পরিমাণে বাধা দিয়াছিল, ভারতবর্ষ তদপেক্ষা অনেক বেশী বাধা দিয়াছিল। এই কথা বঙ্কিমবাবু "ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?" এই প্রবন্ধে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা

উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। মুসলমানেরা যে সকল দেশ জয় করিল প্রায় সকল দেশেই মুসলমান ধর্ম্ম ও মুসলমান রাজত্ব স্থায়ী হইল, কেবল ভারতবর্ষেই তাহা হয় নাই। জাতিবিভাগ যদি হিন্দুকে দুর্বল করে তাহা হইলে পাঠান বিজয়ের পর হিন্দুর দুর্বলতা ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। পরন্তু পাঠান বিজয়ের তিন শত বৎসর পরে পাঠানেরাই দুর্বল হইয়াছিল, হিন্দুরাজগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিল। মোগল আক্রমণের সময় পাঠানদিগকে পরাস্ত করিতে বাবর কিছুমাত্র বেগ পান নাই। কিন্তু রাণা সঙ্গের সহিত যুদ্ধের পূর্বে বাবর খুব ভীত হইয়াছিলেন, সারা রাত্রি জাগিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আর কখনও মদ খাইবেন না, মদ্যপানের সুবর্ণ পাত্রগুলি দরিদ্রদিগকে দান করিবেন—এই প্রকার অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পুনরায় মোগল বিজয়ের দুই শত বৎসর পরে মোগলশক্তি খর্ব হইল, পাঠান-শক্তিরও পুনরভ্যুদয় হইল না, হিন্দু-শক্তিরই পুনরুত্থান হইল। উত্তরে শিখজাতির অভ্যুদয় হইল, দক্ষিণে কাবেরি হইতে উত্তরে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রের গৈরিক পতাকা বিজয়গর্বে উড্ডীন হইল। ইংরেজেরা ভারত জয় করিলেন, মোগলের নিকট হইতে নহে, মহারাষ্ট্র ও শিখদের নিকট হইতে। হিন্দুজাতির বার বার এইরূপ উত্থান দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুর সমাজ-গঠন প্রণালী (বর্ণাশ্রম ধর্ম) হিন্দুর পরাজয়ের কারণ নহে, পরাজয়ের অন্য কোনও আকস্মিক কারণ ছিল। ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুর সমাজগঠনপ্রণালী হিন্দুর জীবনে শক্তিসঞ্চার করে, তাই পাঠান ও হিন্দুর সংঘর্ষে প্রথমতঃ হিন্দু হারিয়া গেলেও শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুরই জয় হইয়াছিল এবং মোগল ও হিন্দুর সংঘর্ষে প্রথমে হিন্দুর পরাজয় হইলেও শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুর জয় হইয়াছিল।

কিন্তু জাতিভেদ কি জাতীয় ঐক্যবোধ নষ্ট করে না? না করে না। স্বয়ং ভগবান যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, মুনি ঋষিরা যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহা কখনও ঐক্যবোধ নষ্ট করিয়া সমাজের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। একটী সমাজের মধ্যে সকলের অধিকার সমান হইলেই যে ঐক্যবোধ থাকিবে তাহা বলা যায় না। যে পরিবারের মধ্যে পুত্রগণ পিতামাতাকে মান্য করে, পুত্রগণের মধ্যে যে ছোট সে বড়কে মান্য করে, সেই পরিবারের মধ্যে ঐক্যবোধ বেশী—না, যে পরিবারে সকলেই সমান অর্থাৎ কেহ কাহাকেও মানে না, সে পরিবারে ঐক্যবোধ বেশী?

জাতিবিভাগের সৃষ্টি যিনিই করুন তাঁহার এই বুদ্ধি ছিল যে, সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্যভাব প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, এই ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই তিনি জাতিবিভাগ করিয়াছেন। ঐক্যের জন্য শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশে জন্ম অনুসারে শ্রেণীবিভাগ নাই, অর্থ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ আছে। অর্থ অনুসারে শ্রেণী-বিভাগ হইলে সমাজে অর্থের গৌরব অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, ধনী ব্যক্তিগণ দরিদ্রদিগকে ঘৃণা করেন, দরিদ্র ব্যক্তিরা ধনী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, সমাজে শান্তি বিনষ্ট হয়। জন্ম অনুসারে শ্রেণীবিভাগ হইলে অর্থের ঔদ্ধত্য সংযমিত হয়; ভারতে এক জাতির ধনী ও দরিদ্র একত্র আহার করে ও বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় এজন্য ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে ধনী ও দরিদ্র একত্র আহার বিহার করে না। আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায় দরিদ্রের সহিত একত্র আহার-বিহার বর্জ্জন করিতেছেন।

অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থাও মনুসংহিতাতে আছে। মনুর আদর্শ কত মহান্ তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। যাঁহার আদর্শ এত মহান্ তিনি কখনও ঘৃণামূলক ব্যবস্থা দিতে পারেন না। সুতরাং অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থাও ঘৃণামূলক হইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত। ইহা যে ঘৃণামূলক নহে তাহা মনুসংহিতার যে শ্লোকে অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থা আছে সে শ্লোকের অর্থ আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে। শ্লোকটির অনুবাদ এইরূপ; ঋতুমতী রমণী, চণ্ডাল, শব, যে ব্যক্তি শব স্পর্শ করিয়াছে, সদ্যপ্রসূতা রমণী ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।* চণ্ডালের সহিত ঋতুমতী ও সদ্যপ্রসূতা পত্নী বা ভগিনীকেও এক পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে। ঘৃণার ব্যবস্থা হইলে এরূপ হইত না। অন্যত্র মনুসংহিতার ৩।৯২ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, চণ্ডালকে যত্নপূর্ব্বক আহার দিবে। যাঁহার মনে ঘৃণার ভাব আছে তিনি একথা বলিবেন না। চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতির জীবিকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অন্য জাতির লোক যাহাতে সে জীবিকায় হস্তক্ষেপ না করে তাহার ব্যবস্থাও আছে। তাহার ফলে ভারত অস্পৃশ্যজাতীয় লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া চারি-পাঁচ কোটি হইয়াছে। যদি তাহাদিগকে

---

* মনু ৫।৮৫

ঘৃণা করা হইত, তাহাদের উপর অত্যাচার করা হইত তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা কমিয়া যাইত। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া রেড ইণ্ডিয়ান, হোটেনটট্ প্রভৃতি জাতি লুপ্তপ্রায়। ট্যাস্‌ম্যানিয়ার শেষ আদিম অধিবাসীর মৃত্যুসংবাদ সেদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্যদেশের অস্পৃশ্যতা বাস্তবিক ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য সেখানে অস্পৃশ্যজাতির বিলোপ হইতেছে। হিন্দু শাস্ত্রবিহিত অস্পৃশ্যতা ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, যে মন্দ কর্ম করে তাহার দেহ অপবিত্র হয়, পরজন্মেও দেহের অপবিত্রতা বিদ্যমান থাকে, তাহার সংস্পর্শে অন্য ব্যক্তির দেহে অপবিত্রতা সঞ্চারিত হয়—এই সকল তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা এক দিকে উচ্চ বর্ণের পবিত্রতা রক্ষার সহায়ক, অপর দিকে নিম্নবর্ণের পবিত্রতা উৎপাদনের সহায়ক, কারণ পূর্বজন্মের মন্দ কর্মের জন্য দেহ অপবিত্র মনে করিয়া অনুতাপ করিলে পূর্বজন্মকৃত কর্মজনিত মলিনতা শীঘ্র দূর হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন যে, বিড়াল ঘরে আসিলে ঘর অপবিত্র হয় না, চণ্ডাল আসিলে কেন হইবে? মানব বুদ্ধিমান জীব, বিধিনিষেধ মানবের জন্যই করা হয়; বুদ্ধিহীন পশুর জন্য করা সম্ভবপর হয় না। একব্যক্তি অপরের গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিলে তাহার দণ্ড হয়, বিড়াল অনধিকার প্রবেশ করিলে দণ্ড হয় না। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে বিড়াল অপেক্ষা মানবকে ঘৃণা করা হয়। মানসিক পবিত্রতার দিক হইতেও বিচার করিলে দেখা যায় যে, অন্যায় কর্মকারী মানবের সাহচর্যে যেরূপ মনের অধোগতি হয় পশুর সাহচর্যে সেরূপ হয় না। একটি দুশ্চরিত্র রমণীর প্রৌঢ়বয়সে ধর্মানুরাগ হইয়াছিল। সে রামকৃষ্ণ পরমহংসের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়াছিল বলিয়া পরমহংসদেব অত্যন্ত আপত্তি করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায়, যে-ব্যক্তি পূর্বে অন্যায় কর্ম করিয়াছিল সে অন্যায় কর্ম ত্যাগ করিবার পরও অস্পৃশ্য থাকে। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সে পরজন্মেও অস্পৃশ্য থাকে, কারণ দুষ্ট সংস্কারযুক্ত মন পরজন্মেও বিদ্যমান থাকে। অনুতাপ এবং ভক্তিতে মন নির্মল হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্মল হইয়াছে কি-না তাহা সচরাচর বুঝিতে পারা যায় না। যাহার মন নির্মল হয় সে পরজন্মে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করে।

আচার্য রায় বলিয়াছেন, "সমস্ত পৃথিবী আজ আত্মোন্নতি সাধনায় মগ্ন।" পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে একথা অনেকেই বিশ্বাস করিত। কিন্তু জার্মানী ইটালী প্রভৃতি যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে এখন আর একথা বলা যায় না। এখন

স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিও পাশ্চাত্যজাতিসকলের বিজ্ঞানে উন্নতি হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে উন্নতি হয় নাই। জাপানের উন্নতির পরিচয়স্বরূপ আচার্য রায় বলিয়াছেন যে তাহারা "সুবৃহৎ রণতরী নির্ম্মাণ করিয়াছে। কামান বন্দুক বিস্ফোরক প্রস্তুত করিয়াছে।" কিন্তু চীনের সহিত যুদ্ধে জাপান যে বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহাতে কি বুঝিতে পারা যায় নাই যে, প্রকৃত যাহা উন্নতি, মনের উন্নতি তাহা জাপানের হয় নাই? আচার্য রায় বলিয়াছেন, "হাজার হাজার বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতি জীবনের কোনও লক্ষণ দেখাইতে পারিল না।" জীবনের লক্ষণ কি রণতরী, কামান, বন্দুক, বিস্ফোরক প্রস্তুত না করিলে দেখান যায় না? এই হাজার হাজার বৎসরের মধ্যে শঙ্করচার্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাতে কি জীবনের লক্ষণ দেখান হয় নাই? রাণা প্রতাপ, শিবাজি, পুত্ত, জয়মল্ল, প্রতাপাদিত্য—ইঁহারা কি জীবনের লক্ষণ দেখান নাই? আচার্য রায় বলিয়াছেন, যে জাতিবিভাগের ব্যবস্থা পৃথিবীর কোনও দেশে, কোনও কালে ছিল না বা নাই কিন্তু যাহা পৃথিবীতে অন্য কোনও দেশে কোনও কালে ছিল না, তাহা যে অবশ্যই মন্দ হইবে তাহা কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যায়? কর্ম্মফল এবং পুনর্জন্ম তত্ত্বের উপর জাতিবিভাগের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। গভীর তপস্যার ফলে আর্যঋষিগণ এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আচার্য রায় বলিয়াছেন যে, উত্তর ও পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, তাহার কারণ "হিন্দুসমাজের অসহনীয় উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া অস্পৃশ্য হিন্দুগণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।" কিন্তু ভারতবর্ষে সর্বত্রই অস্পৃশ্যতা প্রচলিত। অন্য প্রদেশের অস্পৃশ্যরা কেন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই? প্রকৃতপক্ষে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইবার কারণ এই যে, ঐ অঞ্চলে বৌদ্ধের সংখ্যা বেশী ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের সেরূপ শক্তি ছিল না যাহাতে মুসলমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। হিন্দুধর্ম্মের সে শক্তি ছিল। এজন্য ভারতের অন্য প্রদেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান হয় নাই। আচার্য রায় বলিয়াছেন যে শাস্ত্রে জাতিভেদের বিরুদ্ধেও নিদর্শন পাওয়া যায়, কারণ "ব্যাসদেব পরাশরের ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ও সত্যকাম কুমারী জবালার পুত্র।" কিন্তু এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, জাতিবিভাগ অনিষ্টকর এবং বর্জন

করা উচিত। মৎস্যগন্ধা ক্ষত্রিয় রাজা বসু উপরিচরের কন্যা। পরাশরের তপঃশক্তি প্রভাবে তাঁহার ঔরসজাত পুত্র মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ এবং মহাপুরুষ হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ইহা সত্য। কিন্তু সেজন্য বিশ্বামিত্রকে অনেক তপস্যা করিতে হইয়াছিল। তপস্যার দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়, সুতরাং দেহের উপাদানের পরিবর্তনও হইতে পারে। জবালা কুমারী ছিলেন একথা উপনিষদে নাই। জবালা এই কথা বলিয়াছেন "বৎস, তোমার গোত্র আমি জানি না, কারণ যৌবনে যখন গৃহকর্মে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম তখন তোমাকে লাভ করিয়াছি।" (আচার্য শঙ্কর এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন)। শাস্ত্রে যখন স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, বর্ণসঙ্কর অমঙ্গলজনক তখন এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণশঙ্কর মঙ্গলজনক বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না।

আচার্য রায় এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন

> সর্বত্র শাস্ত্রম্ আশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য বিনির্ণয়।
> যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানি প্রজায়তে॥

আচার্য এই বাক্য কোন্ শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বলেন নাই। উদ্ধৃত করিতে বোধ হয় একটু ভুল হইয়াছে। মূল বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে যুক্তি সহকারে বিচার করা প্রয়োজন। বিচারের দ্বারা প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করা উচিত। এই বাক্যের এরূপ উদ্দেশ্য হইতে পারে না যে শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করা উচিত। গীতা ১৬।২৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহার অনুবাদ এইরূপ: "অতএব কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ণয় করিবার জন্য শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রের বিধান কি তাহা জানিয়া কর্ম করা উচিত।"

বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত সর্বত্রই জাতিবিভাগের প্রশংসা আছে। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ বর্ণাশ্রম-ধর্মের রক্ষাকর্তা। ব্যাস বাল্মীকি মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ ইহা প্রচার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য রামানুজ তুলসীদাস শ্রীচৈতন্য রামকৃষ্ণ সকলেই ইহা সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং এই ব্যবস্থা অনিষ্টজনক হইতে পারে না। এই ব্যবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত এজন্য বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া টিকিয়া আছে। পাশ্চাত্যদেশে উত্তম সামাজিক ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই বলিয়া বার বার

নূতন ব্যবস্থা প্রচারিত হইয়াছে এবং অশান্তির শেষ নাই। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসরণ করিয়া ভারতের অবনতি হয় নাই. বর্ণাশ্রমধর্ম অবহেলা করিয়া অবনতি হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে, দরিদ্রের জীবিকা রক্ষা করিয়াছে, সমগ্র জাতিকে পরিশ্রম-শীল করিয়া প্রাচীন কালে শিল্পবাণিজ্যের অশেষ উন্নতি করিয়াছে, বর্ত্তমান সময়েও ইহা আমাদের উন্নতির পথে কিছুমাত্র অন্তরায় নহে। ইহা পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম এবং ইহলোকে উন্নতি উভয় বিষয়েই অনিষ্ট হইবে।

(ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩৪৬)
